আমার ফাঁসি চাই

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সরকারীভাবে সর্বত্র অবাঞ্ছিত ঘোষিত

উৎসর্গ

দেশপ্রেম বিবর্জিত নেতা-নেত্রীর খপ্পরে পড়ে যে সমস্ত প্রতিভাবান তরুণ ছাত্র-যুবক তাঁদের ভবিষ্যৎ এবং জীবন বিসর্জন দিয়েছে,

" আমার ফাঁসি চাই" গ্রন্থটি তাঁদের জন্য—

আমার ফাঁসি চাই

মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু

প্রকাশক :

স্বর্ণ লতা ও বন লতা

প্রকাশ কাল :

স্বাধীনতা দিবস'১৯৯৯

মূল্য : ১২৫ (একশত পঁচিশ টাকা) মাত্র।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

[illegible]

ক্রমিক নং ৪৫২ হইতে ৪৬৩ পর্যন্ত

[illegible]

নামকরণ

যদি পুলিশের উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেওয়া হতো, তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো "১৬১ ধারায় জবানবন্দী।" যদি ম্যাজিস্ট্রেটের উদ্দেশ্যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেওয়া হতো, তাহলে গ্রন্থটির নাম হতো "১৬৪ ধারায় জবানবন্দী।" কিন্তু জনতার উদ্দেশ্যে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর কোন ধারা নেই। যেহেতু এই গ্রন্থটি জনতার উদ্দেশ্যে দেওয়া এক ধরনের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী, তাই গ্রন্থটির নাম দিয়েছি "আমার ফাঁসি চাই"। যদি বলা যায় মিস্টার X অপরাধ করেছে। মিস্টার X এর ফাঁসি চাই। তাহলে নিজে অপরাধ করলে কি বলা উচিত না আমার ফাঁসি চাই? তাই গ্রন্থটির নাম রেখেছি "আমার ফাঁসি চাই"।

ভূমিকা

আমার বিশ্বাস অতীতের সত্য ঘটনা বা ইতিহাস জানা থাকলে ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনা হয়তো আসতে পারে।

শুধু আমি জড়িত আছি বা জানি এমন সমস্ত ঘটনাবলীই কেবল এখানে লিখিত হলো। তবে আমার দেখা বা জানার বাইরে অন্য কিছু নেই, এটা একেবারেই ঠিক নয়। অবশ্যই আছে।

আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের একটা বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, যারা রাজনীতি করেন বা দেশ চালান তারা আমাদের চাইতে খুব বেশি কিছু বুঝেন তা মোটেও নয়। আমাদের ধারণার আশপাশ দিয়েই তাদের ধারণা। আমাদের চাইতে খুব বেশি জ্ঞান, মেধা, যোগ্যতা রাজনীতিবিদদের আছে, এমন ভাববারও কোনই কারণ নেই; বরং কোন কোন বাস্তব বিষয়ে তাদের ধ্যানধারণা ও তাদের চাইতে আমরা যারা সাধারণ মানুষ, আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি সেই তুলনায় অনেক বেশি। অন্তত বাংলাদেশের রাজনীতিক ও প্রশাসকদের বেলায় এটা ষোল আনা সত্য।

কত নীচ প্রকৃতির এবং কত লোভী ও ক্ষুদ্র মনোবৃত্তির মানুষেরা কত উপরে আসীন, সাধারণ জনতার কাছে তা তুলে ধরার জন্যই এই বই লেখার প্রয়াস আমার। বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রতি বিশেষ করে আগামী প্রজন্মের মানুষদের জন্য এই ধরনের বই বা পুস্তক লেখা উচিত কি-না এ নিয়ে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা, আলাপ-আলোচনা এবং তর্ক-বিতর্কের পর,

অবশেষে সিদ্ধান্ত নিয়েছি—রাজনীতির অন্তরালের কোন সত্য ও তথ্যকে ধামাচাপা না করে, যতটুকু জেনেছি তাই-ই জনসম্মুখে তুলে ধরব এই ভেবে যে, তা যদি বর্তমান এবং আগামী দিনের মানুষের কোন কাজে লাগে।

এই গ্রন্থ বা পুস্তক পড়ে কোন কোন পাঠক আমাদের অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করবেন, পারলে তার চাইতেও ভয়ানক চরম দণ্ড দেবেন। আবার কোন কোন পাঠক হয়তো সতর্ক সাবধান হয়ে নিজস্ব চিন্তা ভাবনা করে আগামী দিনের রাজনৈতিক পথ চলবেন।

পাঠক কি করবেন, এটা একান্তই পাঠকের নিজস্ব ব্যাপার। তবে আমরা এটাকে প্রকাশ করা আমাদের একান্তই দায়িত্ব মনে করেছি।

আমাদের সম্মুখ বিপদের কথা চিন্তা করে সকলেই একবাক্যে বইটি এখন প্রকাশ না করে, শেখ হাসিনা যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন না, তখন প্রকাশ করার পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু আমরা স্বামী-স্ত্রী সম্মিলিত সকলের রায়ের সাথে একমত হইনি এই ভেবে যে, মানুষের (শেখ হাসিনার) দুর্বল মুহূর্তে তাঁর পিছনের কথা ফাঁস করে দেওয়ার মধ্যে কোন সৎ সাহস বা কৃতিত্ব থাকতে পারে না।

তাই ভবিষ্যৎ বিড়ম্বনার সম্ভাবনা জেনেও সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর ভরসা রেখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শাসন আমলেই এই গ্রন্থ বা পুস্তক প্রকাশ করার

সিদ্ধান্ত নিয়েছি। জীবন মানে পরাজিত হওয়া নয়, অবিরাম যুদ্ধ করা। রাখে আল্লাহ মারে কে?

পাঠক মনে করতে পারেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারী ভাবে আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার জন্যই আমরা এই জাতীয় লেখা তৈরি করেছি। হ্যাঁ, এটা খুবই সত্যি কথা। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্রিকভাবে আমাদের (স্বামী-স্ত্রী) কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে নতুন অকৃতজ্ঞতার পরিচয় না দিলে হয়তো আমাদের মাথায় এই গ্রন্থ লেখার বিষয়টি আসতো না।

পুলিশ, সিআইডি, ডিবি, আইবি, এনএসআই, ডিএফআইসহ রাষ্ট্রের সকল সংস্থায় আমাদের স্বামী-স্ত্রীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে দেওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐ আদেশই আমাদের মাথায় এই বই বা গ্রন্থ লিখার বিষয় এনে দেয়।

এখানে যা লেখা হয়েছে তার সবটুকুই বাস্তবের ছবি। আমরা শুধু সত্য বিষয়ের উপর কথার মালা গেঁথেছি।

আমাদের চিন্তায় এই বিষয়গুলো জাগিয়ে দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐ বেআইনী আদেশের প্রতি আমরা যারপর নাই কৃতজ্ঞ। কারণ সেই সূত্র থেকেই এত কিছুর বিস্তার।

রাষ্ট্রের নাগরিককে অবাঞ্ছিত ঘোষণা শুধু সংবিধান বিরোধী এবং বেআইনীই না, এটা হচ্ছে শপথ বাক্যের স্পষ্ট লঙ্ঘন।

১৯৯৬ সালের ২৩শে জুন সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণের সময় শেখ হাসিনা শপথ নিয়ে বলেছিলেন, আমি শেখ হাসিনা সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ করিতেছি যে, আমি আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করিব।

আমি বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি সংবিধানের রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তা বিধান করিব এবং আমি ভীতি বা অনুগ্রহ, অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে সকলের প্রতি আইন অনুযায়ী যথা বিহিত আচরণ করিব।

রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য না। এই বিষয়টি নিয়ে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে ফেরার পর দিন থেকে ১৯৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ষোল বছর বিরামহীন অক্লান্ত অবদান ঘটিয়ে অবশেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাদের তাড়িয়ে দিলেন। আমরা পরাজিত হলাম। তবুও বুঝাতে পারলাম না, রাজনীতি মানুষকে দেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য না। সত্যি কথা বলার প্রবল দুঃসাহস আমাদেরকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার পরিবারের কাছে বিপজ্জনক করে তুলেছিল।

ব্যক্তিগতভাবে যিনি অসৎ, বেঈমান, বিশ্বাসঘাতক এবং মুনাফেক। তিনি কী রাষ্ট্রীয় বা সমাজ জীবনে সৎ ঈমানদার হতে পারেন?

প্রকাশকের কথা

লেখক মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান রেন্টু [illegible] ঐতিহাসিক একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধে যাওয়া মানে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়া। মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়া। মুক্তিযুদ্ধের সময় নবম শ্রেণীর ছাত্র হয়েও লেখক যুদ্ধ করে আমাদের দেশ স্বাধীন করেছেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তিনি আমাদের অহংকার। আমাদের গর্ব। সম্ভবত তিনিই একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা যার প্রবাসী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক দেয়া সনদ "মুক্তিযুদ্ধ অনুদান" সার্টিফিকেট আছে।

মিত্রবাহিনীর [illegible] চৌধুরী ১৯৭৮ সালে জনতা সরকার-এর কাছ থেকে '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনাবিভাগ ([illegible]) এবং মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্টে মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয় ভারতীয় সেই তালিকায় ১ম ভলিউম-এর ৬৬২ নং নামটি লেখকের। তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৭/৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দপ্তরে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) ঐ তালিকার ১টি কপি সংরক্ষণ করেন এবং ঐ ভারতীয় তালিকা অনুযায়ী দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতি স্বাক্ষর করে মুক্তিযোদ্ধাদের সনদ দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক প্রতি স্বাক্ষরকৃত ০৪২৭৫ নং মুক্তিযোদ্ধা সনদটি লেখকের।

লেখক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে বন্দি হন। জেল বরণ করেন।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে আসার পর থেকে ১৯৯৭ সন পর্যন্ত প্রায় ১৬ বছর লেখক শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত [illegible] থাকেন। লেখকের স্ত্রী নাজমা আক্তারী ময়না ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ৯ বছর শেখ হাসিনার অবৈতনিক ব্যক্তিগত সেক্রেটারী থাকেন।

১৯৯৭ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারী ভাবে লেখক এবং তার স্ত্রীকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন। লেখক ও তার স্ত্রী [illegible] নিজেরাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ঐ অবাঞ্ছিত ঘোষণা বে-আইনী দাবি করে হাইকোর্টে মামলা করেন।

১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ভিতর দিয়ে লেখক রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। '৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত দীর্ঘ ২৭/২৮ বছর তিনি রাজনীতির সাথে সরাসরি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছেন। ২৭/২৮ বছরের বাংলাদেশের রাজনীতির নেপথ্যের অনেক কাহিনী লেখকের জানা আছে, এবং এই দীর্ঘ সময়ের অনেক নেপথ্য কাহিনীর সাথে লেখক নিজেই জড়িত।

২৭/২৮ বছরের রাজনৈতিক নেপথ্যের কাহিনীর উপরই ভিত্তি করে "আমার ফাঁসি চাই" বইটি রচিত।

বিশেষত '৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা দেশে আসার পর থেকে '৯৭ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক নেপথ্যের অনেক কাহিনী লেখক তার এই গ্রন্থে উন্মোচন করে দিয়েছেন।

এ কথা নিশ্চিত বলা যায় যে "আমার ফাঁসি চাই" বইটি পড়লে যে কেউ বিশেষত তরুণ-যুবক-ছাত্র সম্প্রদায় রাজনৈতিক প্রতারণার হাত থেকে বেঁচে যাবেন।

প্রকাশক

সূচীপত্র

৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ সিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেখ মুজিব হত্যা, খন্দকার মুস্তাক রাষ্ট্রপতি, জেল হত্যা, ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বর সিপাহী বিপ্লব।

৭ই মার্চের ভাষণ ১৭
ভারতে পলায়ন ৪৫
বাঘা সিদ্দিকীর কাছে যাওয়া ৫১
প্রতিবাদ যুদ্ধ ৫৭
যুদ্ধে পরাজয় ৭৩
হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা ফিরিয়ে আনা ৭৮
রাজনীতিতে শেখ হাসিনা ৮০
এই জিয়া সেই জিয়া নয় ৮২
রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা ৮২
সেখানেও ট্রেনিং ৮৭
এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ ৮৯
৮৩-র মধ্য ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র হত্যা ৯০
সেলিম ও দেলোয়ার হত্যা ৯৩
দেশদ্রোহী অসভ্য বাহিনী ৯৮
মসজিদ সরিয়ে ফেলুন ১০০
৮৬-র নির্বাচন ১০০
এক বড় মাঠ ১০৫
আন্দোলন আন্দোলন খেলা ১০৬
ছিয়াশির পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া ১০৭
এরশাদ পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ১০৮
এরশাদ পতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা ১০৯
পদত্যাগ নাটক ১১১
টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ১১২
জাহানারা ইমাম ও শেখ হাসিনা ১১৩
গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক ১১৫
১৯৯২ এর হিন্দু মুসলিম রায়ট ১১৬
ফেনী আটকিয়ে ফেলে রাখা ১২০
শেখ হাসিনার, গোলাম আযমের ২য় বৈঠক ১২৩
নির্বাচন বাতিলের দাবী ১২৪
শেখ হাসিনা এবং মেয়র হানিফ ১২৭

জনতার ভিড়ানিক ১২৬
আরও আমি বেশি খাব ১২৮
টাকার জন্য দিতে হবে ১২৯
[illegible] ইমাম মরেছে, অনশন গেছে ১৩০
শেখ হাসিনার ট্রেনে গুলি ১৩০
পঞ্চাশ হাজার টাকা [illegible] ১৩২
ফুল ছিটানো ১৩৬
[illegible] ১৩৮
[illegible] কাজ জানিয়েছি ১৩৯
শেখ হাসিনার দেহে আঘাত ১৪১
[illegible] হাতির কর্ম ও ভাগ্য ১৪৩
রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দিব না ১৪৪
[illegible] ১৪৬
এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা ১৪৯
[illegible] ১৫০
[illegible] ১৫১
[illegible] ১৫২
বঙ্গবন্ধুর [illegible] জন্ম উৎসব ১৫৩
হাঁ হাঁ, তিনিওতো সুন্দর হতো ১৫৩
শেখ হাসিনাকে [illegible] ১৫৭
আওয়ামী লীগের নির্বাচনী [illegible] ১৫৭
[illegible] ১৫৮
[illegible] গোলা-গুলি ও নিলাম ১৬০
[illegible] ১৬৩
পুলিশের লাশ চাই, বিরোধীদলীয় লাশ চাই ১৬৪
[illegible] আসছে ১৬৫
[illegible] ১৬৮
আজ নির্বাচন ১৬৯
শেখ হাসিনা — [illegible] ১৭০
হিন্দুরা নৌকায় ভোট দেয় ১৭১
রাজাকারের [illegible] ১৭২
হিন্দুরাই আমার বল-ভরসা ১৭৪
সৈন্য সমাবেশের নির্দেশ দিতে প্রস্তুত ১৭৪
[illegible] ১৮০
[illegible] ১৮১
[illegible] ১৮৩

নোবেলজয়ীদের ভিড় ১৭৪
বণিক [illegible] মন্ত্রী ১৭৬
সবার মুখ কালো ১৭৭
আমার নামে বেঈমানী ১৭৮
[illegible] ১৭৯
দুই বোনের কান্নাকাটি ১৮০
সোনার মানুষ কেলেঙ্কারী ১৮২
ওরা ৮জন মুক্তিযোদ্ধা ১৮৪
[illegible] বাংলা ১৮৫
প্রথম আমেরিকা সফর ১৮৬
যুদ্ধ বিমান ক্রয় ১৮৮
আমার সাক্ষী হলেন শেখ হাসিনা ২০১
বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের রাষ্ট্রপতি হওয়া ২০৪
দেশের বাইরে [illegible] বিরুদ্ধে মামলা ২০৭
গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ২০৯
[illegible] ২১১
[illegible] ২১৪
দশ টাকার নোটে শেখ মুজিবের ছবি ২১৭
পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি ২১৯
নেতা ও উপনেতাদের সাথে সম্পর্ক ২২২
[illegible] ২২৩
জিয়াউর রহমান [illegible] ২২৬
[illegible] ২২৮
[illegible] সাথে না থাকা ২২৯
হিন্দুস্থান কেন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে ২৩৪
[illegible] ২৩৭
[illegible] ২৩৮
[illegible] ২৪০
মিত্র-শত্রুর [illegible] ২৪২
প্রথম নির্দেশ ২৪৬
কোনো নেতা ছিল না ২৪৭
[illegible] ২৫৩
রাজা বাদশা, রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী ২৫৪
[illegible] ২৫৬
[illegible] ২৬০
[illegible] ২৬৩

আজও প্রথম সব হৃদয় সুরে ২৪২
সুরে সুরে কথা বলা ২৪৬
কোনো শিক্ষা নেয়নি ২৪৯
কার কত টাকা ২৫১
বাঙালির খেলা, সিনেমা, পত্রিকা, নাটক বিতর্ক ২৫২
এই মার্চেও ঢাকা ; ট্রিবেনাল অভিযোগের শিকল ২৫৩
ঠিক শেষ মুজিব দিকে ২৫৮
ডায়েরির পাতা ২৬৩
শিক্ষা ২৬৪
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ২৬৫
আমরা, শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার কীর্তি চাই ২৬৬

৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, সিরাজ সিকদার হত্যা, একদলীয় শাসন, শেখ মুজিব হত্যা, মুস্তাক রাষ্ট্রপতি, জেল হত্যা, ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান, ৭ই নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লব।

১৯৬৮ সাল, বাঙালি নির্যাতিত এক সম্প্রদায়ের ব্যবধানে আগরতলা থেকে ফেরে সেনা সাথে ষড়যন্ত্রে ভারতীয় অভিসংযোজিত কেন্দ্র শেখ মুজিবর রহমানকে। ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে পাকিস্তান সরকার এক প্রহসনমূলক বিচার করছিল শেখ মুজিবর রহমানসহ সামরিক বেসামরিক-বাঙালি কিছু লোকের। কিন্তু বাংলার মানুষ এই মামলা এবং বিচার গ্রহণ করেনি। শুধু তাই নয়, এই মামলা এবং বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলন করে বাঙালিরা পাকিস্তান সরকারকে বাধ্য করলো এই মামলা প্রত্যাহার করতে এবং শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে। তখন বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের উপনিবেশ। আমাদের এই দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

স্বাধীনতার পরে এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামে বিভিন্নদিকে স্বীকৃতি লাভ হয়। আসলে, পাকিস্তান যে আমাদের উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছিল এবং প্রতি বছর বাঙালিদের শোষণ করতো এটা তারা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল। ঔপনিবেশিক শোষণ, ও বাঙালিদের বিশেষ করে বাঙালি সৈনিকদের বঞ্চিত করার বিষয়গুলো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে বাঙালিদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি সৈনিকরা গোপনে আলাপ আলোচনা শুরু করেছিল। কিন্তু এরই সূত্র ধরে পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিব সহ সামরিক বেসামরিক বাঙালিদের গ্রেফতার করে ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজায়।

এই মামলার অভিযুক্তরা পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন করার এই রকম কোন কঠিন সিদ্ধান্ত নেই বলার যোগ্য। তবে তখন বিদ্রোহের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হয়ে পড়েছিল। এই মামলার প্রধান অভিযুক্ত হিসেবে তিনি কিছুই জানতেন না। শুধু বাঙালি হওয়ার কারণেই তাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তান আমাদের অধিকার সংরক্ষণের আন্দোলনে বাধা দেবে বলে সেজন্যই এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সূত্রপাত ঘটেছিল। এমন অনেক অভিযুক্ত ছিলেন যারা কখনো পাকিস্তানবিরোধী রাজনীতির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত শেখ মুজিবকে কখনও দেখেননি।

এক ঝটকায় পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে দেবার এমন কোন স্পষ্ট পরিকল্পনা বা সিদ্ধান্ত অভিযুক্তদের কারোরই তখনো ছিল না বলে আমার ধারণা। মামলায় প্রায় অভিযুক্তদের কাছ থেকে জানা যায়। অভিযুক্তদের প্রায় সকলেই বলেন, বাঙালিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা এবং নির্যাতনের জন্যই মূলত পাকিস্তান সরকার তাদের উপর চাপিয়ে এই আগরতলা মামলা দায়ের করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা পাকিস্তানের নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে [illegible] আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবসহ অভিযুক্ত সকলকে মুক্ত করে আনে।

১৯৬৯ সালেই ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিশাল সমাবেশ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান সরকার জাতীয় পরিষদ (এমএনএ)-এর এবং প্রাদেশিক পরিষদের (এম পি এ) নির্বাচন ঘোষণা করে।

মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা জানান। বঙ্গবন্ধু জনগণের ম্যান্ডেট অর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন, পাকিস্তানী সামরিক [illegible] জীতে না যাওয়া পূর্বপাকিস্তানকে স্বাধীন করার প্রশ্নে [illegible] তাদের প্রস্তাব ছিল, নির্বাচনে জয়ী হয়ে পূর্বাঞ্চল স্বাধীন করা। অপর দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন এবং তিনি জনগণকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। জনগণ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে অভূতপূর্ব সাড়া দিয়ে, গোটা পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু এবং তার দল আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী জোয়ার বয়ে গেল। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল আওয়ামী লীগকে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে মাত্র দুটি আসন ছাড়া বাকি ১৬৭টি আসনে বিজয়ী করলো। মোট [illegible] শতকরা [illegible] ভোট বঙ্গবন্ধু এবং তার দল পেলেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সারা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হলেন। পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অভিহিত করলেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক চক্র জুলফিকার আলী ভুট্টো, এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ষড়যন্ত্রে অবতীর্ণ হয়, এবং তারা [illegible] ও আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানের ক্ষমতা না দেওয়ার গোপন চক্রান্ত শুরু করলেন। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হলো আন্দোলনমুখর, বাঙালিরা তখন উত্তেজিত, উৎকণ্ঠিত। রাজপথ মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত। ঘরে ঘরে মানুষের মানুষের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। সমস্ত বাঙালি কেবল তাকিয়ে আছে কখন

আওয়ামীলীগের নেতা শেখ মুজিবের রহমানের দিকে। তিনি যা বলবেন সেভাবে সমস্ত বাঙালী তাই করবে। মুজিবরের কথায় অনেক সৈনিকের বুক পাতিয়ে দেবে। এ কোন বয়সের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান অমনভাবে বলেছিলেন সেই-দিনটি যে কোন অর্থপূর্ণ ঘোষণা দেওয়ার সাথে সাথে বিপুল শক্তির বাঙালি এ বাস্তবায়িত করবে। তিনি জাতির বুকে শুধু একটি ঘোষণা পাঠ করে দিয়েছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

৭ই মার্চের ভাষণ

এরই মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভা করার ডাক দিলেন। যেমন কথা তেমনই, লক্ষ লক্ষ বাঙালি রেসকোর্স ময়দানে সমবেত হলো স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক শোনার জন্য। লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে এসে দাঁড়ালেন, জনতার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। পাকিস্তান সরকারের কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চারটি শর্ত বা দাবি দিয়ে তার বক্তৃতা শেষ করলেন।

বঙ্গবন্ধু বললেন, আমার দাবি মানতে হবে এখন, তারপর তিনি বিবেচনা করে দেখবেন এ্যাসেম্বলীতে যাবেন, কি যাবেন না। তবুও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বললেন, এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

অনেকেই বলে থাকে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ৭১-এর ৭ই মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। ৭ই মার্চ '৭১ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। কারণ তখনও তিনি ৭১-এর ৭ই মার্চ পাকিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা না করে, স্বাধীনতা ঘোষণা করার অনুমতি চেয়ে গ্রহণের জন্য, পাকিস্তান সরকারের নিকট চারটি দাবি করলেন। তারপর এই দাবি মেনে নেওয়ার জন্য পাকিস্তান সরকারকে সুনির্দিষ্ট কোন সময় নির্ধারণ করে দিলেন না। তবে তাঁর নির্দেশ যে, অসহযোগ আন্দোলন সফল করতে যা করার প্রয়োজন তিনি তাই দেন, এবং সেই সাথে নতুন করে কোন আন্দোলন চালানোর চিন্তা নয় বরং আরও জোরদার নির্দেশ। সুতরাং অসহযোগ করলেন। ঢাকা শহর, অফিস, আদালত, কলকারখানা বন্ধ রাখার ঘোষণা করলেন। খাস ক্ষেত্রে কর্মচারীদের বেতন দিতে আদেশ করলেন। বিচার ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠানের বেতন পৌঁছে দিতে বললেন। কেননা, সৈনিকদের তাঁর আদেশ পালিতের না করলে বাঙালীদের প্রতি ট্রেনিংকালে বেতন দিতে দেবেনা।

আন্দোলনে নতুন মোড় দিল। পাশাপাশি যুদ্ধের [illegible] বাঙালিদের ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। কিন্তু ঠিক কবে থেকে বাঙালিদের যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবে এবং কিভাবে হবে তা নিয়ে ছিল অনিশ্চিত ও সংশয়। আওয়ামী লীগ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা ছিল না।

কোন এক অজানা কারণে ৭১-এর ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান [illegible] করে বাঙালিদের ঘোষণা করলেন না কেন, তা কখনো কোন দিন পরিষ্কার জানা যায়নি।

বিশেষজ্ঞ এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে যদি, ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যদি পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে ঘোষণা করতেন এবং [illegible] পাকিস্তানী সৈন্যদের বন্দী করতে বলতেন, তাহলে পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার যে লড়াই বা যুদ্ধ হতো, সেই যুদ্ধ অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই [illegible] বাংলাদেশ দেশ মুক্ত বা স্বাধীন হতো।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে) পাকিস্তানী সৈন্য সংখ্যা এতটা কম ছিল যে, পাকিস্তানী পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচ সৈন্য, বাঙালি সৈন্যদের চেয়ে অনেক কম এবং দুর্বলতর ছিল। আসলে এই পাকিস্তানী পাঞ্জাবী, সিন্ধি, বেলুচ সৈন্যদের অধিকাংশই ছিল অফিসার। তারা যুদ্ধ পরিচালনা করতে কিন্তু নিজেরা সরাসরি যুদ্ধ করতে না। এই অবস্থা সত্ত্বেও পাকিস্তানী সৈন্যদের [illegible] বাঙালি সৈন্য, ই. পি. আর (তৎকালীন ই. পি. আর) পুলিশ এবং আনসার দিয়ে প্রতিটি ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করলে তারা বেশি সময় টিকতে পারতো না।

কিন্তু [illegible] ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান [illegible] বাঙালিদের [illegible] না দেয়ায় এবং [illegible] পাকিস্তানের কাছে একটি [illegible] শর্ত [illegible] পাকিস্তান [illegible] এবং [illegible] বাংলাদেশে এসেছে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত বাংলাদেশে পাকিস্তানের যত সংখ্যক সৈন্য ছিল, ৭ই মার্চ শেখ মুজিবের ভাষণের পর (৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত) পাকিস্তান বাংলাদেশে তার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি করে এবং পাকিস্তানী অবাঙালী সৈন্যদের সংখ্যা বাঙালি সৈন্য সংখ্যার চাইতে বহুগুণ বেশি বৃদ্ধি হয়। [illegible] পাকিস্তানীরা সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ভাষণে পাকিস্তানীদের [illegible] সময় [illegible] করে দিয়েছেন। [illegible]

[illegible] পাকিস্তানি-সেনা [illegible] বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে [illegible]।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে আর এক পয়সাও পাচার হতে পারবে না। কিন্তু বাংলাদেশের [illegible] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান [illegible]।

ফলে পাকিস্তান এই অর্থ থেকে [illegible] ২৪ ঘণ্টা [illegible]।

পাকিস্তান আমাদের দেশ থেকে ১২ হাজার মাইল দূরবর্তী একটি দেশ। [illegible] বাংলাদেশ আর পাকিস্তানের [illegible] পাকিস্তানের [illegible]। [illegible] বিশ্বের [illegible] বাংলাদেশের [illegible] ছিল না। [illegible] ভৌগোলিক [illegible] আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়া [illegible] ছিল। [illegible] যে, [illegible] যুদ্ধ, [illegible] আমাদের দেশ স্বাধীন হবে। কিন্তু [illegible] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান [illegible] পাকিস্তানীদের [illegible] স্বাধীনতার জন্য তিন লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হলো (তিন লক্ষ [illegible] সংখ্যা [illegible])। দুই লক্ষ মা বোনকে [illegible] হলো (এই দুই লক্ষ [illegible])। [illegible] শেখ মুজিবুর রহমান [illegible] স্বাধীনতার জন্য [illegible]। [illegible] পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে [illegible] স্বাধীন [illegible]। পাকিস্তানীরা [illegible] যুদ্ধ বা মুক্তি যুদ্ধ [illegible] মুক্তিযুদ্ধ [illegible]। [illegible] পাকিস্তানীরাই আমাদের স্বাধীন হতে [illegible]।

"(১) [illegible] শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানীদের কাছে যে ৪টি দাবি করেছিলেন— (১) সামরিক আইন [illegible] তুলে নিতে হবে। (২) সকল সেনাবাহিনীকে [illegible] ফিরিয়ে নিতে হবে। (৩) [illegible] হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। (৪) [illegible] প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। [illegible] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী [illegible] হবে।

এই দাবিগুলো যদি পাকিস্তানিরা মেনে নিত তাহলে কি আমাদের মুক্তিযুদ্ধ করতে হতো? পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে [illegible] স্বাধীন হতো বাংলাদেশ? [illegible] শেখ মুজিবুর রহমানের এই [illegible] দাবি পাকিস্তানে [illegible] মেনে নিত তাহলে আর যাই হোক, এই [illegible] বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নেতা। পাকিস্তানীরা যদি শেখ মুজিবকে নির্বাচিত নেতা হিসেবে ক্ষমতা দিতো। যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে তো আমরা নিশ্চয়ই পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র হতাম না। বঙ্গবন্ধুও তা চাইতেন না। জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বাঙালী জনপ্রতিনিধিদের হাতে পাকিস্তানে সামরিক শাসকেরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এবং বাঙালি জনপ্রতিনিধিরা পাকিস্তান সরকার পরিচালনা করবেন এই তো ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রকৃত কথা। পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল বাঙালি। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীরা পাকিস্তান শাসন করবে এটাই ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূল মত। এমন প্রমাণও ঐতিহাসিক বিবরণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের শেষ ব্যক্তি, যিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতায় পুরোপুরি বিশ্বাসী ছিলেন।

ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল পূর্ণ আনুগত্য। পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাক, পাকিস্তান টুকরো হয়ে যাক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কখনই তা চাননি। আর সেজন্যই রাজনৈতিক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরির জন্য কোন প্রত্যক্ষ কার্যকর ভূমিকা নেননি।

শেখ মুজিবুর রহমানের এই আদর্শ স্থাপন হলো ট্রিমেনডাস কমিটমেন্ট টিপস। সে কারণে পাকিস্তান রক্ষার শেষ চেষ্টা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জোরদার হয়ে ছিল। আবার ক্ষমতা না দেওয়া হলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা উঁকিঝুঁকি দেওয়া শুরু হলো।

এই আদর্শের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর কারণ ছিল, যিনি ইতিহাসের অদ্বিতীয় এক অনন্য ঐতিহাসিক চরিত্র। সে কারণে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেও স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

সে কারণেই আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণার তারিখ ও দিন এবং স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে চির বিতর্ক।

অথচ ২৬শে মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি আমরা মূল কারণ হলো, ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২টার পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঢাকার বাঙালির উপর পৈশাচিক আক্রমণ ও গণহত্যা শুরু করে। ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১২টার পর কার্যত পরিক্ষ সময় অনুযায়ী যা ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহর শুরু হয় বলেই ২৬শে মার্চকে আমরা স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করি। অনুরূপভাবে পাকিস্তানী সৈন্যদের আক্রমণ এবং পরিচয় জানান হিসেবে নিয়েই, ২৬শে মার্চের স্বাধীনতা দিবস শুরু হয়। এই হিসেবে যদি পাকিস্তানীরা আমাদের ২৬শে মার্চের

আগে অথবা পরে যে কোন দিন আক্রমণ করতো তাহলে সেই দিনটিই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে চিহ্নিত হতো।

সত্যি কথা বলতে কি, কেউই সঠিক সময়ে পূর্বাহ্ণে আমাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। যদিও বলা হয়ে থাকে ২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু টেলিগ্রামের ঐ ঘোষণার যথার্থতা খুঁজে পাওয়া যায়নি। টেলিগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাটি তৎকালীন সময়ের সাড়ে সাত কোটি বাঙালির কেউ পেয়েছে বা শুনেছে আজ পর্যন্ত এমন দাবি কেউ করেনি।

২৩শে মার্চ হলো পাকিস্তান দিবস। এই ২৩শে মার্চে পাকিস্তান দিবসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) সহ সারা পাকিস্তানের সকল সরকারী-বেসরকারী ভবন এবং শহরের বাড়িগুলোতে সবুজ-সাদা চানতারা পাকিস্তানী পতাকা তোলা হতো। শহরের রাস্তাগুলো পাকিস্তানী পতাকা দিয়ে সাজানো হতো এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিয়ে ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস পালন করা হতো। কিন্তু '৭১-এর ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশের) কোথাও, কোন সরকারি বেসরকারি ভবনে পাকিস্তানী পতাকা তো উত্তোলন হয়নি বরং জনগণ স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) প্রতিটি সরকারি বেসরকারি ভবনে, প্রতিটি বাড়ি ঘরে, রাস্তাঘাটে, গ্রাম বাংলার মাঠে ঘাটে এমনকি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাস ভবনে সবুজের মাঝে লাল বৃত্তের উপর হলুদ রংয়ের বাংলার মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানের সর্বনাশকে জানালো। পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকা উড়লো না। পাকিস্তানী সেনারা কুচকাওয়াজ করলো না। পাকিস্তানের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীপ্ত গলায় সোজাসুজি স্পষ্ট করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। কি এক অজানা কারণে শেখ মুজিবুর রহমান মুখ খোলেননি, নীরব ছিলেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বৈধ রাজনৈতিক দায়িত্ব কেবলমাত্র শেখ মুজিবকেই বাঙালি জাতি দিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর প্রতি প্রদত্ত রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি।

ঐ পরিস্থিতিতে অন্য কারো পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করা সম্ভব ছিল না। কেননা শেখ মুজিব ছিলেন বাঙালির আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। আর পাকিস্তানীরা ভয়, লোভ কোন কিছুর বিনিময়েই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা চান না এই রকম কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারেনি। যদি শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার বিপক্ষে কোন কথা বলতেন, তাহলে আমাদের স্বাধীনতা পাওয়া ক্রিটিক্যাল হয়ে যেত।

অপর দিকে ২৭শে মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান দুই দফা স্বাধীনতা ঘোষণা দেন। মেজর জিয়াউর রহমান প্রথম ঘোষণা দেন, "আমি এম মেজর জিয়া প্রেসিডেন্ট পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ আই ডিক্লিয়ার ইনডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ।

মেজর জিয়াউর রহমান দ্বিতীয়বার ঘোষণা দেন, "আমি এম মেজর জিয়া, আই ডিক্লিয়ার ইনডিপেনডেন্ট অব বাংলাদেশ, অন বিহাফ ওভার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবর রহমান।

মেজর জিয়াউর রহমান বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস) পুলিশ এবং জনগণকে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। এবং সারা দুনিয়ার কাছে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহায্যের আবেদন জানান। মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় এই ঘোষণা দেওয়ার আগেই ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতের অর্থাৎ পড়ন্ত রাত অনুযায়ী ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরেই ঢাকাতে ই পি আর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস) এবং পুলিশ পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে দেয়। পাকিস্তানি সেনারা ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং ঢাকার পিলখানায় ই.পি.আর হেড কোয়ার্টারে আক্রমণ করলে ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস (অধুনা বি.ডি.আর) এবং পুলিশ পাকিস্তানীদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে পাল্টা আক্রমণ করে। এবং আমরা চাক্ষুষভাবে ঐ রাতেই ঢাকার বিভিন্ন থানা থেকে পুলিশের রাইফেল এনে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেই। কিন্তু আমাদের রাইফেল চালানোর (ট্রেনিং) প্রশিক্ষণ না থাকায় আমরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ঐ রাতে যুদ্ধ শুরু করতে পারিনি। ই. পি. আর. ও পুলিশের ঐ রাতের যুদ্ধটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কারো কোন প্রকার নির্দেশ বা ঘোষণা ছাড়াই ই. পি. আর ও পুলিশ পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে ২৫শে মার্চ দিবাগত গভীর রাতেই যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। আসলেও সত্য যে মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭শে মার্চের সন্ধ্যায় স্বাধীনতা ঘোষণায় মুক্তিপাগল কোটি বাঙালি জাতি উৎফুল্লভাবে আন্দোলিত হয়েছিল। অনুপ্রাণিত হয়েছিল। বিশেষ করে যারা দেশের জন্য যুদ্ধ করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়েছিল তাদের মধ্যে জিয়াউর রহমানের এই স্বাধীনতা ঘোষণা অভূতপূর্ব চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, উদ্দীপনা ও প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার কোনরূপ চেষ্টা না করেই পাকিস্তানীদের হাতে গ্রেফতার হন। অনেকের ধারণা তিনি কিছুটা ইচ্ছাকৃতভাবেই পাকিস্তানীদের হাতে বন্দী হন বলে অনুমান করা হয়।

২৬শে মার্চ থেকে ঢাকার অধিবাসীরা বিশেষ করে প্রায় লক্ষ লক্ষ নরনারী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নিরাপত্তার খাতিরে ঢাকা শহর ছেড়ে পায়ে হেঁটে গ্রামের দিকে ছুটে যায়। শহর ছেড়ে চলে যাওয়া মানুষের এই কাফেলাকে একমাত্র

গ্রাম [illegible] কামানের শব্দেই [illegible] কাজ চলে। সমস্ত গ্রাম আর গ্রামের মেঠো পথ ধরে ছুটে শহর ছেড়ে পালিয়ে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষ [illegible]।

শহর থেকে আসা লাখ লাখ মানুষকে গ্রামের কৃষক-কৃষাণী নিজের সন্তানের মত আপন বুকে ঠাঁই দেয়। গ্রামের মানুষ রাস্তায়, পথে, মাঠে, খাটি চিড়া, দই, মুড়ি, ভাত, যা কিছু সম্ভব সঙ্গে ছিল তার সবটুকুই উজাড় করে বাড়িয়ে দিয়েছে শহর থেকে আসা মানুষের সাহায্যে। শহর ছেড়ে পালিয়ে আসা মানুষের একটুও কষ্ট যেন না হয়, তার সব দায়িত্ব গ্রামবাসীর। গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে দিন-রাত ভাত রান্না হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ খাচ্ছে। কে খাচ্ছে? কার বাড়িতে খাচ্ছে? কার কত খাচ্ছে? কেউ তা জানে না। যারা খাচ্ছে তারা জানে না কে খাওয়াচ্ছে। আর যারা খাওয়াচ্ছে তারাও জানে না কাদের খাওয়াচ্ছে। মানুষে মানুষে এ এক মহা মিলন, এক মহা আত্মীয়। কখনো পৃথিবীতে এমন হয়েছে কিনা, কিংবা আর হবে কিনা জানি না। মানুষ মানুষের এত আপন! নিজের চাইতে মূল্যবান অপরজনের এ রূপ যারা দেখেনি তারা কোনদিন বুঝবে না। তাদের কোনদিন বুঝানো যাবে না। পৃথিবীতে এমন কোন ভাষা নেই, শব্দ নেই, এমন কোন লেখক নেই যে লেখক ঐ সময়ের মানুষে মানুষে ঐক্য, মমত্ববোধ, সহমর্মিতা আর নিজের চাইতে অপরকে বেশি ভালবাসার চিত্র তুলে ধরতে পারবে। ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে [illegible] [illegible] গ্রামের বাড়িতে গিয়েছি। [illegible] নদী পার হয়েছি। [illegible] হয়েছি, [illegible] নদী। [illegible] দিন-রাত [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]। একটি পয়সাও খরচ হয়নি। কোথাও একটি পয়সা লাগেনি। [illegible] মানুষ খাইয়েছে। [illegible] নদী পার করে দিয়েছে। [illegible] [illegible], নদী পার করে দেওয়া, এসব গ্রামের মানুষের মহা পবিত্র নৈতিক দায়িত্ব ছিল।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] গ্রহণ করেছে। [illegible] [illegible] মা-বোনেরা [illegible] [illegible] [illegible] তুলে নিয়েছে আপন করে।

[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] মুক্তিযুদ্ধ [illegible] [illegible]। কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা [illegible] যায়, মুক্তিযুদ্ধ করা যায়? ১৭ই এপ্রিল [illegible] [illegible] [illegible] থেকে [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি বিশেষ অনুষ্ঠান [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একটি বিশেষ অনুষ্ঠান [illegible] [illegible] [illegible]।

দেশপ্রেমবোধের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুষ্ঠান। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এবং বাঙালির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ দিন এবং শ্রেষ্ঠ [illegible] [illegible]। [illegible] ১৭ই এপ্রিল, কুষ্টিয়া মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-এর নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার [illegible] শপথ [illegible] [illegible]।

মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার নাম ইতিহাসের পাতাকে দিয়ে নতুন করে নাম হলো মুজিব নগর এবং এই মুজিবনগরেই তাজুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হলো বাংলাদেশের প্রথম এবং বিপ্লবী সরকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে করা হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি এবং তার অনুপস্থিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। এবং তাজুদ্দিন আহমেদকে করা হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তাজুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভাও গঠিত হলো। কর্নেল ওসমানীকে করা হলো প্রধান সেনাপতি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, প্রধান সেনাপতি সকলের শপথ অনুষ্ঠান হলো এই মুজিব নগরে। এখানেই প্রবাসী সরকারকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়েছে। শুরু হলো মুক্তিযুদ্ধের নতুন যাত্রা। বাঙালীর ইতিহাসে সংযোজিত হলো নতুন অধ্যায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সুসংগঠিত হলো। আমাদের দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিল। আমরা যারা যুদ্ধ করতে পারবো কিশোর, তরুণ, যুবক তাদেরকে ভারতে নিয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ (আর্মি ট্রেনিং) দিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধা বানান। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার জন্য শুধু প্রশিক্ষণ নিলে মুক্তিযোদ্ধা হয়? হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা হলো। আমাদের পাড়ার অনেক বাড়ি থেকে অনেক ভারতে চলে গেলো। এই পাড়াতেই আমি জন্মেছি। শিশু থেকে কিশোর হয়েছি। এখানেই আমার সব বন্ধু-বান্ধব। গ্রামের বাড়িতে আমার কোন বন্ধু-বান্ধব নেই। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য অন্তত একজন বন্ধু তো খুঁজে পাবো; আমাকেই আমার সকল সহযোদ্ধা ভারতে চলে গেলো। প্রতিদিন ভাবি মুক্তিযুদ্ধে যাব। কিন্তু রাতে শুধু মা'র কথা মনে হয়। মনে হয় আমি যুদ্ধে চলে গেলে মা শুধু কাঁদবেন। আমার জন্য মা অনেক কষ্ট পাবেন, অনেক কাঁদবেন। আমার বাবা নেই কেউ নেই, শুধু মা। আমাকে ছাড়া মা কিছুই ভাবে না। মা'র জন্যই মনটা আমার কেমন যেন করে। কেমন যেন সব কিছু এলোমেলো হয়ে যায়। এইভাবে ভাবতে ভাবতে অনেক দিন চলে যায়। মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার জন্য মনটা আমার অস্থির হয়ে আছে। কিন্তু মাকেও ছাড়তে পারি না, মুক্তিযুদ্ধেও যাওয়া হয় না।

একদিন আমার মনে হলো, সব ছেলেরই তো মা আছে। কেউ যুদ্ধে গেলে মা তো কাঁদবেই। মা'র কান্নার কথা ভেবে ছেলে যদি মুক্তিযুদ্ধে না যায়, তাহলে তো মুক্তিযুদ্ধ হবে না। দেশও স্বাধীন হবে না। না, মা কাঁদে কাঁদুক, আমাকে মুক্তিযুদ্ধে যেতে হবে। দেশ স্বাধীন করতে হবে। পাড়ার মিন্টু ভাইয়ের বাড়ির সামনে একদিন হঠাৎ আমার ছোট মামা নজরুল আর মামুন ভাইয়ের সাথে মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার কথা বলে ফেললাম। সাথে সাথেই মামুন ভাই রাজি হয়ে গেল। আসলে আমি তো এই রকমই ভাবছিলাম এবং এই রকম একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম।

তারপর স্নান আহার করে একটানা ঘুম থেকে দু'জনে আগরতলার দিকে রওয়ানা হলাম।

আমরা দু'বন্ধু অনেক পথ পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নদীর পাড়ে একটি বাড়িতে এসে পৌঁছলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা। শ'খানেক পুরুষ-মহিলা-শিশু আগে থেকেই নদী পার হওয়ার জন্য এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে অপেক্ষা করছে। বাড়ির নদী ঘাটে ছোট একটি ডিঙি নৌকা বাঁধা আছে। এই ছোট নৌকাটিতে আট দশজনের বেশি লোক একসাথে পার হওয়া যাবে না। এই বাড়ির কোন মানুষ এখানে নেই। শুধু কয়েকটি লাশ পচে গলে পড়ে আছে। আর এই যে শ'খানেক মানুষ, এরা সবাই শরণার্থী হয়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য এখানে জড়ো হয়ে আছে। সন্ধ্যার পর নৌকার মাঝি এসে নদী পার করে দিবে সেই অপেক্ষায় আছে। নদীতে পাক সেনারা গানবোট নিয়ে টহল দিচ্ছে। দিনের বেলায় নদী পার হতে গেলে দেখে ফেলবে এবং আর্মিরা গুলি করে মেরে ফেলবে। তাই রাতের অপেক্ষায় আছে সবাই। রাতের অন্ধকারে নদী পার হতে হবে। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বেশ গাঢ় অন্ধকার। হঠাৎ নদীতে পাকিস্তানী আর্মির গান বোটের সার্চ লাইটের আলো দেখা গেল। এই দিকেই আসছে গান বোটটা। চাপা কান্না শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ বলছে কাঁদিবেন না ভাই, কাঁদিবেন না, আল্লাহকে ডাকেন।

গান বোটটা দ্রুত এই দিকে ছুটে আসছে। সবাই মৃত্যু ভয়ে চুপসে গেল, কারো কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু গানবোটের আওয়াজ আর সার্চ লাইটের আলো। আমরা সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম যাতে গানবোটের সার্চ লাইটের আলোতে দেখা না যায়। বুকের ভেতর ভয়। তার উপর মানুষের পচা লাশের গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসছে।

দিন চারেক আগে পাকিস্তানী হানাদাররা এই বাড়িতে হানা দিয়ে এই মানুষগুলোকে হত্যা করেছে। আবাল বৃদ্ধ-বনিতা কারো মুখেই কোন শব্দ নেই। সবার শুধু আল্লাহ রসুল (সাঃ) আর ঈশ্বরের নাম। গানবোটটি ক্রমেই এগিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে মৃত্যু কাছেই এগিয়ে আসছে। মৃত্যু এখন শুধু কয়েক মিনিটের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবাইকে বললাম, কেউ শোয়া থেকে উঠবেন না, নড়াচড়াও করবেন না, কোন কথা বলবেন না। সবাই মাটিতে যেভাবে শুয়ে আছেন ঠিক এইভাবেই থাকবেন। কোন প্রকার চিৎকার বা ছোটাছুটি মানেই নিশ্চিত মৃত্যু। আল্লাহ পাক যদি সহায় থাকেন তাহলে আমরা এভাবেই বেঁচে যাব। এ ছাড়া আমাদের আর বাঁচার কোনই পথ নেই। সবাই সৃষ্টি কর্তাকে স্মরণ করেন।

গানবোটটি একেবারে বাড়ির পাশে এসে পড়লো। সার্চ লাইটের তীব্র আলোয় আলোকিত হলো সারা বাড়ি। বাড়ির আঙিনায় আমড়া গাছগুলোর যে গাছ ছায়া

ছিল তাও স্পষ্ট দেখা গেল। ফসফোরাসের মত জ্বলে এমনিতর তার জ্বলাই হবে গেল। আমলো না। একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই যেন নতুন জীবন নিয়ে বেঁচে উঠলো। কিছুক্ষণ পর নৌকার মাঝি এসে। কয়ে আগে কে যাবে, এক সঙ্গে লাফিয়ে নৌকায় উঠে পড়লো। যা হবার তাই হলো। ভীরেই নৌকা ডুবে গেল। নৌকা ডুবে পানি ফেলে মাত্র আধানো হলো, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সবাই নৌকায় লাফিয়ে উঠলো। পানি সেচে নৌকা আবার আধানো হলো। আমরাও সবাই এক সঙ্গে উঠতে গিয়ে ডুবিয়ে দিল নৌকা। শিশু আর মহিলারা কাঁদতে শুরু করলো। আমি আর আমার বন্ধু কয়জন আমাদের উচ্চ কণ্ঠে একের সুরে বললাম, আমরা দু জন সবার শেষে যাব। এভাবেও পানি থাকতে আমরা যাব না। সবাই নদী পার হওয়ার পর আমরা পার হবো, কে কে আমাদের সঙ্গে নদী পার হবেন?

কেউই কোন কথা বলল না। সকলেই চুপ।

আমরা কথা দিলাম সবাই আগে যাবেন— আমাদের আগে যাবেন। আমরা যাকে বলবো সেই নৌকায় উঠবেন। নইলে নৌকা আর ডুলবো না, সবাই একসঙ্গে মারা পড়বো। অনেকক্ষণ পরে উঠলো ঠিক আছে, আপনারাই ঠিক করে দিবেন কে কখন উঠবে। কেউ কেউ বলে উঠলো আপনারা নিজেরাই আমাদের ফেলে চলে যেতেন না।

কালাম, দেখতেই তো পাবেন ঘাই কিনা। আমাদের কথা শুনেন, সবাই নদী পার হতে পারবেন এবং আমাদের আগে পার হবেন।

আবার নৌকা ডুবে পানি ফেলে নৌকা আধানো। তখন দিকে থেকে এক এক করে সাতজন করে নৌকায় তুললাম। নৌকা ছেড়ে গেল। পানিয়ে দিয়ে আবার নৌকা ফিরে এলো। শেষ ট্রিপ-এ আমরা দু'জনেই পাঁচজন নৌকায় উঠে নদী পার হলাম।

নীরবতার কথাকাটি যারেন আমি আমে একজন লোকের বাড়িতে যাই কাটিয়েছি পর সকাল বেলায় আমার বন্ধু কয়জন আমাদের কাছে ছেড়ে দিল। সে চলেয়া ফিরে আসবে। আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে। বাবুল আজাদ কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকলো, তাকে আমি কত ভোলাই, সে আমাকে ফিরে যায়। ফিরিয়ে কত দেখেছি। বিদি হলো বাবুল আজাদ আর আমার বাবার ঠিক উল্টো নিজের চেয়ে কত বড় এক বড়ী মেয়েদের চেয়ে। বাবুল আজাদের চেয়ে কম, দুই জন চেয়ে। সব দিক দিয়েই ভাল। আচার ব্যবহার অমায়িক, দেখতে সুন্দরী, ভাল স্বাস্থ্য, সবার প্রিয়। (বোঝা ফিরিয় করার মুহূ) হয়েছে। আমাদের কাছে ফোন আছে বিধি যেন হেয়েছে যান) বাবুল আজাদ বলেছে, কাল্পুর ফিরে আসবে বলেছে বাবুল তুমি মুছে যেও না। তুমি মরে গেলে আমি কাকে

ভালবাসবো? তুমি ছাড়া আমি কাউকে ভালবাসতে পারব না। তুমি ফিরে এসো নইলে আমাকেও নিয়ে যাও। ইত্যাদি ইত্যাদি বলতে বলতে সে কি কান্না বাবুল আক্তারের। আমার কাছে বাবুলের দাবী, চল আমরা ঘরে ফিরে যাই।

কান্না যখন কিছুতেই থামাতে পারলাম না, তখন বললাম, তুই ফিরে যা। আমি ফিরে যাব না। আমি যুদ্ধে যাব।

বাবুলের উত্তর আমি তোকে ফেলে একা ফিরে যাব না। চল দুজনেই ফিরে যাই।

না, আমি ফিরে যাব না, তুই ফিরে যা।

না, আমি তোকে ছাড়া ফিরে যাব না।

বাবুল আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে, আমি ফিরে যাব না। বাবুলের কান্না থামে না। এক পর্যায়ে বললাম, সীমান্তের কাছেই তো চলে এসেছি, চল আর একটু সামনে গিয়ে দেখি কি হচ্ছে। তারপর ফিরে যাব।

এবার বাবুল আক্তার রাজি হলো। কান্না থামাল। আমরা এবার সীমান্ত লক্ষ্য করে চলতে শুরু করলাম। যতই সীমান্তের কাছে যাচ্ছি ততই বেশি করে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

অনেক চড়াই—উৎরাই পার হয়ে দু'দিন পর ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গিয়ে পৌঁছলাম। পথের অনেক কাহিনী, সব লিখলে ফুরাবে না। কলেজের যে জায়গায় আমরা গিয়ে উঠলাম। জায়গাটা বেশ উঁচু পাহাড়ের মত, তবে পাহাড় না। এই জায়গায় উঠেই দেখি খাকি পোষাক পরা চার পাঁচ জন আর্মি একটা বাংকারে দাঁড়িয়ে আছে এবং আরো সাত আট জন আর্মি দাঁড়িয়ে মানুষের সাথে কথা বলছে। দেখেই তো আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। এ আর্মি কোথায় এলাম, যে আর্মির ভয়ে সাত পাঁচ কত কষ্ট করে এলাম আর এখানে এসে সেই আর্মির একেবারে মুখের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম! ভয়ে আমি হিম হয়ে গেলাম। কিছুক্ষণ ভয়ে তটস্থ থাকলাম। তারপর ধীরে ধীরে তাকিয়ে দেখলাম ওদের মাঝে কোন প্রতিক্রিয়া নেই; আর্মি যার যার কাজে ব্যস্ত। আমি চিন্তা করতে লাগলাম—ওরা চেনে না তো? পরে বুঝলাম, ও এটাতো ভারতের এবং ভারতীয় আর্মি। পৃথিবীর সব দেশের আর্মির পোষাকই যে এক এটা আমার জানা ছিল না।

আমরা বাংলাদেশী ক্যাম্প বা শিবিরে না গিয়ে, সোজা কলেজ টিলায় চলে গেলাম। কলেজ টিলা হচ্ছে আগরতলার এম, বি, বি, কলেজ ক্যাম্পাস। এই কলেজ টিলাতেই বাংলাদেশের প্রাক্তন ও বর্তমান অনেক নেতারা থাকতেন। এখানেই ছিল সংগ্রাম পরিষদের অফিস। শেখ ফজলুল হক মণির অফিস সেখানেই। (পূর্ব পাকিস্তান

ছাত্রলীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, আওয়ামী যুবলীগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, দৈনিক বাংলার বাণী ও দৈনিক টাইমস পত্রিকার সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগনে। '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মনিকেও হত্যা করা হয়) আ. স. ম. রব (ডাকসুর ভিপি, জাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক, হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ-এর ৮৮ সালের পার্লামেন্টের গৃহপালিত বিরোধী দলীয় নেতা। সর্বশেষ খবরে জানা, শেখ হাসিনার ঐকমত্যের সরকারের মন্ত্রী।)

আব্দুল কুদ্দুস মাখন ('৭০-'৭১-এর ডাকসুর ছাত্র সংসদের জি. এস. '৯০ দশকে মারা যান এবং মীরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে মুক্তিযোদ্ধা কবরে তাকে দাফন করা হয়) এম, এ, রশিদ (পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক, স্বাধীনতার পূর্বের পাইকপাড়া, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, বর্তমানে ব্যবসায়ী)। শেখ ফজলুল করিম সেলিম (যুবলীগ নেতা, শেখ মনির সহোদর, বর্তমানে দৈনিক বাংলার বাণীর সম্পাদক, যুবলীগের চেয়ারম্যান আওয়ামী সংসদ সদস্য)। মিজানুর রহমান মিজান (এককালে ছাত্রনেতা, আব্দুল কুদ্দুস মাখন-এর ভগ্নীপতি, বর্তমানে ঢাকা জেলার এ. ডি. সি. রাজস্ব) প্রমুখ এর তত্ত্বাবধানে কলকাতাস্থিত থেকে বাংলাদেশের যুবকদের মুক্তিবাহিনীর (মুজিব) হয়ে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য ভারতের বিভিন্ন ট্রেনিং ক্যাম্পে পাঠানো হতো।

এই আগরতলাতে গিয়ে আমরা মনি ভাই, মাখন ভাই, রশিদ ভাই এবং মিজান ভাইদের সাথে দেখা করলাম। তোমরা বললেন যতদিন ট্রেনিং-এ যাওয়া না হয় এখানে থাক। আমরা সারাদিন আগরতলায় ঘুরে বেড়াই, রাতে ক্যাম্পে ঘুমাই। এভাবে প্রায় মাস খানেক চলে গেল। আমরা সাথে করে বাড়ি থেকে যে টাকা-পয়সা এনেছিলাম তা শেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। এদিকে ট্রেনিং-এ যেতে আরো বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এই অবস্থায় বন্ধু মামুন আমাকে একদিন বললো, দোস্ত তুমি থাক, আমি ঢাকায় যাই, আরো বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসি।

আমি সাথে সাথে মামুনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। বললাম, না ট্রেনিং এ যতদিন না যাই ততদিন খেয়ে না খেয়ে কষ্ট করতে থাকি।

কথাটায় মামুন খুশী হতে পারলো না। দিনে একমুঠো ভাত খাইতেও পাই না অবস্থা। আর মামুনের প্রতিদিন একই কথা—তুই থাক আমি ঢাকায় যাই টাকা পয়সা নিয়ে আসি।

আমি বলি, না তুই ঢাকা গিয়ে ফেরত আর আসবি না।

মামুন আমাকে বুঝায়, দোস্ত শোন, আমি যদি এখান থেকে চলে যেতে চাই, এখান কি চলে যেতে পারি না? তুই কি আমাকে পাহারা দিয়ে রেখেছিস? আমি ঢাকা যেতে চাইলে তো যে কোন সময় চলে যেতে পারি, তোকে বলে যাওয়া

দরকার কি? আমি এই জন্যই তোকে বলে গেছে ভাই যাতে তুই জল ঘোলা না করিস। তুই বিশ্বাস কর, আমি কথা দিলাম ঠিকই টাকার যোগাড় করে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আবার তোর কাছে ফিরে আসবো।

আমি বাবুলের কথা বিশ্বাস করলাম না।

যে ছেলে বাংলাদেশে থাকতেই আমার কাছ থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছিল, সেই ছেলে এখন সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ঢাকায় বাড়িতে ফিরে গিয়ে টাকা নিয়ে আবার আগরতলায় আমার কাছে ফিরে আসবে! এটা কিছুতেই বিশ্বাসযোগ্য না। তবে চিন্তা করলাম বাবুল তো যেকোন মুহূর্তেই আমাকে না জানিয়ে বাংলাদেশে চলে যেতে পারে। ওকে ধরে রাখার কোন উপায় তো আমার নেই। না বলে পালিয়ে যাবে তার চাইতে আমিই বাবুলকে বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেই। সেই ভাল। আমি বাবুল আজাদকে চলে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। দু'ভাই সীমান্তে এলাম, একজন আর একজনকে জড়িয়ে ধরলাম।

অশ্রুসজল চোখে আমি বাবুল আজাদকে বিদায় দিলাম। মনে হলো যেন আর দেখা হবে না। এ দেখাই শেষ দেখা। বিদায়ের বেলায় শুধু বললাম, আম্মাকে সান্ত্বনা দিস।

আমি টিলার উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সামনে সবুজ ভূমি, বাংলাদেশ। বাবুল ধীরে ধীরে বাংলাদেশে চলে গেল। পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম বাবুলের যাওয়ার দিকে। দৃষ্টির বাইরে যেতে যেতে বাবুল আস্তে আস্তে ছোট হয়ে গেল। এক সময় দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে গেল বাবুল আজাদ। টিলার উপর ঐ একই স্থানে কতক্ষণ নির্বাক, পলকহীন, আবেগতাড়িত হৃদয়ে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। আরণ্যক এক শিস টিলার পাশে সন্ধ্যা নিয়ে এলো। একটানা ঝিঁঝি ডাকে আমার চিন্তায় ছেদ পড়লো। নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হলো। অনেকক্ষণ ঘুম এলো না। রাতভর শুধু বাবুলের কথা মনে হলো। কোথায় সেখানে বাবুলের খবর হয়ে গেল। অনেক আগে টিলার আমরা যারা আছি তাদের খুব তাড়াতাড়ি ট্রেনিং-এ পাঠানো হবে। মনে খুব আনন্দ লাগলো। মুক্তিযোদ্ধা হব। দেশের মুক্তির জন্য যুদ্ধ করব। বাবুল আজাদের কথা মনে হলো। বাবুল আজাদ আর আসবে না, জানি। যদিও যদি আসে, আমাকে পাবে না। কারণ সেখানে আমি ট্রেনিং-এ চলে গেছি। আমার সাথে বাবুল আজাদের আর দেখা হবে না। যদি বেঁচে থাকি, বাবুলও যদি বেঁচে থাকে, দেশ স্বাধীন হলে হয়তো দেখা হবে। মিজানুর রহমান চিশতী ভাই খুব আন্তরিক লোক। আমাকে ডেকে বললেন, রেডি হও, তুমি কাল বিকেলে আমাদের ট্রেনিং-এ যাবে। তুমি ছোট তো তাই একটু অসুবিধা হবে। তোমাকে ছোট বলে ট্রেনিং দিতে চাবে না, তুমি চিন্তা করো না। আমি সব ঠিক করে দেব।

বিকেলে আর্মি-র ট্রেনিং-এর নির্দিষ্ট দিন। তাই খুব একটা সময় পাচ্ছিলাম না। বাবুল ভাই তো বেশ কয়েক দিন যুক্ত হয়ে গেল। আমার পরিচিত গিয়েছে সবাইতেই শীঘ্র যাবো। এখনো বাবুল এলো না! আগামী পরশু দিন সকাল সাতটায় আমি ট্রেনিং-এ চলে যাব। সময় ঘনিয়ে এসেছে। সাথীদের নামগুলো আমার যেভাবেই হোক, বাবুল আমার বলবে, কেউ আমি জানি না।

আমি খুব ভেবেছি না, ঠিক ঠিক ভেবেছি, বিকেলে খুব ইচ্ছে পাচ্ছিলাম না। রাত্রি দশটায় বাবুল আমার এসেছে (বিশেষভাবে আমার আহমেদ চৌধুরী ১৯৯৮ সালে আওয়ামী সরকার-এর সময় থেকে ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনানিবাস (ক্যান্টনমেন্ট) ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদে ছাপে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৮/৯৯-সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয়, তাতে আমার সেই তালিকায় ১নং এলিজম-এর ৪৩১ নং "মো: বাবুল হোসেন, পিতা: এ, কে আজাদ ৬৪ বি, কে, দাস রোড ফরাশগঞ্জ, ঢাকা।" মো: বাবুল হোসেন এর ডাক নাম হলো বাবুল আজাদ)। তবু একা বাবুল আমার আসেনি। সঙ্গে আমার বন্ধু মনির নামে একজনকে নিয়ে এসেছে (বিশেষভাবে আমার আহমেদ চৌধুরী ১৯৯৮ সালে আওয়ামী সরকার-এর সময় থেকে ৭১-এর মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংগ্রহ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেনানিবাস (ক্যান্টনমেন্ট) ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদে ছাপে এবং তার পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৮/৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারে (প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে) মুক্তিযোদ্ধাদের যে তালিকা সংরক্ষিত হয়, তাতে আমার সেই তালিকায় ১নং এলিজম-এর ৪৩৩ নং "মো: আব্দুল হালিম সিদ্দিক পিতা: মো: মুবেশ আলী ৫৩ নং বি, কে, দাস রোড ফরাশগঞ্জ ঢাকা।" মো: আব্দুল হালিম সিদ্দিক-এর ডাক নাম হলো মনির। বর্তমানে মনির সপরিবারে আমেরিকায় বসবাস করে।) মনির আমাদেরই পাড়ার ছেলে। আমি তখন মনিরকে খুব ভালো চিনতাম না। এই প্রথম দেখলাম মনিরকে। বিকেলে বাইরের কাজ নিয়ে গেলাম। আমার দু'জন আর আমি ট্রেনিং যাব না। সে কারণেই তো বাবুল আমাকে ও মনিরকে আমার সাথে ট্রেনিং-এ পাঠাতে চাচ্ছে।

আমার দিন সকালে মনির বললো, তার বড় ভাই বন্টু ভাই আগরতলাতেই আছেন।

ট্রেনিং বাসিতের বড় ভাই বন্টু ভাইয়ের সন্ধানে। তাঁকে ঢেকে বললাম বন্টু ভাইকে। বন্টু ভাই ট্রেনিং শেষ করে অস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন যুদ্ধ পাঠাবে অপেক্ষায় আছেন। বন্টু ভাইয়ের আগেই এখানে আমার সেজো ভাই তখন সামনে থাকে (বর্তমান পত্রিকা যোগাযোগকারী) আমার বড় ভাই ডি, এস, মজিবুর রহমান বন্টু ট্রেনিং-শেষ করে এসেছে আগেই তারপর অপেক্ষায় আছে

গেছে। অনেক দিন পর ফিরে এসে দেখা হলো শহীদ তাহিরের সাথে। শহীদ ভাই আমার থেকে ভাই মতিয়ুর রহমান ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমাদের অনেক বছরের সহযোদ্ধা এ. টি. এম।

শহীদ ভাই আমাদের পাঠিয়ে দিলেন চেকুয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে সামরিক প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য। নিজাম ভাইয়ের বাড়ীতে পরের দিন সকালে আমরা তিন বন্ধু একটা মিলিটারী গাড়িতে উঠে রওনার অপেক্ষায় থাকি। মিলিটারী গাড়িতে উঠার আগে তিন চার জায়গায় আমাদের নাম লেখা হলো এবং আমাদের ছাপ নেওয়া হলো। সামরিক গাড়ি আমাদের নিয়ে চলতে শুরু করল, সন্ধ্যা নাগাদ আমরা চেকুয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে পৌঁছে গেলাম। এই চেকুয়া ট্রেনিং ক্যাম্পে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর কে. বি. সিং এবং মেজর আর. পি. শর্মার অধীনে একমাস সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ে এবং সেক্টরের অধীন থেকে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ২নং সেক্টরের প্রথম সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ। এবং সেক্টর কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফকে লেঃ কর্নেল পদে পদোন্নতি দিয়ে তাঁর নামের ইংরেজি প্রথম অক্ষর K অনুসারে গড়ে তোলা হয় K ফোর্স। এবং এই K ফোর্সের অধিনায়ক হন খালেদ মোশাররফ। তখন ২নং সেক্টরের কমান্ডারের দায়িত্ব পেল ক্যাপ্টেন থেকে সদ্য পদোন্নতি পাওয়া মেজর হায়দার। খুব সম্ভবত খালেদ মোশাররফ যখন ২নং সেক্টর কমান্ডার তখন হায়দার ২নং সেক্টরের টু আই সি ছিলেন।

আমরা যারা ভারতে সামরিক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি, আমাদের প্রশিক্ষণকালে প্রত্যেকের অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে বাবার নাম, পিতার নাম, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা, ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ছাপ নেওয়া হয়। এই তালিকা মোতাবেক দিয়ে দিয়ে আমরা নিবন্ধ হতে পেরেছিলাম। অথচ ভারতের যদি প্রয়োজন মনে করে ঐ তালিকা থেকে এখনও আমাদের খুঁজে বের করে দেখাতে পারবে। একমাত্র ভারতে মিলিটারী বা ইপিআর-এর ক্যাম্পে থাকুন তারা ভারতে গিয়ে ট্রেনিং নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা হয়েছি — এই মুক্তিযোদ্ধারাই মূল মুক্তিযোদ্ধা বা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধারাই দেশে এসে হাজার হাজার যুবকদের ট্রেনিং দিয়ে আরো মুক্তিযোদ্ধা তৈরী করে। অর্থাৎ ভারতীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের মাধ্যমেই জন্ম নেয় দেশীয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। এই জন্য ইন্ডিয়ান ট্রেইন্ড এবং লোকাল ট্রেইন্ড মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশের জনতা যোগ হয়ে হলো মুক্তিবাহিনী। যেই মুক্তিবাহিনী বলা হয়, বা বলা হত, তাহলে কেবল মাত্র মুক্তিযোদ্ধা, জনগণ, আনসার সবাই [সাড়ে সাত কোটি] বাঙালিই মুক্তিবাহিনী।

যেমন সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর সকল সদস্যই যুদ্ধ করে না। সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকদের দায়িত্ব হচ্ছে, ব্রীজ, কালভার্ট, পুল ইত্যাদি তৈরি করা। যুদ্ধ করা নয়। আবার সেনাবাহিনীর মেডিক্যাল কোর বা সিগন্যাল কোর — এরা সরাসরি যুদ্ধ করে না। মেডিক্যাল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করা, যুদ্ধ করা নয়।

সিগন্যাল কোরের দায়িত্ব হচ্ছে সিগন্যাল দেওয়া। যুদ্ধ করা নয়। সেনাবাহিনীর সাপ্লাই কোরের লোকেরা যুদ্ধ করে না। কিন্তু যুদ্ধ কোরের রসদ, গোলাবারুদ, খাবার ইত্যাদি সকল কিছু সাপ্লাই করার বা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সাপ্লাই কোরের। সেনাবাহিনীর পদাতিক (ইনফ্যান্ট্রি) গোলন্দাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ হচ্ছে যুদ্ধ করা।

সেনাবাহিনীর পদাতিক (ইনফ্যান্ট্রি), গোলন্দাজ (আর্টিলারি) ইত্যাদি কোরের কাজ হচ্ছে শত্রুকে আক্রমণ করা বা শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা অর্থাৎ সরাসরি ময়দানে যুদ্ধ করা। ইঞ্জিনিয়ারিং কোর, সিগন্যাল কোর, মেডিক্যাল কোর, সাপ্লাই কোর ইত্যাদি সকল কোর মিলেই হয় সেনাবাহিনী।

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের লোকেরা ব্রীজ বা পোল না বানিয়ে দেয়। তাহলে সৈনিকেরা নদী পার হতে পারবে না। মেডিক্যাল কোর চিকিৎসা না করলে আহত সৈনিক সুস্থ হতে পারবে না। সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দিলে সৈনিকরা বুঝতে পারবে না। সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দিলে সৈনিকেরা গোলাবারুদ পাবে না, খাবার পাবে না।

এখন যদি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর ব্রীজ না তৈরি করে। মেডিক্যাল কোর চিকিৎসা না দেয়, সিগন্যাল কোর সিগন্যাল না দেয়, সাপ্লাই কোর সাপ্লাই না দেয়। তাহলে কি পদাতিক বা গোলন্দাজ কোর যুদ্ধ করতে পারবে? না, পারবে না। যুদ্ধ করতে হলে উল্লেখিত সকল কিছু চাই। এই সকল কিছু মিলেই হয় যুদ্ধ। আমাদের মুক্তিযুদ্ধও সকল কিছু মিলেই হয়েছে। যেমন মাঝি মুক্তিযোদ্ধাদের নদী পার করে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কোরের দায়িত্ব পালন করেছেন। মা বোনেরা আমাদের ও অন্যদের অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করে মেডিক্যাল কোরের কাজ করেছেন। কোন কৃষক পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গতি বিধির খবর মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে সিগন্যাল কোরের ভূমিকা নিয়েছেন। মায়েরা না খেয়ে থেকে খাইয়েছেন এবং সাধারণ মানুষ অস্ত্র ও গুলির বোঝা বহন করে মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিয়ে সাপ্লাই কোরের কাজ করেছেন। তবেই না কেবল আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করেছি। আমরা মুক্তিযোদ্ধারা পদাতিক ও গোলন্দাজ কোরের কাজ করেছি। বাকী সাড়ে সাত কোটি বাঙালী ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিক্যাল, সিগন্যাল, সাপ্লাই ইত্যাদি কোরের কাজ করেছেন। এবং এই সকল কোরের সমন্বয়ে অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধা জনতার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে মুক্তিবাহিনী।

কেবল মাত্র রাজাকার আলবদর ব্যতীত সমগ্র বাঙালি মুক্তিবাহিনী। পাকিস্তানীরা অবশ্য এই সত্যটি উপলব্ধি করেছে, আর এই জন্যই তারা নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করেছে। নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করা ছাড়া পাকিস্তানী সৈনিকদের আর যা করার ছিল তা হলো আত্মসমর্পণ। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবস্থা ছিল দ্বীপান্তরে বা নির্বাসনে আসা মানুষের মত। নির্বাসনে বা দ্বীপান্তরে আসা মানুষের সাথে পাহারাদারদের পার্থক্য ছিল শুধু নিরস্ত্র আর সশস্ত্র। নির্বাসনে পাঠানো মানুষ থাকে নিরস্ত্র। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর সৈনিকদের আধুনিক অস্ত্র দিয়ে দিয়ে সুদূর পাকিস্তান থেকে ১২শত মাইল দূরে বাংলাদেশে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল। পাকিস্তানী সমরবিদ ও রাজনীতিবিদেরা মনে করেছিল তারা শুধু অস্ত্রের জোরে মানুষ খুন করেই বাংলাদেশ দীর্ঘ দিন দখল করে রাখতে পারবে। কিন্তু সেই মাত্র নিরস্ত্র বাঙালি সংক্ষিপ্ত সামরিক ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিল, সাথে সাথে শুধু শহর অঞ্চল নয় গোটা বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ চলে গেল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিবাহিনীর হাতে। বাংলাদেশে আসা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কাছে যে ধরনের অস্ত্র এবং যে পরিমাণ অস্ত্র ছিল তা দিয়ে কেবল নিরস্ত্র মানুষকে দীর্ঘদিন দাবিয়ে রাখা যেতো ঠিকই। কিন্তু সশস্ত্র মানুষকে বেশি দিন দাবিয়ে রাখা কিছুতেই যেতো না। এবং ভারতের মত একটি রাষ্ট্রের আক্রমণ মোকাবেলা করার জন্যে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানীদের অস্ত্র ছিল সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই মুক্তিযোদ্ধা এবং এদেশের আপামর জনতা অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীর দাপটে পাক হানাদারেরা শহরের দিকে পালাতে শুরু করে দিল। তবে পাক হানাদার ঠান্ডা মাথায়, একটা পরিকল্পনা দ্রুত চালিয়ে যেতে থাকলো অবিরত—এদেশের নারীদের ধর্ষণ করা। পাকিস্তানীদের নীল নকশাই ছিল এদেশের কিশোরী, যুবতী, রমনী নির্বিচারে ধর্ষণ করে তাদের পেটে পাকিস্তানীদের জারজ সন্তান তৈরি করা। বাঙালি নারীর গর্ভে পাকিস্তানী জারজ বংশধর সৃষ্টি করা এবং পাকিস্তানী এই জারজদের দিয়ে বাংলাদেশকে চিরকাল দখল করে রাখা। পাকিস্তানীরা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্য গোলাম আযম, মতিউর রহমান নিজামীদের মত মুনাফেক হাতে গোনা কতিপয় ঘৃণিত ব্যক্তিকে তাদের দোসর হিসাবে পেল ঠিকই। কিন্তু গোটা বাঙালি জাতি পাকিস্তানীদের চিরদিনের জন্য উপড়ে ফেলার জন্য ছিল বদ্ধ পরিকর।

অপর দিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এবং ভারতের জনগণ বাঙালির জন্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের সকল ধরনের সাহায্যের দুয়ার খুলে দিল অকৃপণভাবে।

মুক্তিযুদ্ধের মাত্র নয় মাসের মাথায় ভারতের সাথে পাকিস্তানের যুদ্ধ বেধে গেল। একদিকে মুক্তিযোদ্ধা জনগণ মিলে সাড়ে সাত কোটি মুক্তিবাহিনী, তার

সাথে যোগ হলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। মুক্তিবাহিনী আর ভারতীয় বাহিনী মিলেমিশে হলো মিত্র বাহিনী। ৬ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী সাঁড়াশি আক্রমণ শুরু করল নির্দিষ্ট আর দিশেহারা পাক হানাদার বাহিনী মাত্র দশ দিনের মাথায় ১৬ই ডিসেম্বর এ ধরনের-এর মত পরাজয় বরণ করলো। তিরানব্বই হাজার পাকিস্তানী সৈন্য জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আত্মসমর্পণ করলো। এই আত্মসমর্পণের ঐতিহাসিক দলিলে আত্মসমর্পণকারীদের পক্ষে পাকিস্তানীদের জেনারেল নিয়াজি স্বাক্ষর করেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা মিত্রবাহিনীর পক্ষে স্বাক্ষর করেন। বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তি পাগল মানুষ মুক্তিযোদ্ধা এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছিনিয়ে আনলো স্বাধীনতার লাল সূর্য।

বাঙালী জাতি সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে আনলো।

স্বাধীন দেশে ফিরে এসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, যাঁর সফল নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মুজিব নগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে নিজে প্রধানমন্ত্রী হলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে অস্ত্র জমা নিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় যে বাঙালীরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অধীনে চাকরী করেছে ও পরাজিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে সেই পরাজিত প্রশাসনকে পুনর্বহাল করলেন ও দেশ পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত করলেন। আর মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের কাজে কোন কদর পেলেন না। শুধু তাই না, তাঁরই সরকারের আমলে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পূর্ণ সঠিক তালিকা আজো অবধি সেই তালিকা না এনে নানাজনকে দিয়ে নানা রকমের মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট বিতরণ করলেন। আমার জানা মতে, ঐ মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট কোন প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা নেয়নি, বরং যারা রাজাকার ছিল, যারা সুবিধাবাদী ছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধের মাঠে জন্য নিজেকে বাঁচায়নি তারাই ঐ সকল মুক্তিযোদ্ধা তালিকা ভুক্ত হয়েছে এবং সার্টিফিকেট নিয়েছে।

একজন মুক্তিযোদ্ধার জাতির কাছ থেকে একমাত্র, কেবলমাত্র সম্মান ব্যতীত আর কিছু পাওয়ার থাকতে পারে না। মুক্তিযোদ্ধারা জাতির গৌরব। তাজউদ্দীন সরকারের কাছ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিয়ে আসার সহজ প্রক্রিয়া গ্রহণ না করে, কেন শেখ মুজিবর রহমান নানাজনকে দিয়ে (অনেক বিতর্কিত ব্যক্তিও এর মধ্যে আছে) নানান রকমের তালিকা আর মুক্তিযোদ্ধা সার্টিফিকেট দিয়ে লেজে গোবরে অবস্থা করলেন, তা বোধগম্য নয়।

মুক্তিযোদ্ধারা থাকবে না। থাকবে দেশ। থাকবে শুধু মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস। কিন্তু শেখ মুজিব যতই অজানা ও অতি সাধুর মত আচরণ করুন নিজে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত জাতির নিয়ে কেন সার্থ হলনা এই ব্যর্থতার জন্য একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে কখনই ক্ষমা করতে পারবো না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি জাতির ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সর্বোপরি বিশ্বাস অকৃত্রিম ছিল। তিনি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। জাতির আশা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি জাতীয় সরকার গঠন করবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রত্যাশা তা করলেন না। তিনি সরকার গঠন করলেন মুক্তিযুদ্ধের কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়া, দেশ ও জাতির প্রতি দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ, সুবিধাভোগী আওয়ামী লীগের সেই সব ব্যক্তিদের নিয়ে। মুক্তিযুদ্ধের সফল প্রেরণা অনুপ্রাণিত আত্মোৎসর্গের সকল মুক্তিযোদ্ধাদের দূরে রেখে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এভাবে পরাজিত প্রশাসন ও লোকজনের নিয়ে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়ী একটি জাতি ও একটি দেশকে পরিচালনা করতে যেয়ে, আসলে বিজয়ী জাতিকে পরাজয়ের গহ্বরে ঠেলে দিলেন।

একজন জাতীয় নেতার তার জীবনে যদি অতিক্রমণীয় পূর্বাপর সফল হতে পারি একজন নেতার সাফল্য হয়, তবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ছিল অসাধারণ সার্থ। পাকিস্তানের তেইশ বছরের শাসনে জেল আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান অসাধারণ সার্থ অর্জন করেছিলেন। আর কেউই এতখানি সার্থ অর্জন হতো, যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭১-এর সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের কারাবন্দী না হয়ে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিতেন। তাহলে তিনি প্রত্যক্ষভাবে বুঝতেন মুক্তিযুদ্ধ কি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কি। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ কি। মুক্তিযোদ্ধা কারা হয় এবং কিভাবে মুক্তিযোদ্ধা হয়। একটি জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ বারবার আসে না। জাতির জীবনে মুক্তিযুদ্ধ আসে বিরল ঘটনার মাধ্যমে। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই একটি জাতি তার সকল জরা, দুর্বলতা এবং পুরাতন চাকাকে অবসান ঘটিয়ে, নতুন রূপে জন্ম নেয়। একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের জীবনপণ কঠিন পরীক্ষার মাধ্যমেই দেশ ও জাতির সেবায় এগিয়ে আসে জাতির বীর সন্তানেরা। আর পিছনে পড়ে যায়, পালিয়ে যায় সুবিধাবাদী ভীরু কাপুরুষের দল। কেবল মুক্তিযুদ্ধের সময়ই পরিষ্কার চেনা যায় কারা সুবিধাভোগী ভীরু কাপুরুষ আর কারা ত্যাগী সাহসী পুরুষ। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, দুর্ভাগ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এসবের কিছুই চিনলেন না, জানলেন না জাতির সাহসী ত্যাগী পুরুষদের। এখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ

মুক্তিযোদ্ধাদের একাংশ মার্চ মাসেই থেকে গেল। শুধু একাংশ মার্চ নিয়ে তিনি দেশ চালাতে গেলেন। পাকিস্তানীরা যুদ্ধে পরাজিত হলো, বন্দী হলো। কিন্তু তাদের পরাজয় আত্মসমর্পণ বাঙালি প্রশাসনটা থাকলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এই পরাজিত পাকিস্তানী প্রশাসনটা শুধু বহালই রাখলেন না এবং বিজয়ী বাঙালি জাতির মাথার উপর পুনরায় চাপিয়ে দিলেন।

তিনি দলে ও প্রশাসনে মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন স্থান দিলেন না। এক সময়ে যারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দল ছিল, সমর্থক ছিল তারা বিভক্ত হলো, জাতি বিভক্ত হলো। শান্তি থাকলো নিরাপত্তা গেলো। চরম ভাব নিরাপত্তা ছিলো নিয়ে সমস্ত বড়ো থেকে থাকলো।

বাংলাদেশ দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জন্ম। এবং অসংখ্য মানুষ জীবনদান করে মুক্তি এনেছে। জীবনদান করে-সকল যোদ্ধাদের এবং কোটি জাতির শুধু একটি স্বপ্ন ছিল। একটিই আশা ছিল। আর সে স্বপ্ন ও আশা হলো সুখে থাকার স্বপ্ন, সুখে থাকার আশা। সুখ বলতে যা বোঝায় তাহলো, খাবার জন্য অন্ন। পরবার জন্য বস্ত্র। রোগশোকের জন্য চিকিৎসা। থাকবার বাসস্থান এবং তাদের জন্য শিক্ষা। এই অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার নিশ্চয়তাই হলো সুখে থাকা। আর এই সুখে থাকার জন্যই এদেশের মানুষ লড়াই করেছে, যুদ্ধ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধেও জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল সমাজ বিপ্লবের। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমাজতান্ত্রিক উপাদান ছিল, মুক্তিযুদ্ধে সমাজতন্ত্রীরাও ছিলো। কিন্তু সমাজতন্ত্রীরা নেতৃত্ব নিতে জাতীয়তাবাদীদের উপরে উঠার আগেই আমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী লাভ না করে অসমাপ্ত থেকে যায়। ফলে সামাজিক বিপ্লবও অসমাপ্ত থেকে যায়। স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে জনগণের মুক্তি। দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু জনগণ মুক্তি পেল না। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি হলো না। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে পুরাতন সমাজ কাঠামো ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার জন্য নিয়ে সকল মানুষের জন্য অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা না করে বরং প্রাধান্য পেয়েছে সামরিক বিপ্লবে। শত্রু, লেখকে আবার বিভক্তির পুনরাগমন ঘটেছে। তারা পুরাতন কাঠামো খুঁজেছে। আমলা, আমলা ব্যবসায়ী, এবং রাজনৈতিক এরাই সমাজের ধনী হয়েছে স্বাধীনতার। জনগণের অগ্রগতি হবে কি? তারা আরো নিঃস্ব, আরো দরিদ্র হতে থাকলো। নেতৃত্ব সমগ্র জনগণের স্বার্থ না দেখে, গোষ্ঠীস্বার্থ দেখেছে। তাদেরকে বিষয় নেতৃত্ব যে কেমন গোষ্ঠীকে সীমাবদ্ধ ছিল তা না, জাতির ছিল দল এবং সর্বোপরি পরিবারকেন্দ্র করেই। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। হাজার হাজার মানুষ না খেতে খেতে ক্ষুধায় মারা গেল। দুর্নীতি বেড়ে গেলো লুটপাট ও দুর্নীতি। শেখ মুজিবের নেতৃত্ব বিশৃঙ্খলতা কাটাতে পারলো না। অন্যদিকে অসমাপ্ত সামাজিক বিপ্লবের বিপ্লবীরা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি

মহান নেতা কমরেড সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে তাদের সমস্ত বিপ্লবী তৎপরতা তীব্রতর করে তোলে। মূলকথা পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি চিন্তাধারা, কমরেড সিরাজ সিকদার চিন্তাধারা ঘাঁটি দিয়ে দেশে ব্যাপক এক নতুন সংগ্রাম শুরু করে। এই সংগ্রামের নাম হলো শ্রেণী সংগ্রাম। দলে দলে যুবকরা সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বে এই সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিতে থাকে।

আদি কাল থেকে শিক্ষিত ও ধনী পরিবারে সিরাজ সিকদার জন্মগ্রহণ করেন। সিরাজ সিকদার খুবই মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং নিজে বি. এস, সি, (সিভিল) ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ছাত্র জীবনে তিনি বামপন্থী ছাত্র সংগঠন করতেন। শ্রেণী সংগ্রাম ও সমাজ বিপ্লবের প্রয়োজনে কমরেড সিরাজ সিকদারের সশস্ত্র সংগ্রাম এতই ব্যাপক ও তীব্র হলো যে, শেখ মুজিবের চরমপন্থী প্রশাসন দিনকে দিন অচল হয়ে যেতে শুরু করলো। নির্যাতিত নিপীড়িত শোষিত সর্বহারা জনগণ কমরেড সিরাজ সিকদারকে নিয়ে নতুন স্বপ্ন দানা বাঁধতে লাগলো।

১৯৭৫ সালের ২রা জানুয়ারী সিরাজ সিকদার গ্রেফতার, পলায়নকালে পুলিশের গুলিতে নিহত, এই শিরোনামে দেশের সকল পত্রিকায় সংবাদ পরিবেশিত হলো। পুলিশের প্রেসনোটে বলা হলো সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এবং সাভারে জোর দিয়ে নিয়ে আসার সময় সিরাজ সিকদার পুলিশের ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। তখন পুলিশ গুলি করে, সেই গুলিতে সিরাজ সিকদার নিহত হয়।

কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা যায় পুলিশের প্রেসনোট মনগড়া। সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করা হয় ঠিকই। এবং গ্রেফতারের পর বিনা বিচারে বন্দি অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়। সিরাজ সিকদারের বুকে মোট পাঁচটি গুলির চিহ্ন ছিল। যা সামনে থেকে করা হয়েছে। কেউ যদি পালাতে থাকে এবং পলায়নপর ব্যক্তিকে যদি পিছন থেকে গুলী করা হয়, তাহলে সেই গুলি পিঠে বিদ্ধ হবে। কিন্তু সিরাজ সিকদারের বুকে গুলি বিদ্ধ হয়েছিল। তিনি যেমনটি মানুষের মুক্তির জন্য, শোষকের শোষণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য ধনী পরিবারের সন্তান হয়ে নিজের সুযোগ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীতে মিশে গেছেন। নিপীড়িত নির্যাতিত সর্বহারা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ঘর সংসার, স্ত্রী- পরিবার, আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সমাজ বিপ্লবে নিজেকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করেছিলেন। মানুষের জন্য এমন উৎসর্গীকৃতপ্রাণ কমরেড সিরাজ সিকদারকে বিনা বিচারে বন্দী অবস্থায় নির্মম নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার পর শেখ মুজিব সদম্ভে পবিত্র পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে দম্ভের সাথে বললেন, আজ কোথায় সিরাজ সিকদার?

এই ঘটনার পর শেখ মুজিবের দেশপ্রেম, মহানুভবতা, এবং আইন ও বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়লো। মানুষ ভাবতে লাগলো শেখ

মুজিব যদি একজন দেশপ্রেমিক হন, একজন বীর হন, একজন মহান নেতা হন, তাহলে কি করে আর একজন দেশ প্রেমিককে আর একজন বীরকে আর একজন সর্বস্বত্যাগী মহান নেতাকে বিনা বিচারে বন্দীদশায় গুলি করে হত্যা করতে পারলেন? আমার এই অসম্ভ অন্যায় ও অসত্যের কথা পবিত্র পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে সদর্পে শেখ মুজিব কি করে বলতে পারলেন।

১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমান প্রধানমন্ত্রী থেকে রাষ্ট্রপতি হলেন। দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবং প্রতিষ্ঠিত করলেন একদলীয় বাকশালি শাসন ব্যবস্থা। শেখ মুজিবের বাকশাল ছাড়া কেউ অন্য কোন দল করতে পারবে না। সরকার নিয়ন্ত্রিত চারটি সংবাদপত্র ছাড়া, দেশের অন্য সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জাতির বিবেক গেল না। আশা নিরাশার মিশ্র প্রতিক্রিয়া ঘটতে লাগলো। ১৯৭৫ সালের ৭ই জুন বহু মানুষ, বহু পেশাজীবি সংগঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে বাকশাল করার জন্য এক নবীন উপলক্ষ করে অভিনন্দন জানালেন।

সরকারী মালিকানায় নেওয়া দৈনিক ইত্তেফাকসহ চারটি পত্রিকা ছাড়া বাকি সকল সংবাদপত্র নিষিদ্ধ। শেখ মুজিবের দেওয়া নতুন একদলীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তিসহ দেশের সকল নাগরিকের কিছুই বলার সুযোগ থাকলো না। সর্বত্র নিস্তব্ধতা।

১৫ই আগষ্ট ১৯৭৫ সাল। ফজরের আযানের পর ঢাকা বেতার থেকে রেডিওতে মেজর ডালিমের কণ্ঠ, আমি মেজর ডালিম বলছি, স্বৈরাচারী শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। অনির্দিষ্ট কালের জন্য কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে।

এর পর বিভিন্ন সময় ঘোষণা করা হলো, শেখ মুজিব ও তার স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত করে খন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে এবং কার্ফু জারি করা হয়েছে।

মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিব যাদের নিয়মিত কাছে এবং পাশে রেখেছেন সেই সকল আওয়ামী লীগের নেতা নীরব এবং নিশ্চুপ থেকেছেন। সামান্য সংখ্যক কিছু ছাত্রনেতাদের বক্তব্য নেতৃত্বহীন কর্মীরা আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে যোগাযোগ করলে তারা সবাই চুপচাপ থাকতে এবং অপেক্ষা করার ও কোনো পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। ভারতের ইন্দিরা সরকারের একটি গোপন ইঙ্গিত ছিল, যা কোন কোন ক্ষেত্রে নির্দেশ হিসেবেও মনে করেছে, এই ইঙ্গিত বা নির্দেশটি হলো 'ওয়েট এন্ড সি'। '৭৫-এর ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিব হত্যার পর আওয়ামী নেতাদের 'ওয়েট এন্ড সি'-এর কার্যনীতি শুরু হয়। আওয়ামী কর্মীদের মুখে

সামনা একটা অংশ 'ওয়েট এম সি' রাজনীতি প্রত্যাখান করে অনুপ্রবেশের কর্ম তৎপরতা শুরু করে এবং এই তৎপরতা মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকে। এই কর্মতৎপরতার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বর্তমান কমুনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম।

১৫ই আগষ্ট-এ শেখ মুজিবর রহমানের হত্যার পর হত্যার সমর্থনে অথবা উল্লাস করে রাজপথে কোন মিছিল হয়নি; আবার হত্যার বিপক্ষেও কোন শোক সভা, শোক মিছিল এবং প্রতিবাদ মিছিলও হয়নি।

বলা যায় শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পিছনে প্রায় সকল সামরিক এবং বেসামরিক নেতৃত্ব সমর্থন যুগিয়েছিল। অন্তত একথা সহজেই বলা যাবে যে, সকলেই নীরবে এ হত্যা মেনে নিয়েছিল কেননা প্রতিবাদে কোন মিছিল হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষশক্তি অনেক দিন শেখ মুজিব হত্যার পরিবর্তে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় আবারো নতুন যুদ্ধ শুরু করে। শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী লীগের নেতারা এবং শেখ মুজিবের মন্ত্রী সভার সদস্যরাই খন্দকার মোস্তাক আহমেদ-এর নেতৃত্বে মন্ত্রী সভা গঠন করে। খন্দকার মোস্তাক আহমেদ শেখ মুজিবের স্থলাভিষিক্ত হন। খন্দকার মোস্তাক আহমদ ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রী সভার বাণিজ্যমন্ত্রী। বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোস্তাক আহমেদের রাষ্ট্রপতি হওয়ার সাংবিধানিক কোন বৈধতা ছিল না। খন্দকার মোস্তাকের রাষ্ট্রপতি হওয়া সংবিধানিকভাবে সম্পূর্ণ অবৈধ ছিল। তবুও দেশের নতুন রাষ্ট্রপতি হন খন্দকার মোস্তাক আহমেদ এবং খন্দকার মোস্তাক আহমেদের নেতৃত্বে মন্ত্রী সভায় যোগদান করেন বর্তমান শেখ হাসিনার মন্ত্রী সভার সদস্য আবুল হাসান চৌধুরীর পিতা সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য প্রয়াত এডঃ আব্দুল মান্নানও শেখ মুজিবের মন্ত্রী সভার অন্যতম মন্ত্রী।

খন্দকার মোস্তাক আহমেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া সাংবিধানিকভাবে কোন বৈধতা না থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে খন্দকার মুস্তাক আহমদকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করান সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি এ, বি মাহমুদ হোসেন।

এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী প্রধান জেনারেল এম, এ, জি ওসমানী খন্দকার মোস্তাকের সামরিক উপদেষ্টা হন। ১৫ই আগষ্ট সকাল ৯টায় তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার সরকারের বর্তমান এম পি মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে খন্দকার মোস্তাক আহমেদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে রেডিওতে ভাষণ দেন। এরপর অনুরূপ ঘোষণা করে

সেক্টরে আসেন সেনা বিমান বাহিনী প্রধান শেখ হাসিনার বর্তমান পরিকল্পনামন্ত্রী এম. পি এ. কে. খন্দকার, নৌ বাহিনীর প্রধান এডমিরাল এম. এইচ. খান ও বি. ডি. আর এবং পুলিশ প্রধানগণ।

নতুন রাষ্ট্রপতি হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমেদ পার্লামেন্ট মেম্বারদের সভা ডাকেন। এই সভায় যোগদান করা থেকে বিরত থাকার জন্য ছাত্রনেতা বিশেষ করে নূরুল ইসলাম নুরুল আওয়ামী লীগারদের হাতে পায়ে ধরা সত্ত্বেও এবং জোর চেষ্টা ও অনুরোধ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের প্রায় সকল এম. পি উক্ত সভায় যোগদান করেন।

অপর দিকে বিগ্রেড মুক্তিযোদ্ধা গভর্নর আবদুল কাদের সিদ্দিকী টাঙ্গাইল আর জনাপঞ্চাশেক সঙ্গী নিয়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ-এর সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ শুরু করলে, ছাত্রনেতা সৈয়দ নূরুল ইসলাম নুরু আর কয়েকজন কর্মী নিয়ে সুসঙ্গ দুর্গাপুর এবং সুসঙ্গ সিলেট জেলায় বিগ্রেড ঘাঁটিতে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি বাহিনীতে যোগ দেন।

ডাকসুর সাবেক ভি. পি মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম (বর্তমানে কমিউনিস্ট (সিপিবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক) ইসমত কাদির গামা, মহিউদ্দিন আলমগীর চৌধুরী (বর্তমানে সহকারী আহবায়ক ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি. এস. মোজাম্মিল চৌধুরী)দের নেতৃত্বে মাত্র পঞ্চাশেক ছাত্রনেতা ও কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক কর্ম তৎপরতা শুরু করলে, এই কর্ম তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য জাসদ ছাত্রলীগ (গণবাহিনী) প্রকাশ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

'৭৫ সালের অক্টোবর মাসের শেষের দিকে ছাত্রলীগের এই দুর্দিনের নেতা কর্মী মিলে সিদ্ধান্ত নিল ৪ঠা নভেম্বর '৭৫-এ ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসভবনে মৌন মিছিল করে যাওয়া হবে।

৪ঠা নভেম্বরের মৌন মিছিল সফল করে তোলার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা শহরে গোপন বৈঠক চলতে লাগলো। ২রা নভেম্বর দিবাগত শেষ রাতে অর্থাৎ ৩রা নভেম্বর প্রত্যুষে দেশে ২য় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলো। ৩রা নভেম্বর সকালে সোভিয়েত রাশিয়া নির্মিত যোদ্ধা বিমান মিগ ২১ আকাশে উড়লো এবং খুবই নীচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দিতে লাগলো। বাংলাদেশ বেতারের বা রেডিও বাংলাদেশের এবং টেলিভিশন সম্প্রচার সারাদিন বন্ধ রইল। যোদ্ধা বিমানের নীচ দিয়ে ঘন ঘন মহড়া দেওয়া এবং রেডিও বন্ধ থাকায় দেশে যে ২য় বার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে এটা স্পষ্ট বুঝা গেল। এবং এটাও সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, এই ২য় সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষমতা-দখলদারের কোন নির্দিষ্ট ফয়সালা এখনও হয়নি। কোন পক্ষই এখনও নিশ্চিত বিজয়ী হয়নি। আর এই জন্যই

বোমারু বিমান মিগ ২১ বার বার নীচে ডাইভ দিয়ে প্রতিপক্ষকে বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে এবং সেখানে বা রেডিও বন্ধ হয়েছে। বোমারু বিমান বোমা মারার হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু বোমা মারছে না, এ থেকে বুঝা যাচ্ছে দুই পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে। আর সেই জন্যই যুদ্ধ বিমান আক্রমণের মহড়া দিচ্ছে কিন্তু আক্রমণ করছে না।

রাতে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু করলো কিন্তু অভ্যুত্থান সম্পর্কে কোন কিছুই বলা হলো না। ৪ঠা নভেম্বর সকাল বেলা পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচী অনুযায়ী মৌন মিছিলের প্রস্তুতি নিয়ে শ' পাঁচেক ছাত্র জনতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সমবেত হলো। সমবেত ছাত্র, জনতা বিক্ষিপ্তভাবে সামরিক অভ্যুত্থান নিয়ে আলোচনা শুরু করলো। এদের অধিকাংশেরই ধারণা সেনাবাহিনীর নতুন প্রধান মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণাদানকারী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান অভ্যুত্থান করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক হিসেবে সাধারণ মানুষের কাছে জেনারেল জিয়ার একটা পরিচিতি ছিল এবং গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই অনেকেই মনে করেছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বেই সামরিক উত্থান হয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ অভ্যুত্থান করেছেন। অভ্যুত্থান এর নেতৃত্ব কে দিয়েছেন তা পুরোপুরি নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, একটা বিষয়ে নিশ্চিৎ হওয়া গেছে যে, ১৫ই আগষ্ট অভ্যুত্থান করে শেখ মুজিবকে যারা হত্যা করেছে, তারা এখন আর ক্ষমতায় নেই। এবং তারা দেশ ত্যাগ করেছে। ইতিমধ্যে আরো কয়েকশত লোক সমাবেশে যোগ দিয়েছে। সাত আটশত লোক নিয়ে মৌন মিছিল শুরু হলো। মৌন মিছিল ধানমন্ডি ৩২নং সড়কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর বাসভবন অভিমুখে যাত্রা করলো। পলাশির মোড়ে পুলিশ প্রথম বাধা দিল। পুলিশ বললো, মিছিল নিষিদ্ধ আপনারা মিছিল করবেন না। কে মিছিল নিষিদ্ধ করেছে মিছিলের প্রশ্নের পুলিশ কোন উত্তর দিতে পারেনি। পুলিশ বললো, আপনারা একটু অপেক্ষা করুন আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে নেই। কিন্তু মিছিল থামলো না। মিছিল চলতে থাকলো। পুলিশও পরবর্তীতে হালকা পাতলা বাধা দিতে লাগলো। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে পুলিশী বাধা বলতে যা বুঝায় তা পুলিশ প্রয়োগ করেনি। আসলে পুলিশও জানতো না কারা এখন দেশের ক্ষমতায় আছে, দেশে কি হচ্ছে, পুলিশের কি করণীয়। পুলিশ অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় ছিল। যখন মৌন মিছিল সাইন্স ল্যাবরেটরীর মোড় পার হয়ে কলাবাগানের দিকে যেতে থাকলো এদিকে পাহারায় থাকা সেনাবাহিনীর দশ বার জন সৈন্য মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো। সৈন্যদের মিছিলের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বেশ কিছু মিছিলকারী মিছিল ত্যাগ করে আশেপাশে সরে পড়লো। সৈন্যরা মিছিলের দিকে এগিয়ে এলো ঠিকই কিন্তু মিছিলে বাধা দান বা সমর্থন কোন

কিছুই করলো না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো। তবে সৈন্যদের অফিসারদের ভঙ্গিটা বিরূপ ছিল। তারা শীতল চোখেই মিছিলটাকে দেখছে। এমন মনে হয়েছে, দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থান ও সৈন্যদের করণীয় সম্পর্কে তারাও নিশ্চিত নন। মিছিল ক্যান্টনমেন্ট অতিক্রম করার সময় ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ-এর মা এবং ছোট ভাই রাশেদ মুশাররফ (বর্তমানে শেখ হাসিনার ভূমি প্রতিমন্ত্রী) মিছিলে অংশ নিলে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ-এর নেতৃত্বে অভ্যুত্থানের বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়। এখানেই জানা গেল নতুন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ এর অনুগত বাহিনী বন্দী করেছে এবং অনতিবিলম্বে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ মেজর জেনারেল পদোন্নতি নিয়ে সেনাবাহিনী প্রধান হচ্ছেন। মিছিল অবশ্য ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটে গিয়ে বিকাল তিনটায় বিশ্ববিদ্যালয়ে জমায়েত ও বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচি দিয়ে শেষ হয়।

দুপুর ১টার দিকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ভবনের সামনে থেকে যে যার স্থানে ফিরে যাই। মাত্র আধ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে দুপুরের আহার শেষ করে পুরান ঢাকা থেকে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রওয়ানা হই। বিকাল তিনটার আগেই আমরা ডাকসু ভবনের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখি প্রায় হাজার খানেক ছাত্র জনতা ইতিমধ্যেই সমবেত হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবেশ শুরু হয়নি কিন্তু বিক্ষিপ্তভাবে সবাই আলোচনা করছিল, এই আলাপ আলোচনার মূল বিষয় ছিল জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যা। গতকাল ৩রা নভেম্বর শেখ মুজিব হত্যাকারীরা জেল খানার অভ্যন্তরে ঢুকে মুজিবনগর বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্ব দানকারী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ, প্রথম রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী) সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন (অবঃ) মনসুর আলী এবং শিল্পমন্ত্রী কামরুজ্জামানকে গুলি করে হত্যা করে এবং তারপর দেশ ত্যাগ করে।

ডাকসুর সাবেক ভি. পি বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, ইসমত কাদির গামা প্রমুখ ও বিভিন্ন বক্তার পর মিছিল শুরু হলো। জেলখানায় জাতীয় চার নেতা হত্যার খবরে মিছিলের মানুষগুলো যেমন শোকে বিহ্বল হয়ে গেল। মিছিলটি পুরনো ঢাকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু মিছিলের গতি, প্রকৃতিটা এমনই হলো যে-এটা না হলো বিক্ষোভ মিছিল, না হলো মৌন মিছিল। মিছিলটা পুরাতন শহর দিয়ে নাজিমুদ্দিন রোড এর সেন্ট্রাল জেলের (কেন্দ্রীয় কারাগার) সামনে দিয়ে বকশী বাজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহিরুল হক হলের মাঠে এসে শেষ হলো। এখানে মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম আগামী ৫ই নভেম্বর শোকদিবস কর্মসূচী ঘোষণা

করে পাড়ায় মহল্লায় মিছিল ও পথসভা করার নির্দেশ দিলেন। এর আগে বিকাল ৪টার দিকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তিন নেতার মাজারের সামনে জাতীয় চার নেতাকে দাফন করার জন্য কবর খোঁড়া হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশের বাধার জন্য জাতীয় চার নেতাকে এখানে কবর দেওয়া গেল না।

আমরা দশ এগারোজন মিছিল করতে করতে পুরাতন শহরে আমাদের মহল্লায় ফিরে এলাম। তখন রাত ৮টা হবে। মহল্লায় এসে পরিচিত মাইকের দোকান থেকে মাইক এবং গ্যারেজ থেকে রিক্সা নিয়ে মাইক বেঁধে মিছিল এবং পথসভা করতে লাগলাম। পথসভা ও মিছিলে জাতীয় চার নেতা হত্যার প্রতিবাদে আগামীকাল শোক দিবস ঘোষণা দিতে থাকলাম। পথসভা এবং মিছিলে জনতা তো অংশ গ্রহণ করলোই না, এমনকি আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাও অংশ গ্রহণ করল না। আমরা দশ এগারোজন ছাত্রনেতা-কর্মীই সারাটা পুরাতন শহরের বড়টা এলাকা জুড়ে মিছিল আর পথ সভা করতে থাকলাম। রাত ১১টার দিকে শাঁখারীবাজার এলাকায় মিছিল নিয়ে এলে সূত্রাপুর থানার পুলিশ রাস্তার দুই দিক থেকে ঘেরাও করে আমাদের বেধড়ক লাঠি পেটা করে রিক্সা এবং মাইক ছিনিয়ে নিয়ে যায়। পুলিশের এই হামলায় গুরুতর আহত হয় ছাত্র ইউনিয়ন নেতা বর্তমানে সরকারি আমলা বন্ধুবর শওকত হোসেন (জুম্মান) এবং কবি নজরুল সরকারী কলেজের তুখোড় ছাত্রনেতা দক্ষ ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব বি.এন.পি সরকার কর্তৃক মনোনীত ৭৯ নং ওয়ার্ড কমিশনার বর্তমানে জাতীয়তাবাদী দল ওয়ার্ড সহ-সভাপতি ছাত্রনেতা মোঃ ফরিদ উদ্দিন। আমরা সবাই পালিয়ে গেলাম। রাতে কেউই বাসায় থাকলাম না। কিন্তু রিক্সাওয়ালা, রিক্সার মালিক, মাইকওয়ালা এরা সবাই আমার বাসায় এসে রিক্সা আর মাইক দাবী করে বসে রইল। পরদিন সকালে টাকা পয়সা দিয়ে থানায় লোক পাঠানো হলো রিক্সা আর মাইক ছাড়ানোর জন্য কিন্তু থানা পুলিশ কিছুতেই মাইক আর রিক্সা ছাড়লো না। ৩রা নভেম্বর ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংগঠিত দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকারীরা দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেও যার নেতৃত্বে শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হলো এবং যিনি সংবিধান বহির্ভূতভাবে অবৈধ পন্থায় দেশের রাষ্ট্রপতি হয়ে গেলেন সেই খন্দকার মোশতাক আহমেদ তখনই রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকলেন। ১৫ই আগস্ট সকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করে সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি হয়ে বসা খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ বাক্য পাঠ করান বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের তৎকালীন অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি এ. বি. মাহমুদ হোসেন। সংবিধান বহির্ভূত পন্থায় রাষ্ট্রপতি পদে আসীন খন্দকার মোশতাক আহমেদ-এর কাছ থেকে এই

সম্ভবত '৭৫-এ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মুশাররফ পদোন্নতি নিয়ে মেজর জেনারেল হয়েছেন কি এবং সেই সাথে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই সেনাবাহিনী প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হন। বিমান বাহিনী প্রধান ও নৌ বাহিনী প্রধানগণ খালেদ মুশাররফকে মেজর জেনারেল ও সেনাবাহিনী প্রধান এর ব্যাজ পরিয়ে দিচ্ছেন এই ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪ঠা নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা শ' পাঁচেক ছাত্র-জনতা আমাদের উদ্যোগে নেতৃত্বের অভাবে এবং জনাব ছাত্রলীগের পাল্টা আহ্বানে যথা সময়ে ঘোষিত এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা এবং আতঙ্ক নিয়ে বিভিন্ন কথাবার্তা আর গুজবের উত্তেজনা নিয়ে এই নভেম্বরের দিন শেষ হয়ে গেল। সকালে আমরা পুরাতন ঢাকায় গিয়ে থাকি এবং সহকারী কবি নজরুল কলেজের শহীদ সামসুল আলম ভাইয়ের বাসায় রাত কাটাই। পরদিন এই নভেম্বর সকালে পুরাতন ঢাকা থেকে বরাবরের মতো আমরা দশ/এগারোজন মিছিল নিয়ে আসতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হলে খন্দকার মোশতাক আহমেদকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা, (আওয়ামী লীগের) পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া, সামরিক আইন জারি করা এবং সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে মেজর জেনারেল খালেদ মুশাররফের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হওয়াসহ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত শোনা যায়। এবং এই দিনেও আমাদের মিছিল ও আলোচনার তেমন আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। সবাই ছিল বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন। সন্ধ্যা নাগাদ আমরা পুরাতন শহরে ফিরে আসি। নেতৃত্বের কোথাও কেউ নেই। সব কেমন যেন শূন্য ও নীরব। দেশে ভালো সাংগঠনিক বড় ধরনের কি যেন কি হয়ে যাচ্ছে তা অনুভব করা যায়। উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু পরিষ্কার বুঝা যায় না। আওয়ামী রাজনীতির নেতারা সব কে যে কি করছে বা কোথায় পালিয়ে গেছে তাও বুঝা যায় না। যারা নেতাদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ শহীদ অনেকটা পাকানো বুদ্ধিজীবী গোছের মনে হয়। ইসমত কাদির গামা ততটা বুদ্ধিভিত্তিক নেই, তবে কিছু করার চেষ্টা করেছেন। ওবায়দুল আলম চৌধুরী (বর্তমান আমলের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি এস আলাউদ্দিন চৌধুরী) কাদের, সব সময়ই থাকেন। হঠাৎ দেখা নেই, কেন সব নীতিতে বন্ধ রাখেন। মাহমুদুর রহমান ডিপি ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম কিছু একটা করার চেষ্টাকারীদের মধ্যে মুখ দেখান। অনেকেরই ঠিকানা নেই নিস্ক্রিয় থাকার পথ নিয়েছেন।

আগস্টের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমাদের প্রধান কর্মসূচী নেই। রাত তখন গভীর হলো, নেতৃত্ব নেই বাকে, পত্রিকা বেলা অনুযায়ী এই নভেম্বর গভীর রাতে হঠাৎ গুলির আওয়াজ শোনা যেতে লাগলো। রাত বাড়তে থাকলে গুলির আওয়াজও ততই বাড়তে থাকে। গুলির আওয়াজের সাথে হতে লাগলো এ যেন পাকিস্তান আর্মি '৭১-এর মতোই এক কালো রাত। পাকিস্তান

মার্চ '৭১-এ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাঙালিদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করেছে। কিন্তু আমাদের গুলি কারা করছে? কেন করছে? আর কিসের জন্যে কিছুই বুঝা যাচ্ছে না।

৭ই নভেম্বর ভোর হতে না হতেই দেখা গেল সেনাবাহিনীর সিপাহীরা (জোয়ান) আকাশপানে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে রাস্তা দিয়ে শহরে ঢুকছে. পাড়ার ছেলে রা ছেড়ে খুশ খুশ হয়েছে। আর এই সেনা সিপাহীদের সাথে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জনগণের একটা অংশ যোগ দিয়েছে। সিপাহী জনতা, রাজপথে মিছিল করছে আর আকাশের দিকে গুলি ছুঁড়ছে, স্লোগান দিচ্ছে। সিপাহী জনতার এই মিছিল থেকে নানা ধরনের স্লোগান দিতে শোনা গেল। কোন মিছিল থেকে স্লোগান আসছে মোশতাক-জিয়া জিন্দাবাদ, মুসলিম বাংলা জিন্দাবাদ। কোন মিছিল থেকে স্লোগান উঠেছে কর্নেল তাহের জিন্দাবাদ, সিপাহী-জনতা ভাই ভাই। সশস্ত্র বাহিনী জিন্দাবাদ, সিপাহী জনতা ভাই ভাই ইত্যাদি নানা ধরনের স্লোগান দিতে শোনা গেল সিপাহী জনতার মিছিল থেকে। এই সিপাহী জনতার সামনে কোন সুস্পষ্ট লক্ষ্য বা পরিকল্পনা কোন ধারণা যে ছিল না তা বোঝা যাচ্ছিল। এবং এই সিপাহী জনতার বিদ্রোহে কোন একক নেতৃত্ব বা নির্দেশনা যে ছিল না তাও বোঝা যাচ্ছিল। তবে এই সিপাহী জনতার বিদ্রোহ যে আওয়ামী বাকশালী এবং শেখ মুজিব-এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে তা নিশ্চিত ছিল।

ঐ মিছিলকারী সিপাহী জনতা আওয়ামী বাকশালী বা শেখ মুজিব-এর অনুসারীদের সামনে যে পেতো তাকে আর রেহাই দেওয়া সম্ভব ছিল না।

ভারতে পলায়ন

৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লব ছিল শেখ মুজিবের বাকশাল, আওয়ামী বাকশালী ও তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। অবশ্য সিপাহী-জনতা এই বিপ্লবে সার্বিকভাবে লোকেরা জিয়াউর রহমানকেই নেতা মনে করেছে। '৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের পর আওয়ামী বাকশালীরা বা শেখ মুজিবের অনুসারীরা কে যে কোথায় আত্মগোপন করে গেল তার কোন হদিস পাওয়া গেল না। অবশ্য শেখ মুজিবের সহপাঠী বা আওয়ামী বাকশালী নেতাদের একটা বিরাট অংশ মুজিব হত্যাকারীদের সাথে হাত মিলালো এবং হত্যাকারীদের নেতা খন্দকার মোশতাক আহমেদের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠন করল। আর যাঁরা কতিপয় ছাত্রনেতা-কর্মী ও রাজনৈতিক নেতা খালেদ মোশাররফ বা মুজিব হত্যার প্রতিশোধ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছিলেন, তারা '৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের বিপ্লবী সিপাহী জনতার বিদ্রোহ দেখে প্রাণ বাঁচিয়ে দেশ ছেড়ে পালায়।

ছাত্রনেতা [illegible] আনাম চৌধুরী বর্তমানে সরকারী আমলা এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি. এস মুজাহিদ চৌধুরী-এর নেতৃত্বে আমরা কয়জন ছাত্রনেতা-কর্মী কুমিল্লার সালদানদী-কসবা দিয়ে পালিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায় গিয়ে উঠলাম। '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলা ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্র। অনেক যারা এবং সৌভাগ্যে মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম তাদের কাছে আগরতলা ছিল পূর্ব পরিচিত শহর। এই আগরতলা শহরের এম. বি. বি (মহারাজা বীর বিক্রম) কলেজের ডি. পি [illegible] আমরা সবাই উঠলাম। সেখানে [illegible] কাছ থেকে জানলাম শেখ মুজিবের সময়ে আওয়ামী লীগের তৃতীয়/চতুর্থ সারির নেতা, পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা এবং শেখ হাসিনার [illegible] কিছুই না এস. এম. ইউসুফ আগরতলা থেকে কলকাতায় চলে গেছেন এবং [illegible] তিনি কিছুদিনের মধ্যেই আবার আগরতলায় আসবেন।

অন্যদিকে সাবেক ছাত্রনেতা [illegible] বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, সাবেক মুক্তি বাহিনী [illegible] আওয়ামী যুব লীগের সাবেক চেয়ারম্যান বর্তমানে [illegible] কেন্দ্রীয় নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টু, সাবেক ছাত্রনেতা পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি, বর্তমানে জাতীয় পার্টির প্রাক্তন এম. পি শাহ মোঃ আবু জাফর, সাবেক ছাত্রনেতা ইসমত কাদির গামা, শেখ মুজিবের মন্ত্রী মোল্লা জালালের ছেলে সাবেক ছাত্রনেতা [illegible], [illegible] সরকারী কলেজের [illegible] ছাত্রনেতা সহ ও প্রতিমন্ত্রী [illegible] বি.এন.পি সরকার [illegible] বর্তমানে [illegible] সাবেক সভাপতি [illegible], প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার [illegible] আবু [illegible], রাজনৈতিক [illegible] নেতা-কর্মী পশ্চিম বাংলার রাজধানী কলকাতায় পালিয়ে যায়। বলা যায়, এ যুদ্ধে আমরা দেশ ত্যাগ করে ভারতে পালিয়ে যাই। যা ছিল [illegible] রাজনৈতিক অপরিপক্কতা। আমার [illegible] ভারতে [illegible] সম্পর্কে [illegible] বেশি মনে না। [illegible] দেশ থেকে পালিয়ে ভারতের [illegible] আশ্রয় [illegible] নেতা-কর্মীর উদ্দেশ্য ছিল একটিই। [illegible] ভারত সরকারের কাছ থেকে [illegible] সহযোগিতা নিয়ে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের মতো রাজনৈতিক ও সামরিক [illegible] চালানো। কিন্তু [illegible] প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর [illegible] শুধু থাকা, খাওয়াই মেলেনি।

(১) গোপালগঞ্জ বঙ্গবন্ধু কলেজের ছাত্র সংসদের এক জি. এস, পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের কেন্দ্রীয় নেতা গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ (২) ছাত্রলীগ ও মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের কেন্দ্রীয় তাত্ত্বিক নেতা বর্তমানে জনতা ব্যাংক -এর কর্মকর্তা ও নেতা মোবারক হোসেন বেপিন, (৩) টাঙ্গাইলের ছাত্রনেতা বর্তমানে ব্যবসায়ী বাবর আলী (৪) টাঙ্গাইল জেলা ছাত্রনেতা বর্তমানে এ্যাডভোকেট সিরাজুল হোসেন জাহাঙ্গীর (৫) যুবনেতা, নজিবর রহমান নিয়াজ (৬) ছাত্রনেতা বর্তমানে ব্যবসায়ী নওশের আলি নসু (৭) যুবকর্মী বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক জ্যোতির্ময় বিশ্বাস (৮) সাবেক ছাত্রনেতা বর্তমানে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা গোপালগঞ্জের আব্দুর রউফ সিকদার (৯) সাবেক যুবনেতা দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকে বিদেশিনীকে বিয়ে করে, ঘর সংসার করে, দুই সন্তান জন্ম দিয়ে অবশেষে বিদেশী কালচারের সাথে মানিয়ে নিতে না পেরে বিদেশী বধূ এবং সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে বর্তমানে ব্যবসায় রত গ্রীন রোড কাঁঠাল বাগানের এস. এ. কাইয়ুম বসন্ত এবং (১০) আমি স্বয়ং বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক সঠিক অবাঞ্ছিত ঘোষিত।

আমরা এই দশজন এবং আমাদের নেতৃত্বদানকারী রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোজাম্মিল চৌধুরীসহ মোট এগারোজন আগরতলা এম বি বি কলেজের ছি পি গুপ্ত পাড়ের বাড়ির সাথে ময়লা নিষ্কাশনের ড্রেনের উপর পুরনো টিন দিয়ে একটি ছাপরা বানিয়ে তার নিচে একটি বড় চৌকি পেতে থাকতে লাগলাম। অবশ্য রবিউল আলম চৌধুরী ওরফে মোজাম্মিল চৌধুরী সঞ্জয় পালের সঙ্গে ওদের ঘরে ঘুমাতো। আর দশজন ড্রেনের উপর ভাঙা টিনের চালার নিচে রাখা ঐ এক চৌকিতেই ঘুমাতাম। একজনের পাশে একজন করে নয়জন পাশাপাশি ঘুমাতো। আর আমি ঘুমাতাম সবার পায়ের ধারে। কারণ পাশাপাশি দশজনের জায়গা ঐ চৌকিতে হতো না। তাই আমি সবাকার পায়ের কাছে যে জায়গা নেই জায়গায় ঘুমাতাম। ঘুমতো না, কোন রকমে শুয়ে থাকা। এমন তো একে মশা, তার উপর আমার চতুর দিক খোলা, তারপর আবার ড্রেনের উপর, তার আবার মশারী ছাড়া। মশারী নেই। এখানে দিনের বেলাতেই মশা ধরতো। এই অবস্থায় ঘুমানোর তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। অবশ্য আমাদের ঘুমানোর জন্য দুই তিনটে কম্বল দেওয়া হয়েছিল। সবাই একটা কম্বল বিছিয়ে আর একটি কম্বল দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত মুড়ে শুয়ে থাকতো। আমি কম্বল না পেয়ে লুঙ্গি দিয়ে শরীর থেকে মাথা পর্যন্ত ভিতরে মুখ-মাথা ঢুকিয়ে রাখতাম। আমি আর মোবারক হোসেন বেপিন অধিকাংশে রাত পার করে আর মশা মেরে কাটিয়ে দিতাম। মশা মেরে দুই বন্ধু মিলে আমরা গুনতাম কত হাজার কত শ' মশা মারলাম। এই কারণে আর

পার করে দিতে বলাতে পারতো খাতে হয়ে পড়তেন। কমলানি বেশ বড় দুটিতে খুঁজিয়ে পার করে দিতেন। তখন আমাদের কারোর পকেটে পয়সা খাওয়া ছিল না। তাই তোমরা যাদের মতো হেঁটে তাদেরই সেতু পার করে দিতে চাইতাম। ত্রিপুরা সরকারের মেজোবাবু ... দুপুরের খাওয়ার জন্য প্রত্যেককে এক টাকা করে পাঠাতো এবং রাতে খাওয়ার জন্য এক টাকা, মোট দুই টাকা। দুপুরের খাওয়ার জন্য দুই টাকা দশ পয়সা দিতেন, তাও আমার কাছে আসত নিয়মিত দিতেন না; অথচ দু'একদিন যা আসত বেশি দিন তো হয় নেয়নি।

অর্থাৎ কমলার সময়ে পাকিস্তানসময়ে, আমার মামার বাড়িতে মাঝে মাঝে দু'তিন দিন আসতেন মেজোবাবু তবু তো টাকা দিতেন না। আমাদেরকে টাকা দেওয়ার জন্য বাবু ওদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তিনি টাকা যোগাড় করতে পারতেন না, তাই আমাদের দিতে পারতেন না। আর যখন টাকা দিতে পারতেন না, তখন আমাদের না খেয়ে থাকা ছাড়া উপায় কিছু ছিল না। বাবু ওরা রফিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ওরফে মোকাদ্দিস চৌধুরীর সাথে দেখা দিতেন। রফিউদ্দিন দিতেন খাবার হোটেলে এবং হোটেলের দাম ছিল দুপুরে একবেলা দশ পয়সা, রাতে এক টাকার বেশি কাউকে খেতে দেওয়া হত না। দুপুরে এক টাকার ভাত দশ পয়সার ভাজি। ডাল মাছ, শিরাল ও ভাত ছিল। রাতে সকালই পাতলা ভাত দশ পয়সার ভাজি। এই ছিল আমাদের খাবার। আমরা দুপুরে এক টাকার ভাত খেয়ে হোটেলের ক্যাশ থেকে দশ পয়সা ফেরত নিয়ে ঐ দশ পয়সা দিয়ে বিড়ি কিনে খেতাম। অসমর্থতাবশত আমরা এতটাই নিরুপায় যে, কেউ চিন্তাও করতে পারতো না যে আমাদের পেটে ভাত নেই, পকেটে পয়সা নেই।

আমরা ত্রিপুরার ধলা ছিলাম তবে আমি আমার ডাকে দেবীর মুর্তিটা ধানা থেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি যখন একাকেই মুর্তিটা পাড় আগরতলার রাস্তায় হেঁটে যেতাম তখন পাড়া আগরতলার নর-নারী আমার দিকে তাকিয়ে আমার মুর্তির দিকে তাকিয়ে থাকতো। সারা আগরতলা শহরে আমার ছাড়া দ্বিতীয় কোন তখনকার মুর্তি ছিল না। অনেকে অবাক হতেন আগরতলাবাসী এবং মেয়েরা আমাকে ঈর্ষান্বিত হতো। অনেকে জিজ্ঞেস করতো, এটা কোথা থেকে পাকিস্তান? বলতে হয়েছে কলকাতা থেকে এনেছি। কারণ আমরা যে বাংলাদেশ থেকে এসেছি এটা ত্রিপুরা রাজ্য সরকার মেজোরিটির বিশেষ গোপন রাখতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা যে মুসলমান এটাও গোপন রাখতে হয়েছে। আমাদের পরিচয় গোপন রেখে মিথ্যা পরিচয় বলতে হয়েছে। বলতে হতো আমরা কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। এবং আমরা সকলেই হিন্দু। আমাদের প্রত্যেকেরই একটা করে হিন্দু নাম ছিল: এম. এন. ইউসুফের নাম ছিল নরেন্দ্র, রফিউদ্দিন আহমদ চৌধুরী ওরফে মোকাদ্দিস চৌধুরীর নাম ছিল রবীন্দ্র চৌধুরী ওরফে রবিন, আমার নাম ছিল অমল দাস গুপ্ত ওরফে অমল দা।

আমরা আবহাওয়া বিভাগ সাধারণের দিকে পড়িয়ে আমাদের আবহাওয়ার খাওয়ার পালাম। আমাদের আই-কিউলাল আধুনিক সেক্টরের পাশটি থেকে একদ পাশের দিকে যেন করে দুজনের কথা অতঃ ধরাধাম তখন মানুষ ভিতরে হয়ে গেছে থাকবেন, তবে কথাটা এটা আমাদের এক ধরনের সেটিমেন্ট বা ফরোগান। আমাদে যে আবাসের দিকে থাকবেন পাশা নেই এটা আমাদেরকে মানুষ বুঝতো না। সেটির মুখের কি ভুলে তা আমরা হাতে ধরে বুঝেছি। যাকে মাঝেই কলেজের সেটিমেন্টাল রাখু তার টানে নিতে পারতেন না। এই টানা নিতে না পারার ঘটনা পরপর দুই তিন দিনের হয়ে গেলো। মুখের মধ্যেরে আমরা কানাকাটি থাকতাম। আমি বলতাম, আমরা কাজ করে যাই, আমাদের মুখের জন্যে তাদের আমার কোটাই। কিন্তু না, আমাদের কাজ করতে দেবে। আমাদের গিয়ে আমাদের যোগাযোগ নেয়া থাকবে। যে যেন মুহূর্তে আমাদের সেবার করতে পারে। তাই কলেজ সেক্রেটারী রাখু ধরের কথার ওপরে এমনকম বলা যাবে না। মুখার ব্যাপার ছাড়তে থাকতাম, মুখের মুখে নিয়ে না পেয়ে পাশের কোটি। এ নিয়ে হোস্টেলের মানিক আমাদেরকে মিনতি সাজে বলতাম, বলতাম, এইকেশটা আমরা পাই। পরের বেলার ইউনিয়ন পরের একবারে নিয়ে নিচ্ছেন।

খাওয়া কোটির এর মানিক নাম রাখুর এক আবার, আগে পরনা পরে খাওয়া, দেয়া পরে হল।

হোস্টেলের পরকার পাশে দাঁড়িয়ে বেয়ারা বেলাতো মতো কেবলমাত্র কোকে আসের আক, মুখরীর আলে, খাসির আলে আরও কত কি নিয়ে থাকে। আমাদের ধরক নিয়ে রাখতো, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? আর পথ মাপুন।

এক সময় ধীরে ধীরে হোস্টেলের ভরনা থেকে সরে আসতাম। আমার কল থেকে পেছে আছে পাশি থেকে টিফিনবিহীন হাটতে থাকতাম। এইভাবে থাকতো আমাদের দিন। আমরা মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বেষণীর পাশে বসবীর অপুর আমের সিভিলীর সেক্টরে থাকে এটা প্রতিযোগ আইনীয়ে এলে সেবার আশেকার দিন চলতে থাকলাম।

সেবার সকল দুবে-এই ধরিমুখে বহন করে নিলাম। একটির ধরিমের জন্যে সবার আমরা থেকে মুখার মুলে সইতে না পেরে উপরের থাকে আসী ওপরে ইংপেকর আছে ভনি কথায়। আমা মুক্তিযুদ্ধে হোস্টেলের আমাদের কাল রাখুকে কিছু না কাজ আমা আমিনাদের আছে সেবার থেকে থাকতো, তাদেরও এ ধরার হবে। সেই থেকে কেউ আর থাকতে সেবে থাকতে পারবে না, সবাই আছে মুক্তিযুদ্ধে যোগ পরকে কোটি। এর থাওয়ার টেবিলে বসে পড়লাম। হোস্টেলের প্রথম বছ ৯৭৩৪টি আমাদের সামনে কাজের কাল নিয়ে গেল। নিজের বছ পাশ

লাঠি নিয়ে আমাদের মুখ এবং মাথা ঘুরে নিয়ে গেল। তৃতীয় বার বাবাটি মধ্যে জল আর বাটি নিয়ে আমাদের সামনে এসে বাবাটি থেকে বাটি থেকে আমাদের মাথায় ঢেলে তাড় দিতে যাবে অমনি মদনবাবুর ডাক, এই সামনে কই? আমি অনলাম রফিক (রফিক আলম চৌধুরী অথবা মোজাফির চৌধুরী) নিয়ে আসছেন। মামাবাবু হাত দিয়ে ইশারা করলো, ওরা চলে গেল। সব জাইগায় খাচ্ছে। আমরা দুই বন্ধু খালি থালা সামনে নিয়ে বসে আছি। সবাই খাচ্ছে। আমরা চেয়ে চেয়ে দেখছি, কারণ আমাদের সামনে খালি থালা দিয়ে। এইভাবে কতক্ষণ [illegible] জানি না। আমরা তো খাবি যদি না আসবে না, অবশেষে যদি না [illegible] দিয়ে [illegible] এক সময় দুজনে হোটেল থেকে খেয়ে এলাম। তখন দুপুর বেলা। আমরা যেখানে থাকি সেই পাড়ায় এক বাড়ীতে [illegible] হচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, দাদা এখানে কি হবে?

অনেকে উত্তর দিলেন সন্ধ্যায় কীর্তন হবে।

মনে আমরা তো মহাখুশী। কীর্তন হবে। মানে কীর্তনের প্রসাদ হিসেবে নিশ্চয়ই খিচুড়ী খাওয়াবে। বেলায় অনেক নিয়ে দুজনে ঘুরে বেড়ালাম। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন কীর্তন হবে, কখন আমরা খিচুড়ী খাব। দুজনে যুক্তি করলাম, আমরা আগে [illegible] জন্য বন্ধুদের কথা দিব। নইলে আমার কোন [illegible] থেকে যাব। যদি না অন্যরা যদি কীর্তনে আসে, খিচুড়ী খাওয়া আমাদের জন্য নিষিদ্ধ হবে। তাই ঠিক করলাম আমাদের প্ল্যানের কথা কাউকে জানাবই না।

সন্ধ্যার আগেই আমরা দুই বন্ধু এসে হাজির হলাম। তখনও কেউ আসেনি। বাড়ির বাইরের লোকদের মধ্যে আমরাই সবার আগে এসেছি। বাড়ির গৃহকর্ত্রী ইশারায় সামনে বিছানো মাদুরের উপরে বসতে বললেন। আমরা বসে পড়লাম। আমরা কোন কথা বলছি না। কীর্তন শুরু হলো। হাত তালি, হাত নাড়া, আর কৃষ্ণ হ...রে হ...রে। কীর্তন শেষে গৃহকর্ত্রী মা আমাদের বিশেষ বন্ধু সম্মানে প্রথম পাতে খিচুড়ী পরিবেশন করলেন। আমরা খুব খেলাম। [illegible] না। যে বন্ধু [illegible] দলে [illegible] দেখলাম, [illegible] মুসলমান, তাহলে আর পেটে প্রসাদ থাকবে না। [illegible] দুপুরে গৃহকর্তার [illegible] আমরা যে সবাই হিন্দু নই [illegible] কোন [illegible] সেই গৃহকর্ত্রী আমাদের [illegible] এসেছিলো?

আমি বললাম, হিন্দু মেয়েটি।

তারা দুজন পুরুষকর্মীর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তার পরেরে আমাদের দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন, তারপর দ্রুত চলে গেলেন। আমি ভয় পেলাম। বসে বসে খুঁজতে লাগলাম কি ত্রুটি হলো। কিন্তু কোন ত্রুটিই খুঁজে পেলাম না। আমরা তাড়াতাড়ি চলে এলাম। ঐ বাড়ীতেই আর গেলাম না। কাউকে কিছু বললামও না। আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে হিন্দু বন্ধু ছিল জ্যোতির্ময় তাকে একদিন ঘটনাটি বলায় জ্যোতির্ময় বললো, ঠিক দেখিস, এরা শক্ত সিরাজীদি তোমা ছিল না।

কি ভাবে?

ঐ যে হিন্দু মেয়েটি বলেছিস।

তাহলে কি বলতে হবে?

বলতে হবে ভারতের মেয়েটি। হিন্দু বলা যাবে না। হিন্দু হলে আগে বলতে হবে। হিন্দু মুসলমানেরা বর্জে।

বাঘা সিদ্দিকীর কাছে যাওয়া

১৫ই ফেব্রুয়ারী '৭৬, রাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেস সেক্রেটারী মধু গুপ্ত এসে বললেন, আগামীকাল সকলে কাদের সিদ্দিকীর কাছে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তৈরী হও।

শুনে আমরা তো মহা আনন্দিত। যাক আল্লাহ্‌র এই কর্মহীন ক্ষুধার্ত জীবন থেকে বাঁচলাম। মধু গুপ্ত বাবু আমাদের হাতে আগরতলা টু গৌহাটির প্লেনের বাসটি টিকিট এবং তিরিশটি এ্যাভোমিন (বমি বন্ধ হওয়ার) ট্যাবলেট দিলেন। আমরা সবাই হতবাক হয়ে বসে রইলাম তিরিশটা এ্যাভোমিন।

মধু বাবু বললেন, তোমাদের আর দিন না তাই বেশি দিতে পারি নাই, তোমরা সকালে যাওয়ার সময় আরো কিছু এ্যাভোমিন নিয়ে নিও।

কথা শুনে আমরা সবাই হেসে দিয়ে বললাম, এতো এ্যাভোমিন ট্যাবলেট দিয়ে কি হবে? মধু গুপ্ত হেসে হেসে বললেন, কাজে শেষ কাজে লাগবে।

তারপর আমাদের দুই হাজার টাকা দিয়ে বললেন, খুব হিসাব করে খরচ করবে, বেশি খরচ করলে ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না।

সবশেষে কাদের সিদ্দিকীর কাছে পৌঁছার রাস্তা সম্পর্কে বললেন, প্রথমে প্লেনে গৌহাটি যাবে। সেখান থেকে ট্রেনে করে আসামের মেঘালয়ের গোয়ালপাড়া হয়ে তুরা। তারপর বাসে এবং হেঁটে মহেন্দ্রগঞ্জ বি. এস. এফ (অর্থাৎ সীমান্তরক্ষী বাহিনী) ক্যাম্পে যেতে হবে। এবং সেখান থেকে বি. এস. এফ আমাদেরকে কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম-এর কাছে পৌঁছে দেবে।

পরদিন সকাল ৭টায় আগরতলা টু ধর্মনগর বাসে উঠে বসলাম। ঠিক ঠিক ৭-৫০মিঃ বাস ধর্মনগরের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিল। বাসের সুপার ভাইজার বললো, আপনারা সকলেই বমির ট্যাবলেট এ্যাভোমিন খেয়ে নিন। কারো দরকার হলে আমাদের কাছ থেকে ট্যাবলেট নিতে পারেন।

বাস চলতে শুরু করলো। মিনিট দশেকের মধ্যেই আমাদের বাস উঁচু পাহাড়ে উঠতে লাগলো। কি অদ্ভুত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য! চারদিকে শুধু পাহাড় আর সবুজের সমারোহ। উপরে পরিষ্কার নীল আকাশ। পৃথিবী যেন নীল আর সবুজ এই দু'রঙ এ বিভক্ত। উপরে নীল আকাশ, তারই নিচে পাহাড় সবুজ পৃথিবী। মনোরম পাহাড় সবুজের ভিতর দিয়ে আমাদের বাসটি চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের উপর উঠে যাচ্ছে। আবার ঘুরতে ঘুরতে নিচে নেমে যাচ্ছে। এইভাবে এক পাহাড় থেকে আর এক পাহাড়ে বাস যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই বাসের মহিলা যাত্রীদের বমি শুরু হয়ে গেছে। সেই সাথে কিছু পুরুষ যাত্রীও বমি করা শুরু করছে। বাসের তীব্র ঘূর্ণনের কারণে আমাদের প্রায় মহিলা যাত্রী সকলে বমি করছে। মহিলাদের গায়ের কাপড় চোপড় বেসামাল। পুরুষ সঙ্গীরা প্রাণপন চেষ্টা করেও মহিলাদের কাপড় ধরে রাখতে পারছে না। এরই মধ্যে পুরুষ যাত্রীদের প্রায় অর্ধেক বমিতে শামিল হয়েছে। তার মধ্যে আমাদের কয়েক জনও আছে। এ্যাভোমিন ট্যাবলেট খেয়েও তারা বমি করছে। একজন পুরুষতো শাড়ীপড়া মহিলাদের কাপড় সামলানোর বৃথা চেষ্টা করছে। আর এখন কে কাকে সামলায়। যার যার আপন প্রাণ বাঁচা। যাত্রীদের মধ্যে আমি আর টিপুভাইদের ছাড়া বাসের মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সকল যাত্রীই বমি করে চলছে। কাপড় চোপড় বেসামাল মহিলাদের দিকে তাকিয়ে দেখা তো দূরের কথা, সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে থাকা মহিলার দিকেও তাকানোর কেউ নেই, কারো সামর্থ নেই। আমার অবস্থাও প্রায় কাহিল।

চতুর্দিকে পাহাড় সবুজ বন আর আকাশের নীল রঙ যে কত চিত্তাকর্ষক তা আগরতলা টু ধর্মনগর এই রাস্তায় না আসলে যে কখনই বুঝতে না। কখনো দুই পাহাড়ের একটি সরু রাস্তা সাপের মতো আঁকাবাঁকা বাসটি ছুটে গেল। বাসের যাত্রী এবং আমি মনে হয় ভুলে গেলাম। এখানেও সেই চিত্তাকর্ষক পাহাড় সবুজ আর নীল আকাশ কোন রঙ নেই। সেই জন্য কোন কিছু। বাসের সুপার ভাইজার বললো, এখানে আমরা থামবো।

বাস থামলো আর এক দুই মিনিট দেরী হলেই আমিও বমি করে দিতাম। সুপার ভাইজার বললো, তাড়াতাড়ি এ্যাভোমিন ট্যাবলেট খেয়ে নিন, বমি বন্ধ

হয়ে গেলে আর খেয়ে লাভ হবে না। আমরা চট করে এক সাথে দুটি করে এ্যাভোমিন খেয়ে নিলাম। সুপার ভাইজারকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের বমি হয় না?

উত্তরে বললো প্রথম প্রথম হতো এখন হয় না। প্রতিদিন যাওয়া আসা করি সো সয়ে গেছে, তাছাড়া আমরা রাত থেকেই ট্যাবলেট খেয়ে থাকি। রাতে দুটো খাই, সকালে বাসি পেটে দুটো, নাস্তার পর দুটো খাই, তারপর বাসে উঠি।

আমি আর বাবর আলী বাসের উপর চিৎটান হয়ে শুয়ে পড়ি। বাসের অন্যান্য যাত্রীরাও শুয়ে পড়ে। আধা ঘন্টা পড়ে বাসের চালক যাত্রীদের বাসে উঠার জন্য হর্ণ বাজাতে থাকে। আমরা সবাই বাসে উঠে পড়ি। বাস চলতে থাকে; বহু কিলোমিটার পর ধর্মনগর এসে বাস থামলো। আমরা বাস থেকে নেমে ধর্মনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়ে গৌহাটি হয়ে ধুবড়ী যাওয়ার টিকিট কাটিলাম। ধর্মনগর রেলওয়ে জংশন আসাম বদরপুর রেলষ্টেশনের চাইতেও বেশ বড়। ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে কলকাতাসহ সমস্ত ভারতের এটাই হচ্ছে স্থলপথে একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা। ষ্টেশনে পুরি বিক্রি হচ্ছিল। আমার খুবই লুচি (পুরী) খেতে ইচ্ছে করছিল। নজিবর রহমান নিহার (বর্তমানে শাহজাদপুরবাসী)। তৎপুরের কুড়িগ্রাম—এ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাথে আমাদের আঠার জনের এক সম্মুখ যুদ্ধে আমাদের চৌদ্দ জন নিহত হয়। এই নিহতদের মধ্যে নজিবর রহমান নিহার একজন) এর কাছে প্রশিক্ষক আদম চৌধুরী (বর্তমানে সরকারী আমলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি,এস মোজাম্মেল চৌধুরী) আমাদের সকলের টাকা একসাথে দিয়েছিল। আমি নজিবর রহমান নিহারের কাছে পুরি (পুরী) খাওয়ার জন্য টাকা চাই। কিন্তু নিহার আমাকে টাকা নষ্ট করা যাবে না বলে বিমুখ করে। আমি অনেক বলি, অনেক বার বোঝাবার চেষ্টা করি যে আমার পুরি (পুরী) খেতে খুবই মন চেয়েছে। আমি এর বদলে রাতের খাবারের পরিবর্তে আমি পুরি খাব, আমাকে দুই টাকা দেওয়া হোক। কিন্তু কিছুতেই নজিবর রহমান নিহার আমাকে পুরি খাওয়ার জন্য দুই টাকা দেয়নি। আমার আজও এই দিন খাইনি বলে মনে পড়ে যে নিহার আমাকে পুরি খাওয়ার জন্য টাকা না দিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। অন্যায় করেছে। বোধহয় একেই নাম দিন বলা থাকে। আমরা সকলে ট্রেনে উঠলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। ট্রেন একসময় আসামের রাজধানী গৌহাটি ষ্টেশনে থামলো। আমরা ট্রেনে বসেই ব্রহ্মপুত্রের পাশাপাশি পাহাড়িকা শহর গৌহাটিকে দেখলাম। গৌহাটির অপূর্ব শোভায় অপরূপ সৌন্দর্যময়ী গৌহাটি শহর। দেখে মন ভরে থেকে যাই। গৌহাটি ষ্টেশন থেকে ট্রেন পাল্টিয়ে আমরা ধুবড়ীর ট্রেন-এ

উঠলাম। তাদের ত্রিপুরা রাজ্য পাড়ি দিয়ে, আসাম রাজ্যের পুরো দেশকে অতিক্রম করে আমরা ধুবড়ী এসে ট্রেন থেকে নেমে বাসে করে খুব সকালে বাংলাদেশের এক ক্ষুদ্র নদীর ভারতীয় অংশের পাড়ে থামলাম। ইঞ্জিন চালিত নৌকায় বিনা ভাড়া এই নদী পার হয়ে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে প্রবেশ করলাম। তারপর মেঘালয়ের পাহাড়িয়া জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকলাম, সারা শরীরে ঘাম বেয়ে এল। সেই দুপুর থেকে হাঁটতে শুরু করেছি, এখন রাত্রি নিকটে। ক্লান্ত শিথিল দুর্বল দেহ আর চলতে চায় না। কিন্তু না চলে উপায় কি? গুটিগুটি হাঁটছি, মাঝে মাঝে জঙ্গলের কীট-পতঙ্গের ডাক শুনে চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এর মধ্যেই আমরা দশজন তরুণ একই উদ্দেশ্যে অজানা পথ চলছি। কয়েক কিছুদূর এগোতেই অন্ধকারে ছায়ার মতো মনে হলো এটা বি. এস. এফ ক্যাম্প হতে পারে। উৎসুক চড়া গলায় জিজ্ঞেস করলাম— এ ভাইয়া, ইয়ে বি. এস. এফ ক্যাম্প হ্যায়?

আচমকা গলায় আর একটু জোরেই "হোল্ড হ্যান্ডস আপ" বলে বি. এস. এফ সেন্ট্রি চেঁচিয়ে উঠলো। আমরা সবাই হাত উঁচু করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিন-চারজন বি. এস. এফ আমাদের দিকে টর্চ মেরে হাতে অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে এলো। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, তুম লোক কোন হ্যায়?

আমরা বললাম, হাম লোককো ত্রিপুরা কা কংগ্রেস মোক্তারী বাবু নে মেঘালয় বি. এস. এফ ক্যাম্পমে আনেকা লিয়ে ভেজা হ্যায়।

তারপর পাঁচ সাত জন বি. এস. এফ এসে আমাদের দিকে তেড়ে বললো, হাত নামাইয়ে।

আমরা হাত নামালাম। একজন বি. এস. এফ 'তুম লোক ইধার বৈঠো হাম আভি আয়া' বলে ক্যাম্পের ভিতরে চলে গেল। আমরা বললাম, হাম লোক ইধার নাহি বৈঠেগা হ্যায়?

বি. এস. এফ বললো, বৈঠো বৈঠো।

আমরা মাটিতে বসে পড়লাম। প্রথমে একটু হাতের উপর ভর দিয়ে বসলাম, তারপর মাটিতে শুয়ে পড়লাম। দেহের ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। বি. এস. এফ এর একজন খুব ডাকলো। তারপর তারা আমাদের ক্যাম্পের ভিতর নিয়ে গেল একজন ক্যাপ্টেন এর কাছে আমাদের সাথে দেখা করালো। তাকে আমরা বিস্তারিত জানালাম এবং আমাদের সাথে দেওয়া চিঠি দিয়ে মোক্তার বাবুর দেওয়া চিঠি ক্যাপ্টেনকে দিলাম। তিনি দশ জন বি. এস. এফ কে দিয়ে বললেন, উকামাক্ষা ক্যাম্পে পাঠিয়ে।

বি. এস. এফ-এর সঙ্গে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। রাত্রি শেষ হলো আমাদের হাঁটা শেষ হলো না। পূর্বাকাশ রক্তিম করে সূর্য উঠলো। আমরা চলতেই থাকলাম। পাঁচ ছয় মাইল দূরে অন্য একটা বি. এস. এফ ক্যাম্পে এসে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলে নতুন বি. এস. এফ দল আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলো। আমরা তাদের কাছেও খাওয়ার আবেদন করলাম। কিন্তু কোন ফল হলো না। বেলা বারোটার দিকে অন্য একটা ক্যাম্পে আমাদের এনে দু'টো রুটি আর সুজির হালুয়া খাওয়ানো হলো। পেটে প্রচণ্ড খিদে মুহূর্তের মধ্যে রুটি শেষ হয়ে গেল। আমাদের খাওয়ার জন্য আধা ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছিল। আধা ঘণ্টা পর আবার আমাদের নিয়ে বি. এস. এফ হাঁটা শুরু করলো। একটির পর একটা ক্যাম্প আর দল বদলের মাধ্যমে আমরা হাঁটতেই থাকলাম। এই ভাবে দুই দিন দুই রাত এক নাগাড়ে বিরামহীন হেঁটে আমরা মহেন্দ্রগঞ্জ বি. এস. এফ ক্যাম্পে পৌঁছলাম। এখানে বি. এস. এফ-এর একজন ব্রিগেডিয়ার আমাদের পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসাবাদ করে।

২০শে ফেব্রুয়ারী বিকেলে আমাদের মনে হলো আজ রাত বারোটার পরই তো একুশে ফেব্রুয়ারী, মহান শহীদ দিবস। কিভাবে পালন শহীদ দিবস উদযাপন করবো। খালি টিন (তেল বা মুড়ির টিন) আর গাছের ডাল দিয়ে মহেন্দ্রগঞ্জ বি. এস. এফ ক্যাম্পের মাঠে আমরা তৈরী করলাম অস্থায়ী কৃত্রিম শহীদ মিনার। রাত বারোটা এক মিনিটে (১) গোলাম মোস্তফা খান মিল্কী, (২) মোশাররফ হোসেন সেলিম (৩) আব্দুর রউফ সিকদার (৪) এস. এ জাহিদুল হক (৫) মতিউর রহমান নিহার, (৬) নওশের আলী নসু (৭) মনসুর আলী (৮) নিজামুল হোসেন জাহাঙ্গীর (৯) জোয়ার্দার নিজাম এবং (১০) মতিউর রহমান মেন্টু আমরা এই দশ জন লাইন ধরে আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত, শহীদ আলতাফ মাহমুদ সুরারোপিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক অমর গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী আমি কি ভুলিতে পারি" গাইতে গাইতে মাঠ প্রদক্ষিণ করে আমাদের তৈরী শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ করি। মহেন্দ্রগঞ্জ বি. এস. এফ ক্যাম্পের প্রায় সকল সদস্য গভীর কৌতুহল আর আগ্রহ নিয়ে দাঁড়িয়ে চুপচাপ থেকে এ দৃশ্য অবলোকন করেছে।

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম-এর পক্ষ থেকে সাংসদ মাহবুবুর রহমান মাহবুব মহেন্দ্রগঞ্জ বি. এস. এফ ক্যাম্পে প্রথম আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। দিন দশেক পর আমাদেরকে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা জাতীয় মুক্তি বাহিনীর হেড কোয়ার্টার চান্দুভূঁইতে নেওয়া হয়। পাহাড়িয়া জঙ্গলের

মেঘতুই নামের স্থানে দুই পাহাড়ের মাঝখানে, যেখানে দিনে সূর্য দেখা যায় না, আকাশও দেখা যায় না, তারপরের দিকে এমন একটা স্থানে মেঘতুইতে গিয়ে একেবারে গুরুত্ব দিয়ে সেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হলো।

আদিম যুগে মানুষ যেমন পাহাড়ে–জঙ্গলে বাস করতো, হয়তো সেখানে মানুষ থাকার জন্য এর বাইরে অন্য ঘর করেছিল।

মুক্তির সংগ্রামে আমাদের নির্দেশ দিয়ে এক জায়গায় এলাম। কিন্তু সূর্য দেখা যায় না। সূর্য অস্ত হয়ে গেল। তখনকার অবস্থা বলা। প্রতি মুহূর্তে রাত্রির অন্ধকার নামে। একটা ব্যাটেলিয়ন নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা আসবে এক সাথে আর, সঙ্গে অন্যান্য জায়গার সাথি। পরের দিন আবার দেখা ব্যাটেলিয়ন ঐ পরিকল্পনার মতো। অর্থাৎ প্রতিদিন একটা পর পর একেবারে সবসময়ের জন্য। মেঘতুই পৌঁছার তিন দিন পর বড় কর্নেল সিদ্দিকীর সঙ্গে আমাদের দেখা হলো। কাদের সিদ্দিকী আমাদের প্রথম দর্শনেই বললেন, এখানে আসলে ভুলভাল্লা অবস্থা হয়ে যাবে, তারপরও দেশ শেষ করতে হবে। যদি পার তাহলে তোমরা আমার সাথে থাক, না পারলে চলে যাও।

তিনি আরো বললেন, যদি যুদ্ধ করে করতে না পারলে দেশ স্বাধীন করা যাবে না। দেশ স্বাধীন করাটাই হচ্ছে বড় কথা। '৭১–এর মুক্তিযুদ্ধের চাইতেও অনেক বেশি কষ্ট করতে হবে। আরো বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। '৭১–এ আমরা সব কিছুই সহজে পেয়ে গিয়েছিলাম, তাই জাতির জীবনে আজ এই বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাই বলি ভাই, যদি কষ্ট করতে পার, যদি সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করতে পারো, তোমরা থাক, নাইলে চলে যাও।

যদি উনার কথায় বললাম, আমরা সকলে যুদ্ধ করে যাবো। শুধু আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাই।

কাদেরের কাছেই ছুটি দিলেন, পৃথিবীতে এমন কোনো দেশ আছে, যারা এই পরিবেশে, এই কঠিন দিনে দিনে বাংলাদেশ স্বাধীন করতে?

[illegible]

প্রতিবাদ যুদ্ধ

আমরা অধিকাংশই '৭১-এর মুক্তিযোদ্ধা। তাই সামরিক ট্রেনিং-এর বিশেষ প্রয়োজন হলো না। [illegible]

[illegible]

[illegible]

জি থ্রি অটোমেটিক রাইফেল, পাকিস্তানের তৈরী এই রাইফেল। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীরা আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারত এই জি থ্রি রাইফেলসহ পাকিস্তানী অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়েছিল। এম, এম, জি, (মিডিয়াম মেশিনগান) স্টেনগান, মাইন ইত্যাদি (আর ইডি) অস্ত্রসহ আমরা আটাশজন যোদ্ধা বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করি। অন্যান্যের আরো কয়েকটি গ্রুপ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে দেশের ভেতরে প্রবেশ করে।

সুনামগঞ্জের অধিকাংশ জায়গা হলো হাওড় অঞ্চল। এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট হলো হিন্দু এবং মুসলমান পৃথক পৃথক গ্রামে বাস করে। যে গ্রামে হিন্দু বাস করে তার পাঁচ সাত মাইল পর অন্য একটি গ্রামে মুসলমান বাস করে, তার পাঁচ সাত মাইল পর আবার হিন্দু গ্রাম। এখানে সব পরিবারই কৃষিকাজ নির্ভর। একেক পরিবার পাঁচ, সাতশ, এমনকি হাজার মণ ধান পায়। তবে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দুরাই বেশি ধনী। এখানে অনেক বিশ মাইলের মধ্যে কোন পাকা বা পিচ-এর রাস্তা নেই। হাওড় এবং নিচু অঞ্চল হওয়ায় প্রচুর বর্ষা হয়। নগর বা শহর সভ্যতা কি জিনিস এখানকার মানুষ জানে না। এখানে কোনদিন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেনি। হিন্দুরা মহা উৎসবে মহা আনন্দে ধর্মীয় অনুষ্ঠান করে। নগর সভ্যতার আলো এখানে পৌঁছায়নি, হয়তো তাই সংখ্যালঘুর দুঃখ, সংখ্যাগুরুর অত্যাচার কোন কিছুরই লেশমাত্র নেই।

দিনের বেলায় একটি হিন্দু গ্রামে চুপচাপ বসে থাকা, খাওয়া-দাওয়া, সন্ধ্যা হলেই অন্য একটি হিন্দু গ্রামের উদ্দেশ্যে হেঁটে যাত্রা করা। এইভাবে একটি হিন্দু গ্রাম থেকে আট দশ মাইল কিংবা তার চেয়েও দূরের আর একটি হিন্দু গ্রামে সারা রাত ধরে হেঁটে যাওয়া। সারা রাত হাঁটার পথে অন্য কোন গ্রাম পড়ে না তা না। কিন্তু সেই গ্রামে ওঠা যাবে না। কারণ ঐ গ্রাম মুসলমানদের। আমাদের কমান্ডার নবী বাহিনীর ডেপুটি লীডার সুকুমার সাত্তার-এর এক কথা- কোন মুসলমান গ্রামে উঠা যাবে না। কারণ মুসলমানরা আমাদের পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেবে। তাই আমরা কোন মুসলমান গ্রামে উঠি না। সন্ধ্যা হলেই আমরা হাঁটা শুরু করি। সারারাত হেঁটে এক হিন্দু গ্রাম থেকে আর এক হিন্দু গ্রামে গিয়ে উঠি। এইভাবে দিনে খাওয়া-দাওয়া চুপচাপ বসে থাকা। এবং সারারাত হাঁটা। দিন দশেক পরেই শরীর কাঁপতে লাগলো। প্রথমে আমি ভাবলাম এটা বুঝি আমার কোন রোগ। পরে দেখি সকলেরই শরীর কাঁপছে এবং সকলেই আমাকে তাদের শরীরের অবস্থা অবহিত করছে।

কিন্তু শরীর যতই কাঁপুক যেতে তো হাঁটতেই হবে। হাঁটা ছাড়া আমাদের বিকল্প কিছুই নেই। একদিন সকাল পর হাঁটতে শুরু করলাম। দিনিয়ান গ্রাম

হয়, কিন্তু হিন্দু গ্রাম আর আসে না। সামনে আবছা একটা গ্রাম দেখা যায় কিন্তু ঐ গ্রামে উঠা যাবে না। ওটা মুসলমানের গ্রাম। ভয় পেতে ভোর হয় হয় প্রায়। আমাদের সকল যাত্রী চেঁচিয়ে বললো। তাদের শরীর আর চলছে না, আর হাঁটতে পারছে না। সকলের এক দাবী। এই গ্রামেই উঠতে হবে, এই গ্রামেই আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু কমান্ডার সুকুমার সরকারের ঐ একই কথা—এটা মুসলমান গ্রাম, এই গ্রামে উঠা বা আশ্রয় নেওয়া যাবে না। এর পরের গ্রাম হিন্দু। সেই গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার জন্য উঠতে হবে।

এই কথা শুনে সবাই বসে পড়লো। কেউ কেউ শুয়ে পড়লো। সামছির আমার ধারে বসে দ্বিতীয় আইটি কক অর্ডার। সুকুমার সরকার আর আমি দাঁড়িয়ে। বাকি সবাই যে যার মতো কুয়াশায় ভেজা মাটির উপর শুয়ে-বসে। সুকুমার বাবু আমাকে বললেন— দাঁড়িয়ে চাইলে ট্রুপস উঠাও

আমি শত চেষ্টা করেও কাউকেই উঠাতে পারলাম না। অবশেষে কমান্ডার সুকুমার আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, শালার জানোয়ারগুলো, আমার কী? মেরেটিন (সকলেই) মরবে, চল এই মুসলমান গ্রামেই উঠি।

বলে গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সবাই উঠে হাঁটতে লাগলো। সুকুমার বাবু আবারো মুসলমান গ্রামে না উঠার কথা বললো, কিন্তু কোন কাজ হলো না। সবাই মুসলমান গ্রামের দিকেই চলতে লাগলো। মিনিট পনেরর মধ্যেই আমরা আশ্রয় নেওয়ার জন্য মুসলমান গ্রামে উঠে পড়লাম। মূল মাটি থেকে পনের বিশ ফিট উঁচু, সাত আট শত ফুট লম্বা, একশত ফুট চওড়া এবং পঞ্চাশ ষাটটি ঘরের গ্রামে যে যেদিক দিয়ে পারে ঢুকলো এবং যে যার মতো শুয়ে পড়লো। সারা গ্রামে ডাকাত ডাকাত বলে শোর পড়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে আমি চিৎকার করে বলতে লাগলাম, ভাই সব, আমরা ডাকাত না। আপনাদের ভয়ের কোন কারণ নেই, আমরা ডাকাত নই। আপনারা হৈচৈ বন্ধ করুন, আমরা ডাকাত নই।

এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে বললাম, আপনারা চুপ না করলে আমরা আপনাদের গুলি করতে বাধ্য হবো।

বলেই থ্রি নট থ্রি রাইফেল তাক করে ধরলাম। কিছু লোক কথায় এবং ভয়ে চুপ করলো। তাই গ্রামের মুরুব্বীদের বললাম, আপনারা মসজিদে আসেন। ফজর নামাজের পর আপনাদের সাথে আমাদের কথা আছে। এলাকার আর দশটা অন্যান্য গ্রামের মতো নয়। এই গ্রাম মূল মাটি থেকে বিশ তিরিশ ফুট উঁচু, পাঁচ সাত শত বা হাজার ফুট লম্বা পঞ্চাশ ষাট ফুট চওড়া করে মাটি ফেলে তার উপর পাশাপাশিভাবে দুই সারিতে ঘর, এক কোণায় মসজিদ, পাঠশালা তৈরী করা। মসজিদে ফজরের আযান শেষে নামাজ হলো। আমাদের কে যে কোন

রাতে কোথায় ঘুমিয়ে থাকব তারও কোন হদিস নেই। একথায় আমি গ্রামের মানুষের ভীড় উপচে পড়া মসজিদের বারান্দায় অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করি: ভাই সব, আমরা ডাকাত নই। আমরা যদি ডাকাত হতাম, তাহলে এতক্ষণে আপনাদের জানমাল ধনসম্পদ লুট করতাম। কিন্তু কই, আমরা তো আপনাদের কিছুই লুট করছি না; কারণ আমরা ডাকাত নই। আমরা মহান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অনুসারী সৈনিক। আপনারা শুনেছেন কিনা জানিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে সপরিবারে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়। আর তাই ঐ হত্যার প্রতিশোধে আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছি। আমরা ডাকাত নই, আমরা শেখ মুজিবের সৈনিক। আমরা বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। এবং এই যুদ্ধের প্রয়োজনেই আমরা আজ আপনাদের কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছি। আমরা আপনাদের সন্তান। আপনারা আমাদের পিতা-মাতার মতো। শুধু আজকের দিনের জন্য একটুখানি আশ্রয় আমরা আপনাদের কাছে চাই।

আমার বক্তৃতা শেষ হলে মসজিদের এক মৌলভী বললেন, ঠিক আছে বেশ ভাল ভাল কথা বলো।

তোতা পাখির মতো আরো কত কিছুই না বোঝালাম, গ্রামবাসীরা বুঝলো। আমি মসজিদের বারান্দায় অস্ত্রটা বুকের ভিতর জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লাম। গ্রামবাসীর ডাকে আমার ঘুম ভাঙলো।

গ্রামবাসী আমাকে ঘুম থেকে তুলে বললো, বাবা, আসুন আপনাদের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমি বললাম, আপনি যান আমি আসছি।

তিনি বললেন—না, আমার সাথেই যেতে হবে। আপনাদের জন্য আমরা খাসি জবাই করেছি।

আমি উনার সাথে খেতে গেলাম। একটি ঘরে আমাকে আদর যত্ন করে বিছানায় পাটিতে বসতে বলা হলো। খেতে বসে দেখলাম থালা ভর্তি ভাত আর পাশে দিয়ে গেছে গ্লাস। মনে মনে নিজেকেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিতে লাগলাম, আর গপ গপ করে খেতে লাগলাম। আমার বক্তৃতার একটা গুণ এবং আমি মানুষকে একেবারেই বুঝাতে পারি যে, আমরা মানুষ খুন করি না। কিন্তু অনেকেই বলেছে। আর, কি করব জানিনা।

খাবার খাওয়ার পর রাতে কিছু ঘুম হলো। সেটি আমার এক গভীর ঘুম তবে সেটির অনেক কারণ। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের এক বছর পূর্ণ হলো। ঘুম থেকে উঠে রওনা হলো। আমরা এখানকার কাছে থেকে উঠে পরে ঘুম থেকে জেগে গেলাম। এর

লোকজন দুধ-ভাত দুধ সেই দুধ নিতে গেলেন, এমনি আচমকা গুলি শুরু হলো। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি মাথার ওপর দিয়ে শেল কেটে পাশে দুমদাম লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আমরা জি থ্রি অটো: রাইফেল নিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লাম। মুহূর্তের মধ্যেই পাল্টা গুলি করতে করতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৈন্যরা আমাদের তিন দিক থেকে ঘেরাও করে হামলা করছে। এতক্ষণে বুঝলাম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভক্ত, অনুরাগী সমর্থক সহজ-সরল গ্রামের মানুষদের খাসি জবাই করে ও দুধ-ভাত খাওয়ানোর প্রকৃত রহস্য। তিনশত মত লোকের বাস এই গ্রামে। গ্রামে কোন মহিলা নেই, শিশুও নেই, এমনকি পুরুষও নেই। রয়েছি শুধু আমরা আর আমাদের সামনে, ডান দিকে, এবং বাম দিকে—এই তিন দিক থেকে শত্রু বাহিনীর সৈন্যরা।

আমাদের পিছনে হাওড়। হাওড় মানে কূল-কিনারাবিহীন এক বিশাল জলাশয়। আমাদের জীবন বাঁচা আত্মরক্ষার্থে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে। বিকেলের নামাজের পর গ্রামের মানুষদের আমাদের সম্পর্কে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে বিস্তারিত বুঝানোর পর আমরা যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন তখন গ্রামের মসজিদের ইমাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্নেল (পরবর্তী কালে ডি, জি, ডি এফ, আই মেজর জেনারেল এবং গাজীপুর ঘাঁটি অধিনায়ক জেনারেল মাহমুদুল হাসান নন) মাহমুদুল হাসানের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং জেনারেল (ঐ সময়ের কর্নেল) মাহমুদুল হাসানের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের খাওয়ার জন্য খাসি জবাই করে মাংস এবং দুধ-ভাত খাওয়ানোর আয়োজন করা হয়। আমরা ঘুমে থাকতেই মুজিবের অনুগতজন লোকদের আমাদের খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে গ্রামের বাকি মহিলা শিশু এবং পুরুষ সকলকেই অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হয়। বিশ্বাসঘাতকতা এই রকম ছিল, আমরা খাসির মাংস আর দুধ ভাত খেয়ে ঘুমাব আরামে, আর মাহমুদুল হাসানের সৈন্যরা তিন দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে আমাদের খতম করে দিতে পারে। আমাদের সঙ্গে থাকা অত্যাধুনিক অস্ত্র সম্পর্কে জেনারেল মাহমুদুল হাসানের সঠিক ধারণা ছিল না। তিনি আমাদের অস্ত্র ছোট করে দেখেছিলেন। অতএব ভুল করে বসেছিলেন। ফলে প্রায় তিন ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে, তিন দিক থেকে ঘেরাও করে আক্রমণ করেও আমাদের কাবু করতে পারেননি। আমরা তুমুল পাল্টা আক্রমণের মাধ্যমে মাহমুদুল হাসানের আক্রমণ প্রতিহত করে দেই। জেনারেল মাহমুদুল হাসান হেলিকপ্টারের সাহায্যে আরও সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। আমরা হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে নিচু উঁচু বাড়ির থেকে গোলা নিক্ষেপ করলে হেলিকপ্টারটি পালিয়ে যায়। কিন্তু ইতিমধ্যেই জেনারেল মাহমুদুল হাসান তার সৈন্যদের ও অস্ত্রের বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করে। প্রচণ্ড গুলির যুদ্ধ চলতে থাকে। আমাদের

সেনাবাহিনীর লক্ষ্য আমাদের জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় পরাস্ত করা। আর আমাদের লক্ষ্য প্রাণে বাঁচা। যুদ্ধের কৌশলগত কারণে আমাদের অবস্থান ছিল অনেক সুবিধাজনক। কারণ আমরা ছিলাম ওপরে অর্থাৎ উঁচু জায়গায়। আর সেনাবাহিনী ছিল খাদ থেকে অর্থাৎ নিচু জায়গায়। যুদ্ধে আমাদের মিডিয়াম (এম, এম, জি) মেশিন গান চালক উপজাতীয় গারো তরুণ আর মারাক ও তার সহযোগী তরুণ সহকারী চালক দিনবন্ধু মারাক সিনেমার নায়কের মতো অভূতপূর্ব সাহসিকতার সাথে একশত রাউন্ড গুলির এক চেইন বিশিষ্ট এম, এম, জি (মেশিনগান মেশিন গান) চালাতে থাকে। এম, এম, জির সামনে দুটি পা থাকে, এই পা দুটি মাটিতে রেখে, শুয়ে থেকে ফায়ার করে এম, এম, জি চালাতে হয়। কিন্তু আর মারাক এই নীতি বা প্রশিক্ষণের তোয়াক্কা না করে একশত রাউন্ড গুলির একচেইন এম, এম, জি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সিনেমার নায়কের মতো শত্রুকে মোকাবেলা করতে লাগলো। আর তার সাথে তাল মিলিয়ে কিশোর তরুণ যুবক দিনবন্ধু তেইশে দ্রুত একশত রাউন্ড গুলি ভরে চেইন এম, এম, জিতে ফিট করে দিতে লাগলো। সিনেমায় যেমন নায়ক একের পর এক শত্রু নিধন করে যায় কিন্তু নায়কের গায়ে গুলি লাগে না, বাস্তব যুদ্ধেও আর মারাক ঐ রকম একের পর এক শত্রু নিধন করে যেতে লাগলো। কিন্তু আর মারাকের গায়ে শত্রুর গুলি লাগছে না। আমরা প্রকৃত অর্থে চারদিক থেকেই ঘেরাও। আমাদের পালাবার কোন পথ নেই। কারণ তিন দিকে সেনাবাহিনী আর এক দিকে কূলকিনারাবিহীন হাওরের বিশাল জলরাশি। পালাবার কোন পথ নেই। কেবলেই বারবারই আমাদের ধারণা ছিল আমরা আর কতক্ষণ যুদ্ধ করবো? এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, পাঁচ ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টা, একদিন, দুইদিন? তারপর কি? হয় মৃত্যু, না হয় বন্দী। আসলেও তাই, আমাদের তো পালাবার কোন পথই নেই। শত্রু দূর থেকে আমাদের [illegible]। আমি নির্ভীক যুবক। তখন কতো এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে নিজেদের সর্বশেষ অবস্থানটা দেখে নিলাম। যুদ্ধ চলে দুপুর থেকে, এখন প্রায় সন্ধ্যা শুরু হয়। মনে হল [illegible]। [illegible], না [illegible]। ঠিক এমন সময় আমাদের [illegible] দিল এই খবর— "[illegible]" [illegible] আমাদের জানালেন, ঐ [illegible] যে [illegible] [illegible] নিরাপদ [illegible] আমরা বাঁচতে পারি।

কারণ ঐ একটিই মাত্র পথ আছে পালাবার। [illegible] এখন মনে হলো যে [illegible] তার সুবিধা হয়ে গেল।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, হয় সেনাবাহিনীদের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে জেল অথবা নিজেরাই মরবো। তিনজন সাথী বন্ধুকে ইশারায় কাছে ডাকলাম। আমিসহ চারজনের একটা দুইনারির ফোর্মেশন গঠন করলাম। যদিও পরিস্থিতি ও পরিবেশে আমরা সকলেই দুইনারির ফোর্মেশন শেখায় হয়ে গেছি, তারপর একটা সামান্য আনুষ্ঠানিকভাবে বাগানে এক অন্যের সাথে করমর্দন করে গুলি করতে করতে হিজল গাছের বাগানের দিকে অতর্কিত আক্রমণ করলাম। নিজেদের গায়ে গুলি লাগতে পারে সেই পরোয়া করলাম না। শুধু আক্রমণ করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। যুদ্ধের ধরন গেল পাল্টে। এতক্ষণ আমরা শুধু শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে আত্মরক্ষার্থে পাল্টা আক্রমণ করেছি। শত্রুর শাঁ শাঁ গুলি আমাদের দিকে আসছে; এতে আমাদের কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই। আমরা তো মরার জন্যই এসেছি। মিনিট পনেরোর মধ্যেই আমরা হিজল বাগান দখল করে ফেললাম। আর্মির হেলমেট, বুট এবং জায়গায় জায়গায় রক্ত দেখে অনুমান করলাম এখানে সেনাবাহিনীর বেশ সদস্য হতাহত হয়েছে। যার ফলে হতাহত সৈন্যদের নিয়ে বাকি সৈন্যরা এই স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র অবস্থান নিয়েছে। হিজল বাগান আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। আমরা কমান্ডারের অপেক্ষায় রইলাম। সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নেমে এলো। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মুসিবত যেন কাছে এলো। এখন এমনই একটা সময় যখন আকাশে চাঁদের ক্ষুদ্রাংশ ওঠে রাত দশটা এগারোটায়। আকাশে চাঁদ ওঠার আগেই এই অন্ধকারেই আমাদের পালিয়ে যেতে হবে। কতক্ষণ জানি না, তবে অনেকক্ষণ হলো আমাদের কমান্ডার এবং অন্য সাথীদের অপেক্ষায় আমরা বসে আছি। চাঁদ উঠলে আমাদের পালানো কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ চাঁদের আলোয় আমাদের দেখা যাবে। শত্রুরা ওয়াচ পজিশনে আছে, চাঁদের আলোয় আমাদের দেখলেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দিবে। পালাতে পারা তো দূরের কথা, চাঁদ উঠলেই আমাদের হয় পজিশনে থাকতে হবে, নইলে মারা যেতে হবে। এখনও কমান্ডার এলো না। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, হে আল্লাহ, তুমি আর দেরি চাঁদ ঢেকে রাখ। নইলে আমরা মারা যাব।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, আমাদের কমান্ডার ও অন্য সাথীরা এখনও এলো না। আমার সেকেন্ড ইন-কমান্ড নিজাম এবং বাকের তিন সাথীকে পাহারায় রেখে নিরাপদ অবস্থান নিলো। এর মধ্যে কমান্ডার ও অন্য সাথীরা না এলে আমরা পালিয়ে যাব। কারণ আকাশে চাঁদ উঠলে আর পালাতে পারব না। পালাতে হলে চাঁদ উঠার আগেই পালাতে হবে। এই হিজল বাগানের পাশেই বন জঙ্গল। সেই জঙ্গলে আশেপাশে সেনাবাহিনীর সৈন্যরা পজিশনে আছে। অবশেষে ঠিক করা গেল আমরা আস্তে হিজল বাগান থেকে বন জঙ্গলে যাওয়া সবচেয়ে নিরাপদ

থাকা সেনারা আমাদের দেখতে পাবে, আর দেখা মাত্রই সৈন্যরা গুলি করে আমাদের খতম করে দেবে। অতএব কিছুক্ষণের মধ্যেই পালিয়ে যেতে হবে।

কিছুক্ষণ পরে বললাম, আমি এখন পালিয়ে যাব, তোমরা যদি যেতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে যেতে পার।

চারজন মিলে পালাতে লাগলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার নিজেকেই নিজে দেখা যায় না। আমরা চারজন একে অপর থেকে যাতে বিচ্ছিন্ন না হই সেই জন্য পায়ে পায়ে মিশে পথ চলতে লাগলাম। কিছুক্ষণ বাগান থেকে ধানক্ষেতে এসে পড়লাম। ধানক্ষেতে কিছুক্ষণ চলার পর আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। অন্ধ অন্ধকারে যে, আমরা কি সোজা হাঁটছি, না এক জায়গাতেই ঘুরছি কিছুই বুঝি না। তবে এইভাবে যে থাকতে পারব না তা বুঝতে পারলাম। হয়ত সারা রাত হেঁটে দেখা যাবে আমরা যেই জায়গায় ছিলাম সেই জায়গাতেই ঘুরপাক খাচ্ছি। সাথী তিনজন থমকে গেল আমিও থমকে গেলাম। একজন জিজ্ঞেস করলো, এখন উপায় কি?

বললাম, দাঁড়িয়ে তো থাকা যাবে না। হাঁটতেই হবে তাতে যা হয় হবে। তবে সবচেয়ে ভালো হবে গ্রামের মানুষ যে পথে চলে সেই পথের ঘাস উঠে গিয়ে সাদা মাটির পথ হয়, সেই পথ অন্ধকারেও অবশ্য দেখা যাবে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে যদি সেই পথ পেয়ে যাই একটা উপায় হবে।

আমাদের এক সাথী বিমল বললো, দাঁড়ান আমার পায়খানা পেয়েছে।

আমরা দাঁড়ালাম। বিমল পায়খানা করতে বসেই বললো

পেয়েছি, পেয়েছি, পথ পেয়েছি। আমরা সবাই দেখলাম, হাঁ এই তো গ্রামের মানুষেরা পায়ে চলার পথ। বিমলের পায়খানা শেষে খুঁজে পাওয়া পথ ধরে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম। মনে আশংকা ভয়, এই পথ না হারায়। সাথী নজরুল আলী মধু বললো, দাঁড়ান, আমার শরীর কেমন ভারী হয়ে যাচ্ছে।

বললাম, ভারী হোক, আর হালকা হোক, দাঁড়াবার সময় নেই মধু।

এর মধ্যেই দেখলাম একটা লোক ধানক্ষেতে বসে বিড়ি বা সিগারেট খাচ্ছে। প্রতি টানে টানে গুলটি দিয়ে স্পষ্ট আগুন দেখা যাচ্ছে। আমি নিশ্চিত হলাম এই লোক সেনাবাহিনীর লোক, মানে পাকসেনা। কেননা কোন সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোক এই সময়ে, এই রাতে, এই যুদ্ধ ময়দানে বিড়ি বা সিগারেট খেতে পারে না। সামরিক প্রশিক্ষণকালেই যুদ্ধ ময়দানে রাতের বেলায় বিড়ি বা সিগারেট খাওয়ার ব্যাপারে পরিষ্কার সম্পূর্ণ নিষেধ শেখানো হয়।

সাথী নজরুলকে বললাম, এই লোককে ধরে ফেলে গলা টিপে মেরে অস্ত্র নিয়ে নিতে হবে। এই লোকটাকেই পথ দেখাতে আমাদের সাথে নিয়ে চলতে হবে। অন্ধকারে বিড়ির আগুন লক্ষ্য করে ক্রলিং করে ঐ লোকের পিছনে যুদ্ধ বাধলে তো আশঙ্কা দেখলাম। আমি ক্রলিং করে পেছন দিক দিয়ে

লোকটাকে পাশ পাহারা করবে। যাতে ঐ লোক চিৎকার অথবা দৌড়ে পালাতে না পারে। আমাদের কোন প্রকার শব্দ করা চলবে না এটা মনে রেখে কাজ করতে হবে।

আমরা ক্রলিং করে যাওয়া শুরু করলাম। আমি ঠিক পিছন দিক দিয়ে ঐ লোকের পিঠে হাত রেখে বললাম, কেডা?

লোকটি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমি, আমি।

আমি ধমকের সুরে বললাম, চুপ।

এরপর ধীরে ধীরে ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কি?

ঐ লোক বললেন, জিতেন ঠাকুর।

নামটি আমার চেনা চেনা লাগলো। তবুও ডি বি ম্যাক্সিমের ব্যারেল (নল) পিঠে ঠেকিয়ে বললাম, আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন। নইলে গুলি করে মেরে ফেলব। আমরা কাদেরীয়া বাহিনীর লোক।

সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, আপনাদের জন্যই তো আমি নৌকা নিয়ে এসেছি। নৌকা কোথায়? ঘাটে। চলুন আগে ঘাটে যাই।

জিতেন ঠাকুর হলেন কমরেড মণি সিং-এর কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। সর্বহারা আর নিপীড়িতদের সাহায্য করাই তার ধর্ম। সুনামগঞ্জ সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা। চিরকুমার জিতেন ঠাকুর, চিরকাল মানুষের সেবা করেই জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন। এই সুনামগঞ্জ অঞ্চলের মোটামুটি সমস্ত মানুষ জিতেন ঠাকুরকে চেনে। তিনি ইতিহাস প্রসিদ্ধ তেভাগা আন্দোলন, নানকার, হাজং বিদ্রোহ এবং জমিদারী প্রথা বাতিল আন্দোলনের বিপ্লবী যোদ্ধা ছিলেন। যৌবন বয়সে তিনি কমরেড মণি সিং-এর সহযোদ্ধা ছিলেন। তিনি ঐতিহাসিক টংকপ্রথা বিরোধী তীর ধনুক নিয়ে বৃটিশ সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। একাত্তর সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেও সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ অঞ্চলে তেমন একটা যুদ্ধ না হওয়ায় তিনি যুদ্ধ করতে না পারায় দুঃখিত।

আন্দোলন, সংগ্রাম, যুদ্ধ জিতেন ঠাকুর-এর কাছে নেশার মতো লাগে। সীমান্তে আমাদের ঘাঁটিতে তিনি একবার এসেছিলেন। মোজাফফরকে জিতেন ঠাকুর ভালবাসেন। নিজের বিপদ উপেক্ষা করে যোদ্ধাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে তিনি খুবই আনন্দ পান। তাই আমরা যখন সীমান্ত থেকে দেশের ভেতরে ঢুকি তখন থেকেই নিরাপদ দূরত্ব থেকে তিনি আমাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করছেন। এই অঞ্চল তার এতোই নখদর্পণে যে, আমরা যখন রাতে ওখান থেকে রওনা হই তিনি সহজেই অনুমান করে নিতে পারতেন আমরা এক রাতে কতটা পথ দূরে এবং কোথায় গিয়ে পৌঁছাতে পারি। পরের দিন তিনি আবার আমাদের কাছাকাছি কোন জায়গায় অবস্থান নিতেন। কিন্তু সবসময়ই আমাদের আগে

আসছেন না। এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছেই তাঁর সমান সমাদর ছিল। পাক-সেনার আগেই জিতেন্দ্রনাথ এই পুরুষের অজান্তে ছিল তারা এই গ্রাম কাল অনেক গ্রাম ঘুরে বেড়ালো। ঘাটে এসে দেখলাম সত্যিই একটা বড় নৌকা নৌকায় বসেছে। সঙ্গে তিনজন মাঝি। জিতেন ঘাড়ুই আমরা চারজন নৌকায় উঠে বসলাম। আমাদের দরকার এখন হলো কমান্ডারের ছোট-ভাই অত্যন্ত দরকার। নৌকায় উঠেই অন্য সবার কথা, বাবা রে। কমান্ডার সুকুমার মজুমদার ছাড়া যাবু না। সকলে আমার ব্যবস্থা করুন।

জিতেন ঘাড়ুই বললেন, তোমরা নৌকায় বস আমি কমান্ডারকে ডেকে আনি।

জিতেন ঘাড়ুই কমান্ডার সুকুমার বাবু এবং অন্য সাথীদের খুঁজে আনতে গেলেন। আমরা চারজন নৌকা থেকে নেমে বসে পরিস্থিতি দেখতে থাকলাম। এক সময় অন্ধকারে দেখলাম দূরে কাছাকাছি একদল লোক সারিবদ্ধভাবে লাঠি নিয়ে আমাদের দিকে আসছে। আমরা চারজন পরিস্থিতে চুপ করে বসে থাকলাম। তখনই আমাদের দু'জন হাতে দুর দিয়ে নৌকার দিকে এগিয়ে গেল। এরপর কমান্ডার সুকুমার বাবু আস্তে আস্তে কোকিলের কণ্ঠে কু কু করে ডাক দিলেন।

আমরা বুঝতে পারলাম এই লোকজন আমাদেরই সাথী। আমরাও পাল্টা কু কু ডাক দিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকার দিকে গেলাম। তার সাথে দ্রুত সবাই নৌকায় উঠে পড়লাম। নৌকা ছেড়ে দিল। চারদিক চেয়ে ও বাতাস দিয়ে আমরাও নৌকা পরিচালনা করলাম। আকাশে তিন বেলা আগেই অন্তত দু'দিন বাইরে থেকে হবে। দ্রুত গতিতে নৌকা চলতে লাগলো। দূরে দূরান্তে ধরে চারদিকে ঝলমলে রূপালী আলো ছড়িয়ে আকাশে উঠলো। চাঁদের মিষ্টি পরিবেশে আমাদের সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধাদের বিশাল দল নদীর মাঝে একটা নৌকায় আমরা সবাই বসে আছি। একসঙ্গে আমাদের বুক ভরা দুঃসাহস। আমরা সবাই আত্মবিশ্বাসের সাথে বিপজ্জনক পথে সম্পূর্ণ অজানা অনন্তের পথে এগিয়ে চলেছি। এ যেন মুক্তিযুদ্ধের বিজয় যাত্রা না। মনের আনন্দে আমরা উচ্চ কণ্ঠে গান গাই। আমাদের এই জীবনের পরে এখন ছিল বাপ কেউ না। তিনি থাকেন বাড়ুয়ার ... জিতেন ঘাড়ুই। জিতেন ঘাড়ুই-এর এই ... নেই। ... নেই। কেউ কেউ কি এমন ভাবছে যে দিন জিতেন ঘাড়ুই-এর ... অন্তত চেষ্টা করা যাবে?

ভোর হলো, নৌকা তীরে ভিড়লো। আমরা সবাই নৌকা থেকে নেমে পড়লাম। জিতেন ঘাড়ুইকে বুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিলাম। আবার পথ চলতে

শুরু করলাম। এবার পথ চলার লক্ষ্য হলো সীমান্তের দিকে। উদ্দেশ্য সীমান্তের নিকটবর্তী জায়গা দিয়ে আমরা ঘুরতে থাকবো। জনগণের অবস্থা খুব একটা ভাল দেখলাম না। আমাদের হাতে অস্ত্র আছে বলেই জনগণ আমাদের কিছু বলেনি। কিন্তু মনে হয়েছে পারলে জনগণ আমাদের ধরে ফেলে।

জনগণকে এতো বুঝালাম, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এই দেশের স্রষ্টা, তাঁকে অন্যায়ভাবে হত্যা .... ইত্যাদি। কিন্তু জনগণ গ্রহণ করছে না। কেবলই তা প্রত্যাখান করছে। ব্যাপারটা ভীষণ খারাপ। তাহলে কি শেখ মুজিবর রহমানের জনপ্রিয়তা শূন্যের কোঠার থেকেও নিচে নেমে গেছে? জনগণ যদি আমাদের আশ্রয় না দেয়, তাহলে আমরা গেরিলা যুদ্ধ করবো কিভাবে? জনগণ আর গেরিলা যোদ্ধার সম্পর্ক হতে হবে, পানি আর মাছের, মাছ যেমন পানি ছাড়া বাঁচে না, গেরিলা যোদ্ধাও জনগণ ছাড়া বাঁচে না। পানি যদি মাছকে আশ্রয় না দেয় তাহলে মাছের যেমন নিশ্চিত মৃত্যু হবে, ঠিক জনগণ যদি গেরিলা যোদ্ধাকে আশ্রয় না দেয়, তাহলে গেরিলা যোদ্ধারও নিশ্চিত মৃত্যু হবে।

মনে নানান প্রশ্ন, শেখ মুজিবর রহমান কি মানুষের কাছে এতোটাই অগ্রহণযোগ্য হয়ে পড়েছিল? তাকে এইভাবে খুন করা হলো, আমরা তার প্রতিবাদে যুদ্ধ করতে এলাম, অথচ জনগণ আমাদের গ্রহণই করছে না! আসলে সশস্ত্র প্রতিবাদই শেষ কথা নয়। আমরা যারা শেখ মুজিবের অনুসারী, আমাদের নিজেদের কর্ম দ্বারা এবং জনগণকে বুঝানোর মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবার জনগণকে শেখ মুজিবের প্রতি সহানুভূতিশীল করে তুলতে হবে এবং শেখ মুজিবর রহমান-এর হারানো জনপ্রিয়তা আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা সশস্ত্র যুদ্ধ বা নিরস্ত্র লড়াইয়ে বিজয়ী হতে পারবো। এছাড়া আমাদের জন্য কোন বিকল্প নেই। জেনারেল মাহবুবুল হাসানের সৈন্যরা জনগণের মাধ্যমে আমাদেরই গতিবিধির খবরাখবর নিয়ে পথে পথে এম্বুশ করতে থাকলো। এম্বুশ মানে আগে থেকেই ফাঁদ পেতে বসে থাকা। আমরা এক সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জেনারেল মাহবুবুল হাসানের এম্বুশে ফাঁদে পা দিলাম। সন্ধ্যার এক আখক্ষেতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আগে থেকেই এম্বুশ করে ফাঁদ পেতে বসে থাকা বাংলাদেশ জাতীয় সৈন্যরা অতর্কিতে আমাদের আক্রমণ করলো। আমরা আখক্ষেতের ভেতর আশ্রয় নিয়ে পাল্টা জবাব দিলাম। প্রথমে তীব্র লড়াই শুরু হলো। তারপর রাত ভর থেমে থেমে সংঘর্ষ চলতে লাগলো। রাত পোহালো। ভোর হলো। সূর্য ওঠার সাথে সাথেই সেনাবাহিনীর সৈন্যরা দ্বিগুণ গতিতে পুনরায় আক্রমণ শুরু করলো। আমরা তার পাল্টা জবাব দিতে লাগলাম। যতই বেলা বাড়তে লাগলো আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ ততই বাড়তে লাগলো। আমরা যে আখক্ষেতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার পাশেই সেই ক্ষেতের আখ

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে লাগলো। আমাদের গুলি ক্রমশ ফুরিয়ে যেতে লাগলো। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে লাগলো। ধীরে ধীরে আমাদের অস্ত্রগুলো একের পর এক থেমে যেতে লাগলো। যখনই আমাদের একটা অস্ত্র থেমে যায় তখনই বুঝতে পারি আমাদের সাথী যোদ্ধার গুলি হয় শেষ, অথবা আহত, কিংবা নিহত হয়েছে। সন্ধ্যা নাগাদ আমাদের একের পর এক প্রায় সকল অস্ত্র থেমে গেলো। অর্থাৎ আমাদের প্রায় সকল সাথীর গুলি শেষ অথবা আমাদের প্রায় সাথীই নিহত। সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথেই অবস্থা বেগতিক দেখে আমি ক্রলিং করে আখক্ষেত থেকে বেরিয়ে ধানক্ষেতে ঢুকে পড়ি। সারারাত ধানক্ষেতে ক্রলিং করার পর যখন সকাল হয়, তখন আমি কোথায় তা আমি জানি না। ধান গাছের পাতা আর শীষের ধারে আমার সমস্ত শরীর কেটে ফালি ফালি হয়ে সারা দেহ থেকে বিন্দু বিন্দু রক্ত বের হতে থাকে। দীর্ঘ সময় ক্রলিং করার ফলে আমার দু'হাটু, হাতের দুই কনুই এবং বুক ছিঁড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। দেহে বল নেই। দেহ আর চলে না। দেহ নিস্তেজ। জীবনের মায়া ত্যাগ করে ধান ক্ষেতেই পড়ে রইলাম। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম, না জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম জানি না। যখন হুঁশ ফিরে এলো তখন দেখি একটি কুকুর আমার নাক শুঁকছে। ধপ করে উঠে বসতেই কুকুরটি তিন চার হাত পিছনে সরে গেল। আমার পাশেই পড়ে আছে আমার জীবন রক্ষাকারী থ্রি নট থ্রি রাইফেল, আর দুটো ম্যাগাজিন। আমার কিছুই মনে নেই। কেন আমি এই অবস্থায় এখানে। পেটে শুধু প্রচণ্ড ক্ষুধা। ক্ষুধার জ্বালায় আমি অস্থির। চিন্তা করছি আমি কি স্বপ্ন দেখছি না বাস্তব, ধীরে ধীরে আমার সমস্ত কিছু মনে হতে লাগলো। আমি আবার ভয় পেয়ে গেলাম। শত্রুর ভয়। মৃত্যুর ভয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মরণের সাথী, বাঁচার সাথী প্রিয়তমা থ্রি নট থ্রি রাইফেলটি আর ম্যাগাজিন দুটো হাতে তুলে নিলাম। এখনও একটা ম্যাগাজিন পুরো গুলি ভর্তি অন্যটা অর্ধেক ভর্তি, আর রাইফেলে ফিট করা ম্যাগাজিনে বিশ রাউন্ড গুলির মধ্যে মাত্র তিন রাউন্ড গুলি আছে। কিন্তু গুলির ব্যাগটা কোথায় জানি না। এখন সকাল না দুপুর না বিকাল কিছুই বুঝি না। হাতের ঘড়িটা গুলির ব্যাগের মতো কোথাও পড়ে গেছে। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্য কোন মানুষের কাছে যাওয়া যাবে না। কোন গ্রাম বা লোকালয়ে যাওয়া যাবে না। মানুষরাও আমাদের শত্রু। আমাদের অবস্থা পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর মতো। '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের সকল মানুষই ছিল পাক হানাদার বাহিনীর শত্রু। তখন পাক হানাদার বাহিনীর যে অবস্থা হয়েছিল এখন আমাদেরও সেই একই অবস্থা হয়েছে। মানুষ আমাদের সাহায্য করবে না। মানুষের কাছে যাওয়া যাবে না।

ক্ষুধার জ্বালায় বন গাছের কচি ডগা আর কাঁচা ধানের দুধ চুষতে লাগলাম। আর ভাবতে লাগলাম এখনই কোথাও রওয়ানা হবো, না সন্ধ্যা হলে রওয়ানা হবো। এখন রওয়ানা হলে শত্রুর কবলে পড়ার বিপদ আর সন্ধ্যার পর রওয়ানা হলো অন্ধকারে পথ হারাবার বিপদ। কোন বিপদটা গ্রহণ করবো? পানির পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণ পর পানির পিপাসায় এমনিই মরতে হবে। তখন প্যান্টটা ভাঁজ করে নেংটির মতো বানালাম। শার্টটা খুলে কোমরের সাথে বেঁধে জি থ্রি রাইফেলটা বা হাত দিয়ে শরীরের সাথে মিলিয়ে ধরলাম, যাতে দূর থেকে দেখা না যায় আমার কাছে অস্ত্র। তারপর সোজা পানির ভেতর হাঁটা শুরু করলাম। কিছু দূর হাঁটতেই একটা পানির ডোবা থেকে পানি খেলাম। এক লোক পায়খানা করে ঐ ডোবায় শৌচ করতে এসেছে। আমি ঐ লোকটাকে গান পয়েন্ট করে আমাকে সোজা সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলাম। নইলে প্রাণে মারার হুমকি দিলাম। সীমান্তের কাছাকাছি আসতেই দূর থেকে ভারতের পাহাড় নজরে এলে আমি ঐ লোকের হাত ধরে তাকে জোর করে নিয়ে আসার জন্য ক্ষমা চেয়ে ছেড়ে দিলাম। তারপর ভারতের পাহাড় লক্ষ্য করে দ্রুত হাঁটতে থাকলাম। সীমান্তে পৌঁছতে আমার সন্ধ্যা পেরিয়ে যায় হলো। আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের হেডকোয়ার্টার বা ক্যাম্পে পৌঁছে দেখি আমার বুকের সাথী দীননাথ দত্ত মুমূর্ষু সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে। দীননাথ দত্ত-এর সারা শরীরে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র। সেই সকল ছিদ্র দিয়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত বেরিয়ে আসছে। উপস্থিত সাথী ডাক্তার জন বেপারি এবং রাধা রমন রায় শাস্ত্রী (১৯৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী হনুমানটি থানার সেনাবাহিনীর সাথে এক সম্মুখ যুদ্ধে রাধা রমন রায় শাস্ত্রী ডাক্তার জন বেপারি নিহত হয়েছেন।) দীননাথ দত্তকে চিকিৎসা করেছে।

দীননাথ দত্ত সুস্থ হওয়ার পর জানতে পারলাম যে আক্রমণের থেকে রক্ষা পেতে পালিয়ে একটি কচুরিপানা ভরা পচা জলাশয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। সেই পচা জলাশয়ে ছিল অনেক দিন না খাওয়া রক্তখেকো জোঁক। রক্তখেকো জোঁক দীননাথকে পেয়েই কিলবিল করে ঘিরে ধরে রক্ত চুষে খেতে থাকে। দীননাথ দত্ত প্রাণ-এর মায়া আর পায়খানার রাস্তা দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে রাখে। যাতে জোঁক পায়খানা বা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে পেটের ভিতর ঢুকতে না পারে। দীননাথ দত্তের পালাবার কোন পথ ছিল না। কারণ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর লোকেরা ঐ পুকুর পাড় সতর্ক পাহারায় ছিল। বেরোলেই এটা নিশ্চয়ই ধরা পড়তে হবে। তাই সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার চাইতে জোঁকের হাতে মরাই শ্রেয় মনে করেছে দীননাথ দত্ত। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ঐ পুকুর পাড় থেকে সরে যেতে যদি আর এক দুই ঘণ্টা দেরী করতো, তাহলে রক্তশূন্য

জোঁক ইনজেকশন করায় শরীরের সমস্ত রক্ত চুষে খেয়ে ফেলতো। রক্ত শূন্যতার কারণে এখনও যে কোন সময় ইনজেকশন করা যেতে পারে। ঐ দিনের যুদ্ধে আমি আর ইনজেকশন করা ছাড়া আমাদের বাকি সকল জন সাথী নিহত হয়। কমান্ডারদের তখন অদূরদর্শিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে একই পরিণতি হয় সতেরো জেনারেল সাথীর এবং দুলাল দে বিশ্বাস ও তার সাথীদের।

কমান্ডার দুলাল দে বিশ্বাস যুদ্ধে প্রচণ্ড আহত হয়ে আহত অবস্থায় নৌকা করে পালিয়ে আসার সময় তীব্র যন্ত্রণায় তখন টি. আই. সি জেড ছিককে নির্দেশ দেয়, "ছিক তুমি আমাকে গুলি করে মেরে ফেল।" এই নির্দেশ পালনে টি. আই. সি ছিক অক্ষমতা প্রকাশ করলে পুনরায় দুলাল দে বিশ্বাস একই নির্দেশ দেয়। কিন্তু ছিক ও নির্দেশ পালনে পুনরায় অক্ষমতা প্রকাশ করে। এইভাবে কয়েক বার কমান্ডারের নির্দেশ পালনে টি. আই. সি ছিক অক্ষমতা প্রকাশ করার পর কমান্ডার দুলাল দে বিশ্বাস অপর সাথী মনসুরকে এই মর্মে নির্দেশ দেয় যে, "এখন আমি কমান্ডার দুলাল দে বিশ্বাস তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি, আমার টি. আই. সি ছিককে আমি যে নির্দেশ দিব, ছিক যদি সেই নির্দেশ পালন না করে তাহলে তুমি ছিককে গুলি করে মেরে ফেলবে।" তখনই টি. আই. সি ছিককে নির্দেশ দিল আমাকে গুলি করে মেরে ফেল। তখন অসহায় হয়ে টি. আই. সি ছিক কমান্ডারের নির্দেশে কমান্ডার দুলাল দে বিশ্বাসকে হত্যা করতে উদ্যত হল। টি. আই. সি ছিক কমান্ডার দুলাল দে বিশ্বাসকে টেনে নৌকার গোলুইয়ের বাইরে মাথাটা ঝুলিয়ে দিল। দুলাল দে বিশ্বাস "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" কবিতাটি পড়তে পড়তে [illegible] ছিকের দিকে তাকিয়ে থাকলো। ছিক থ্রি নট থ্রি রাইফেল এর ব্যারেল-(নল) টা দুলাল দে বিশ্বাসের মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করে দিল। "তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা" কবিতা পড়তে পড়তে একটি বুলেট দিয়ে দুলাল দে বিশ্বাসের দেহ চিরতরে নিস্তব্ধ হয়ে পড়লো।

মুক্তিযুদ্ধে [illegible] জেলার [illegible] থানার [illegible] হয়ে গেলে যোদ্ধা ইউনুস গুরুতর আহত হয়। সারাদিন এক রক্তক্ষরণের পর সাত-সকালে যোদ্ধা ইউনুসের দেহ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায়। সহযোদ্ধা ইউনুসের দেহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মৃত সাব্যস্ত করে ইউনুসকে ফেলে অন্য সাথীরা পালিয়ে যায়।

বছর চারেক আগে যশোর এক প্রতিবেশীর বাড়িতে এক অনুষ্ঠানে ঐ যুদ্ধের কথা উঠলে অনুষ্ঠানে আগত এক ভদ্রমহিলা [illegible] ও এক কথায় আমাকে পাশাপাশি নিয়ে বললেন, আমার ভাইকে তোমরা আহত অবস্থায় ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলে।

ঐ অন্ধ মহিলার কাছে জানতে পারলাম তিনি নিহত বলে ধরে নেওয়া মোঃ ইউনুসের বড় বোন। ইউনুসের বড় বোনের কাছে আরও জানতে পারলাম, যে যুদ্ধে ইউনুস আহত হয়েছিলো সেই যুদ্ধে ইউনুসদের বিপক্ষে যুদ্ধ করা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে একজন সুবেদার মেজর ছিল ইউনুসের ফুফাতো ভাই। সেই সুবেদার মেজর ইউনুসের চেহারা এবং ইউনুসের ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা কালো রুই দেখে ইউনুসকে চিনতে পেরে জেনারেল মাহবুবুর রহমানের কাছে ইউনুসকে বাঁচিয়ে রাখলে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে বলে ইউনুসকে বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তাব করেন। জেনারেল মাহবুবুর রহমান তৎক্ষণাৎ হেলিকপ্টারে করে ইউনুসকে কমবাইন্ড মিলিটারী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠিয়ে দেন। ইউনুসকে তখন দুটি গুলিসহ গলা থেকে নাভি পর্যন্ত চিরে অপারেশন এর মাধ্যমে সুস্থ করে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ইউনুস গলা থেকে নাভি পর্যন্ত অপারেশনের এক বিরাট কাটা চিহ্ন নিয়ে দশ বছর জেল খেটে মুক্তি পায়।

অন্যদিকে টাঙ্গাইল এক ব্রিজ ভাঙতে গিয়ে ধরা পড়ে যায় বিশ্বজিৎ নন্দি। সামরিক আদালত বিশ্বজিৎ নন্দিকে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়। বিশ্বজিৎ নন্দি ফাঁসির প্রকোষ্ঠে (কেথসেল বা কনডেম সেল) এক এক প্রায় সাতটি বছর মৃত্যুর প্রহর গুনতে থাকে। ফাঁসি দেওয়ার নিয়ম অনুযায়ী সূর্য ডোবার পর এবং সূর্য উদয় হওয়ার আগে ফাঁসি কার্যকর হতে হবে। যখনই সূর্য ডুবে যেত, সন্ধ্যা হতো, বিশ্বজিৎ নন্দি অপলক নয়নে আকাশে তাকিয়ে থাকতো, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে স্মরণ করতে থাকতো। আজ এই রাতেই আগামী সূর্যোদয়ের আগেই ফাঁসি হবে। আর পৃথিবীর সূর্য দেখবে না। পৃথিবীর আলো বাতাস ভোগ করবে না।

এই সুন্দর ধরণী থেকে চিরবিদায় নিতে হবে। সারা রাত ঈশ্বরকে ডাকতো আর প্রাণভরে ভগবানকে ডাকতো। ভীষণতো শেষ রাত। আর কখনই ভগবানকে ডাকতে পারবে না এ রাতই শেষ রাত। এই তো জল্লাদ এসে গেছে, এখনই ফাঁসিতে ঝুলানো হবে। এখনই মৃত্যু। ফাঁসির মঞ্চ প্রকোষ্ঠের বাইরের দেওয়ালে হঠাৎ মোরগের ডাক। এখনি ভোর। ভোর হলো। হা-হা-হা আমার ফাঁসি হয়নি। আমি মরিনি। আমি আজও আরো একদিন বেঁচে গেলাম। আরো একদিন পৃথিবীতে থাকবো। পৃথিবীর আলো বাতাস গ্রহণ করবো। হাঁ হাঁ হাঁ আমি মরিনি, আমি মরিনি। আমি আজ বেঁচে গেছি। ফাঁসির অবসানে প্রকোষ্ঠে সারা দিন খুশি আর আনন্দ। দিন শেষে সূর্য যখন ধীরে ধীরে ডুবতে শুরু করলো। সন্ধ্যা নেমে এলো, আবার অন্ধকার নেমে এলো আর ঈশ্বরকে স্মরণ করা। এই বুঝি জল্লাদ এলো, ফাঁসির দড়ি গলায় ঝুলিয়ে দিল। মৃত্যু হলো। এইভাবে প্রতিদিন, প্রতি সপ্তাহ, প্রতি মাস, প্রতি বছর। সাত বছরের বছর। সাত

ছিল স্মৃতি। সারা রাত কান্না। নিখোঁজ বন্দি হিন্দু হওয়ায় তাদেরকে পশ্চিম বাংলায় ভারতের সরকার এবং অন্যান্য সংগঠনের তৎপর করলেও কোনো কার্যকর হয় না। পরবর্তীতে নিখোঁজ বন্দিকে প্রায় পাঁচ বছর পর নিরাপদ মুক্তি দেওয়া হয়।

শহীদের রহমান সিরাজ ও শাহজাহান, মোকলেস সুজাত চৌধুরী নেতৃত্বে ১৭ জনের একটি গ্রুপ '৭৫ সালের আগস্ট এ সুজাতের নিজ জিলা গাইবান্ধা দখল করে। গাইবান্ধা শহরের প্রথম জাতীয় সরকারের আংশিক বিজয় হয়।

৩রা সেপ্টেম্বর '৭৫, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৬ ব্রিগেড এবং রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ১৬ বেঙ্গল—এর সেনারা পুরো গাইবান্ধা ঘেরাও করে সিরাজ ও সুজাতের অবস্থান করলে সিরাজ-সুজাত পার্টি আক্রমণের মাধ্যমে পিছু হটতে থাকে।

লড়াই-পিছু হটা, লড়াই-পিছু হটা করতে করতে সিরাজ-সুজাতরা গোবিন্দগঞ্জ থানায় চলে গেলেও সেনাবাহিনীর ঘেরাও ভাঙতে পারেনি। ৬ই সেপ্টেম্বর '৭৫ বিকেল পাঁচটায় গোবিন্দগঞ্জের কামদিয়া গ্রামে সিরাজ সুজাতের ৮ জন সাথী যোদ্ধা নিহত হয়। এবং গুলি শেষ হয়ে যাওয়ায় ও আহত হওয়ায় সিরাজ সুজা বুলবুলসহ আটজন সাথী বন্দি হয়। বন্দিদের মধ্যে (১) শফিকুর রহমান সিরাজ (২) আবু বকর সিদ্দিকী (৩) মোজাফফর করিম রেজা এবং (৪) খিজির এই চার জন যোদ্ধা আহত অবস্থায় বন্দি হয়।

সুজা, হুমায়ুন, মুন্না ও রফিকুল এই চারজন ক্রলিং অবস্থায় পালাতে সক্ষম হয়। বন্দি হওয়ার পরও আহত সিরাজ, বকর, রেজা ও খিজিরকে সেনাবাহিনীর লোকেরা সুজা, হুমায়ুন, মুন্না ও রফিকুলদের সামনেই গুলি করে মেরে ফেলে। এবং জীবিতদের বন্দি করে রংপুর ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে একনাগাড়ে সাথীদের নানা রকমের নির্যাতন ও জামানত শেষে জামিনে অভিযোগে এবং সামরিক আদালতে বিচারের মাধ্যমে যাবজ্জীবন কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। রংপুর, রাজশাহী ও কুমিল্লা কারাগারে একটানা এক বছর জেল খেটে সুজা, হুমায়ুন, মুন্না ও রফিকুল মুক্তি পায়।

সীমান্ত নিয়ে এসে আমাদের জাতীয় মুক্তি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কমরেড আবুল হাসেম সিদ্দিকী সিরাজগঞ্জ থেকে যারা নিখোঁজের এবং বেঁচে থাকার আমাদের সংগ্রাম যুদ্ধ করা যাবে না এবং উচিত না হবে আমরা আবারও থাকবো, শিক্ষা নেয়া না থেকে সর্বশক্তি দিয়ে কথা বলি। দেশের মানুষের প্রত্যাশা, আমাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা, জাতীয়তার পক্ষ মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রাম এবং জেনারেল ইত্যাদি বিবেচনায় বিচার বিশ্লেষণ করে আবুল হাসেম সিদ্দিকী সাময়িক যুদ্ধ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি বলেছেন সিরাজ, সুজা ও অন্যরাই জীবন দিয়ে গেল, আবার আমরা শুরু করবো। তাহলে বাংলাদেশকে একদিন, একদিন দেশকে মুক্ত করবো। বধূ শিশুর কোনো শত্রু থাকবে না।

আমরা বৃহত্তর সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার সীমান্ত অঞ্চলে শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করলাম এবং বেশ বড় এলাকা জুড়ে মুক্ত অঞ্চল তৈরি করলাম। প্রতিটি মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বি, ডি, আর এর সাথে আমাদের সম্মুখ যুদ্ধ লেগেই থাকতো। সেনাবাহিনী, বি, ডি, আর চাইতো আমাদের সীমান্তের ওপারে অর্থাৎ ভারতের ভিতরে ঠেলে দিতে। আমরা চাইতাম আমাদের মুক্তাঞ্চল আরো বাড়াতে।

আমাদের সাথীরা ময়মনসিংহ জেলার কলমাকান্দা থানা আক্রমণ করে থানার একজন আনসার ইন্সপেক্টরকে ধরে মুক্ত অঞ্চলে নিয়ে আসে। পরে আমরা উক্ত আনসার ইন্সপেক্টরকে চলে যেতে বললে তিনি চলে না গিয়ে আমাদের সাথে একাত্ম হয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। বহুদিন পর আমাদের সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকী আমাদের পক্ষে রেডিও টেলিভিশনে প্রচার চালানোর জন্য উক্ত আনসার ইন্সপেক্টরকে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের কাছে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিলে তিনি ঢাকায় ফিরে যান এবং কথামতো রেডিও টেলিভিশনে তার সাক্ষাৎকারে আমাদের কথা প্রচার করেন। লন্ডন থেকে প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বাংলার ডাক নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করে আমাদের কথা প্রচার করেন। এছাড়া আমাদের আর কোন প্রচার ছিল না। ভারতের এস, এস, বি (সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ব্যুরো) খুবই গোপনে আমাদের সাহায্য করতো। তারা অত্যন্ত সংগোপনে আমাদের অস্ত্র ও গোলা-বারুদ সরবরাহ করতো। এস এস, বি এতই সতর্কতা ও গোপনীয়তার সাথে আমাদের সাহায্য করতো যে, তা ভারতীয় বি, এস, এফ (বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স) সহ অন্যান্য সংস্থা এবং কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত জানতো না। ভারতীয় এস, এস, বি বা সেন্ট্রাল সিকিউরিটি ব্যুরোকে প্রত্যক্ষভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করতেন।

যুদ্ধে পরাজয়

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি পরাজিত হলে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় এবং মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় আমরা শংকিত হই। এমনিতেই সারা বিশ্বের আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমাদের সম্পূর্ণ বিপক্ষে। একমাত্র ইন্দিরা গান্ধি ছাড়া গোটা ভারতের রাজনীতিও ছিল আমাদের বিপক্ষে। আমাদের একমাত্র সমর্থক এবং সাহায্যকারী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি এখন ক্ষমতাচ্যুত। আমাদের দিন আমাদের আর হতাশ হওয়ার কোনই সময় নেই; ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই একেবারে আমাদের সকল সাহায্য বন্ধ করে দিলেন। বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ভারতের নতুন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই উভয়েই ছিলেন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিন ঘেঁষা লোক।

ফলে সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের পরামর্শে ভারত এবং বাংলাদেশ যৌথভাবে আক্রমণ করে আমাদের পরাস্ত করতে উদ্যোগী হয়।

সীমান্ত অঞ্চলে আমাদের দখলে থাকা মুক্তাঞ্চল এবং আমাদের ঘাঁটিগুলো ঘিরে ভারত ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। অপর দিকে বাংলাদেশও অনুরূপ ভাবে ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে। আমার সামনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বি. ডি. আর এবং পিছনে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বি. এস. এফ. এক বড় সাঁড়াশি আক্রমণে চতুর্দিক থেকে ঘেরাও হয়ে পড়ি। আমাদেরকে বাংলাদেশ ও ভারতের সেনারা চতুর্দিক থেকে ঘেরাও করার ফলে আমরা এক কোম্পানি থেকে আরেক কোম্পানি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি হেডকোয়ার্টার থেকেও। আমাদের এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটির যোগাযোগ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের সর্বাধিনায়ক কাদের সিদ্দিকীর সাথেও আমাদের সকল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

আমরা এক ঘাঁটির সাথীরা অন্য ঘাঁটির সাথীরা কি করছে, কি অবস্থায় আছে কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু বাংলাদেশের আর ভারতীয় আর্মিদের মাইকের আওয়াজ। একদিকে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী মাইকে বলছে, আটচল্লিশ (৪৮) ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পণ (সারেন্ডার) কর। নইলে আক্রমণ করা হবে। অন্যদিকে পিছনের দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী মাইকে বলছে, আটচল্লিশ ঘণ্টেকা অন্দর হাতিয়ার ডালো।

আমার ঘাঁটি ছিল ময়মনসিংহ জেলার দুর্গাপুর থানার ভবানীপুর। আমার ঘাঁটির সামনে ছিল বেশ বড় সোমেশ্বরী নদী। নদীর অপর পারে ছিল জেনারেল মাহমুদুল হাসান, মেজর মান্নান, মেজর মজিদ-এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং পিছনে ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী। আমরা উভয় দেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। আমাদের অবস্থান ছিল সৈন্যবহুল বাড়ান হয়, নদীর পাড়ে পাকাপোক্ত পরিখা খনন করা। এখান থেকে ভারতীয় বাহিনী আক্রমণ করে সহজে আমাদের ধ্বংস করতে পারবে না এই ধরনের কৌশলগত কারণেই বাংলাদেশ বাহিনী আমাদের সহজে ধ্বংস করতে পারবে না। আমার ধারণা ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও এতদূর এসে আমাদের ঘাঁটি দখল করতে আসবে না। ভারতীয় বাহিনী তাদের অবস্থান থেকে শুধু আক্রমণ করে আমাদের শায়েস্তা করতে চাইবে। কিন্তু এতদূর এসে আমাদের ঘাঁটি দখল করার কিছু বা ঝুঁকি নেবে না। আর আমাদের ঘাঁটির সামনে নদী থাকায় কৌশলগত কারণে আমরা অনেক সুবিধা ও সুদৃঢ় অবস্থানে আছি। বাংলাদেশ বাহিনীর পক্ষে নদী অতিক্রম করে আমাদের ঘাঁটি দখল করা এক দুরূহ ব্যাপার। এই অবস্থায় কেন্দ্রের নির্দেশ ছাড়া আমাদের

পরাও অত কঠিন। আমরা সবাই বিমান হামলা মোকাবেলা করার জন্য আগে থেকেই মাটি কেটে শাল বনের বিশাল বিশাল শাল গাছ দিয়ে তার উপর মজবুত করার পাথর, বালি আর মাটি দিয়ে দুর্ভেদ্য মজবুত বিশালকায় বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চ তৈরি করেছি। আমরা মাটির উপর না উঠে মাটির নিচ দিয়ে বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে অনায়াসে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে পারি এবং যুদ্ধ করতে পারি।

আমাদের অবস্থানের (ডাবেরহাটের) জন্য বেঁধে দেওয়া আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর, জেনারেল মাহমুদুল হাসান নিজে নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের ঘাঁটির উপর বড় ধরনের কামান থেকে সর্বাধিক গোলা নিক্ষেপ করে। সেই সময়ে পিছন দিক থেকে ভারতীয় বাহিনীও আমাদের উপর অবিরাম গোলা ও গুলী নিক্ষেপ করে।

ভারতীয় বাহিনীর গোলাগুলি ও বাংলাদেশ বাহিনীর মর্টারের শেলিং চলাকালে আমরা বাঙ্কার ও ট্রেঞ্চে থেকে বাংলাদেশ বাহিনীর দিকে সতর্ক ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা ছাড়া এক রাউন্ড গুলিও করিনি। তখনও ভোর হয়নি, অন্ধকার কাটেনি, আমরা অন্ধকারে হঠাৎ দেখতে পেলাম বিশ-ত্রিশ নৌকা বোঝাই হয়ে জেনারেল মাহমুদুল হাসানের বাহিনী নদী অতিক্রম করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা আক্রমণ করলে তারাও মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ করে। তাদের সমর্থনে সেনা বাহিনীর অন্য একটি দল কভারেজ প্রদান করে। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে যায়। ঘণ্টা তিনেক তীব্র সংঘর্ষের পর জেনারেল মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ বাহিনী প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি নিয়ে পিছু হটে যায়। এইভাবে সপ্তাহখানেক জেনারেল মাহমুদুল হাসানের আক্রমণ প্রতিহত করতেই আমাদের গোলা বারুদ ফুরিয়ে যায়। আমাদের অস্ত্রের যে মজুদ আছে তা দিয়ে বাংলাদেশ বাহিনীর আক্রমণ আরও কিছুদিন প্রতিহত করা যাবে। কিন্তু গোলা বারুদের অভাবে তাও ফুরিয়ে আসছে। আর চাউলের অভাবে আমাদের খাওয়া দাওয়াই বন্ধ হয়েছে। তিন দিন থেকে আমাদের কারও পেটে কোন দানা নেই। মাত্র তিন চারটি গরু জবাই করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমরা খেয়েছি। আজ তাও নেই। আমরা যারা একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধা, আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বহু অভাব অনটনে পড়েছি। কিন্তু খাদ্য সংকটে কখনও পড়িনি। গোটা বাঙালী জাতিই আমাদের খাদ্য সরবরাহ করেছে। আপামর বাঙালী নিজে না খেয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাইয়েছে। কোন মুক্তিযোদ্ধাই খাদ্য কষ্ট পায়নি। এদেশের মানুষ আগে মুক্তিযোদ্ধাদের খাওয়া জুগিয়েছে, তারপর নিজেরা খেয়েছে। একাত্তরের যুদ্ধে আমি খাদ্য সংকটে পড়িনি এবং যুদ্ধে অস্ত্র ও গোলা বারুদের অভাব থাকলেও যে একটা নিদারুণ অবস্থা কাকেও তাও বুঝিনি।

কোন অস্ত্র আছে, কিন্তু গোলা-বারুদের সংকটে পড়েছি। তার চাইতেও বেশি সংকটে পড়েছি খাদ্যের। আমাদের অস্ত্রগুলি পাঁচ সাত রাউন্ড গুলি ও গোলা ছুঁড়তে পারে। বা পাঁচ দশ মিনিটও টিকবে না। আমার মনে এখনো আশা শেষ মুহূর্তে ভারত হয়তো সহায় হতে পারে। যাদের সর্বাধিনায়ক জেনারেল [illegible] সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমাদের অনেকজন বন্ধু পালিয়ে গেছে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে বাইরে আমাদের নাম ধরে ডাকতে লাগলো। আর বলতে লাগলো, কোন অসুবিধা নেই, সবাই চলে আসুন ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুই দিন কোন পক্ষেরই কোন যুদ্ধ নেই, গোলাগুলি নেই। চতুর্দিক নিঝুম। আমাদের কেউ ব্যাংকারে, কেউ উপরে। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে। আমাদের কোনই আশা নেই। অস্ত্র আছে, কিন্তু নেই যুদ্ধ করার গুলি। সর্বোপরি নেই যুদ্ধ করার মতো বিন্দুমাত্র মানসিক শক্তি। আমি একটি ছোট কাঁঠাল গাছের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি জেনারেল মাহমুদুল হাসান তার বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নৌকা করে আমাদের তীরে এসে নামলো। পাশে রাখা আমার অস্ত্রটা একবার তাকিয়ে দেখলাম। হয়তো মনের ভুলেই দেখলাম। কিন্তু হাতে তুলে নিলাম না।

জেনারেল মাহমুদুল হাসান তার বাহিনীকে নদীর পাড়ে দাঁড় করিয়ে রেখে মেজর মবিন, মেজর আসাদুজ্জামান সহ কয়েক জন অফিসার সঙ্গে নিয়ে ধীরে ধীরে আমাদের ঘাঁটিতে উঠে এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। অত্যন্ত মোলায়েম এবং বন্ধু কণ্ঠে আমাকে বললেন, দিন, আপনার অস্ত্রটি আমার হাতে দিন।

আমি শেষ বারের মত আমার অস্ত্রটা দেখলাম। তারপর অনিচ্ছা হাতে জেনারেল হাসানের হাতে তুলে দিতে দিতে মনে মনে বললাম, বিদায় হে বন্ধু, বিদায়।

এরপর জেনারেল হাসান বললেন, চলুন আপনাদের ঘাঁটিটা একটু ঘুরে দেখি।

তিনি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন। আমাদের সবাই যে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলো।

কারো অস্ত্র হাতে, কারো অস্ত্র মাটিতে। মেজর মবিনকে অস্ত্রগুলো তত্ত্বাবধান করতে বলে, আমাদের সবাইকে এক জায়গায় জড় করালেন। এরপর নিয়ে গেলেন মুক্তিযুদ্ধ সেনাবাহিনীর একটি ঘাঁটিতে। সেখানে নিয়ে জেনারেল মাহমুদুল হাসান আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, আপনাদের চিন্তার বা ভয়-ভয়ের কোনই কারণ নেই। আমার সাথে [illegible] বিষয়টির [illegible]—এর কথা হয়েছে। [illegible] বিষয়টির [illegible] সম্মানের সাথে [illegible] দেওয়া হবে। শুধু মাত্র '৭৫-এর ১৫ই আগস্টের আগে যদি [illegible]

বাংলাদেশ সরকারের আওতায় মামলা থেকে থাকে তাহলে তাকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হবে। দুর্গাপুরে অনেক দিন থাকার পর আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো বুড়াইন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। এরপর সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হলো ময়মনসিংহের ফেরিঘাটের নিকট পার্বতী স্কুলের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে।

এই ক্যাম্পে আমাদের ইন্টারোগেশন শুরু হয়। প্রতিদিন আমাদের আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব লিখিত ও মৌখিকভাবে নেওয়া হতো। আমাদের মধ্য থেকে আমাদের সাথী প্রীতমের কমান্ডার মৌলভী সৈয়দ আহমেদকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে টর্চার (নির্যাতন) করে মেরে ফেলা হয়। এই সংবাদসহ আমাদের প্রতি ভারতের মোরারজি দেশাই সরকারের সর্বোচ্চ অমানবিক আচরণের সংবাদ ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলে, কংগ্রেস বিরোধী জোটের প্রতিষ্ঠাতা, ইন্দিরা গান্ধীর পতনের মূল নায়ক, যার নেতৃত্বে মোরারজি দেশাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী, ভারতের সেই প্রবীণ সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ বিক্ষুব্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মোরারজি দেশাইয়ের পদত্যাগ দাবি করেন।

জয় প্রকাশ নারায়ণের বক্তব্য ছিল, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেওয়া ভারতের নৈতিক দায়িত্ব এবং চিরকালের ঐতিহ্য। প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এই নৈতিক দায়িত্ব পালন না করে এবং চিরঐতিহ্য রক্ষা না করে বাংলাদেশের বিদ্রোহীদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকার নৈতিক দায়িত্ব ও অধিকার হারিয়েছেন। সুতরাং আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে পদত্যাগ করতে হবে। নইলে ক্ষমতাচ্যুত করা হবে।

সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতনের কার্যক্রম শুরু করলে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকার আমাদের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীসহ আরও শত শত মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় দেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তার দেওয়া কথানুযায়ী কাদেরিয়া বাহিনীকে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজে জড়িত হবে না এই মর্মে মুচলেকা (বন্ড) নিয়ে আমাদের নিঃশর্ত মুক্তি দেন।

মূলতঃ আমাদের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই সরকারের অমানবিক ও অনৈতিক আচরণের ফলে শেষ পর্যন্ত ভারতের সর্বোদয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ ক্ষমতার গদি থেকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাইয়ের পতন ঘটান।

হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের কর্মীদেরকে ফিরিয়ে আনা

কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েই হারিয়ে যাওয়া শেখ মুজিবের অনুসারী কর্মীদেরকে পুনরায় ফিরিয়ে এবং সংগঠন গড়ে তোলার কাজে নতুন করে ঝাঁপিয়ে পড়ি। একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ও তার কয়েকজন সাথী ছাড়া অন্য কেউই তখনও রাজনৈতিক সহযোগ না পাওয়ায় এস, এম, ইউসুফ, [illegible] ইসলাম [illegible], শেখ মোহাম্মদ আবু জাফর (বর্তমানে জাতীয় পার্টি নেতা) মোস্তফা মোহসীন মন্টু (বর্তমানে গণফোরাম নেতা) রবিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি. এস [illegible] চৌধুরী) [illegible] (শেখ মুজিবের খুনী মোস্তাক সরকার [illegible]) আবু [illegible] (বর্তমানে শেখ হাসিনার [illegible]) এস. এ. মালেক (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) সহ শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর যে সকল নেতা কর্মী জেলে আটক ছিল তারা সবাই [illegible] এক এক করে [illegible] আসেন।

[illegible] ইসলাম [illegible] (শেখ মুজিব ও [illegible] মন্ত্রী [illegible] হাতে ১৯৯৬-এ [illegible] নিহত) গোলাম মোস্তফা [illegible], আব্দুল [illegible] [illegible], [illegible] (বর্তমানে আওয়ামী [illegible] ও নেতা), [illegible] (বর্তমানে [illegible]), [illegible] (বর্তমানে [illegible]) এবং [illegible] বন্ধু [illegible] ঢাকা কলেজ সহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, [illegible] এবং [illegible] নতুন করে [illegible] গড়ে তুলতে থাকি। [illegible] ঢাকা শহরের সব [illegible] এবং [illegible] সংগঠন গড়ে তুলি। আমরা শুধু [illegible] সংগঠন গড়ে তুলেই [illegible] না। যুব লীগ, কৃষক লীগ এমন কি যুব সংগঠন আওয়ামী লীগও আমরা গঠন করে নিলাম। [illegible] কর্মী [illegible] এবং কর্মী [illegible] দিনে দিনে [illegible] এবং [illegible] সংগঠিত ও শক্তিশালী হতে থাকি। আব্দুল [illegible], এস, এম, ইউসুফ, শেখ মোহাম্মদ আবু জাফর, রবিউল আলম চৌধুরী ও [illegible] (আওয়ামী [illegible] নেতা), [illegible] স্বাধীন [illegible] সাবিহিত [illegible] এবং [illegible] সহ, [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] (বর্তমানে [illegible] আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা, [illegible] এম. পি. ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ থেকে [illegible]) [illegible] এবং [illegible] ও [illegible] এ, ম, [illegible] এম, পি শেখ হাসিনার [illegible]) [illegible] ১৫টি [illegible] শেখ মুজিবের [illegible] শেখ মুজিবের [illegible] এবং [illegible] নতুন [illegible]। [illegible] শক্তি ও [illegible] রাজনৈতিক [illegible] কর্মী [illegible] এবং [illegible] নতুন [illegible] এক [illegible] আওয়ামী লীগ [illegible]। [illegible] আওয়ামী লীগ [illegible] পড়ি। '৭১-এর [illegible] মুক্তিযুদ্ধের [illegible] আমরা [illegible] পেয়েছিলাম এবং স্বাধীনতার পর আমরা যা হারিয়েছি, সেই [illegible]

আদর্শ, তার নেতাকর্মী মানুষের জন্য মানুষের ভালবাসা, তোমার মত তাদেরই সুখ। দেশ ও মানুষের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞায় শীলা বেঁচেছে আমার ভিতর আমরণ থাকবে।

মোস্তাক ইত্যাদি শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় সম্মেলন হলো। প্রথম সম্মেলনে জহুরা তাজুদ্দীনকে আহ্বায়িকা করে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হলো। দ্বিতীয় সম্মেলনে কর্মীদের আপত্তি ও জোরালো বিরোধিতা সত্ত্বেও জহুরা তাজুদ্দীনকে বাদ দিয়ে আব্দুল মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও আব্দুর রাজ্জাককে সাধারণ সম্পাদক করা হলো। আমরা বিস্মিত চিন্তিত হই এই ভেবে যে, মালেক উকিল আদর্শবান ব্যক্তিত্ব নন। মালেক উকিল প্রেসিডেন্ট হলেও পার্টির চালিকা শক্তি থেকে যায় সেক্রেটারী আব্দুর রাজ্জাকের হাতেই। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন এবং মূল শক্তি ছাত্রলীগের সম্মেলন হয়। সম্মেলনে সারা দেশের মূল প্রতিনিধিদের কণ্ঠ-আকাঙ্ক্ষা পাশ কাটিয়ে অনেক নামী আন্দোলনের সম্মুখ সারির কাদের-চুন্নু প্যানেল ঘোষণা করা হয়। ওবায়দুল কাদের (শেখ হাসিনার মূল ও নীতি প্রতিদ্বন্দ্বী) কে সভাপতি ও বাহালুল মজনুন চুন্নুকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। পরে দেখা যায় মালেক-রাজ্জাক নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাদের-চুন্নু প্যানেল করে। এতে আমরা যারা আদর্শের জন্য নিবেদিত প্রাণ তারা দুঃখে মর্মাহত হই।

বাহালুল মজনুন চুন্নু গায়ের জোর, ও প্রতিপক্ষের আক্রমণ ব্যবহার এর মাধ্যমে নিজেকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে জাহির করে নিতে পারলেও সভাপতি হিসেবে ওবায়দুল কাদের কখনই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নাই এমনকি সাধারণ ছাত্রনেতা হিসেবেও দাঁড়াতে পারেনি।

ডাকসু নির্বাচনে তিন তিনবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রতিবারই হেরে গেছেন, কাদেরের পরাজয় ছাত্রদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু বাহালুল মজনুন চুন্নু সাধারণ ছাত্র সমাজের কাছে একজন নিবেদিত কর্মী ছাত্রনেতা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে পেরেছে।

১৯৭৮ সালে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দিলে, আওয়ামী লীগ সরাসরি নিজ দলের প্রার্থী না দিয়ে গণতান্ত্রিক ঐক্য জোট (গজ)-এর নামে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিপরীতে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে। ঐ নির্বাচনে মুক্তিযোদ্ধা জেনারেল জিয়াউর রহমান মূলত আওয়ামী লীগের প্রার্থী জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে জনগণের ভোটে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নির্বাচনের পরে জানা যায়, আওয়ামী লীগ কেবলমাত্র ঐ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য, বৈধতা ও স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সাথে গোপন আঁতাত ও লেনদেনের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিল।

রাজনীতিতে শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগে মালেক উকিল এবং তাজউদ্দীনের ওবায়দুল কাদের এর মত ভুল, অপেশাদারী ও অযোগ্য লোকের নেতৃত্ব আসায় নিবেদিত কর্মীদের মাঝে হতাশা ও তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই হতাশা ও ক্ষোভের মধ্যে আব্দুর রাজ্জাকের চরিত্র ও ভূমিকা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে। এরই মধ্যে আসে '৭৮ সালের আওয়ামী লীগের দ্বিবার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনকে সামনে রেখে রাজ্জাক এবং তোফায়েল উভয় গ্রুপ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখলের অর্থাৎ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দখলের তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এই প্রতিযোগিতায় মালেক উকিল রাজ্জাকের পক্ষে থাকলেও তোফায়েল গ্রুপ নেতৃত্ব দখলের প্রশ্নে কোন প্রকার ছাড় না দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। এতে আওয়ামী লীগ ভাঙনের সম্মুখীন হয়। ইতিমধ্যেই মিজানুর রহমান চৌধুরীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি ক্ষুদ্র অংশ আগেই দল থেকে বেরিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগ তৈরী করেছে। নেতৃত্ব দখলের লড়াইয়ের মাঝেই আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে দলের ভিতরের বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবেলা করার জন্য আব্দুর রাজ্জাক আওয়ামী লীগের সভাপতি পদে শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনাকে এই জেনে নিয়ে আসেন যে, শেখ মুজিব পরিবারের এই অরাজনৈতিক মহিলা সব সময়ই তার (আব্দুর রাজ্জাকের) মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় তাঁর ছেলে শেখ কামাল, ভাগ্নে শেখ মনি, শেখ সেলিম এবং কখনো কখনো শেখ কামাল রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ না করলেও শেখ হাসিনা তখনই রাজনীতির ধারে কাছেও ঘেষেনি। এমনকি সাম্প্রতিক কালে এক সময়ে শেখ হাসিনা ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ভি. পি. ছিলেন বলে প্রচার চালানো হলেও শেখ হাসিনা নিজে কখনই এমন দাবি করেননি। শেখ হাসিনার ভি. পি থাকার একমাত্র প্রমাণ হলো তবে কখন বা কোন সালে ভি. পি ছিলেন তা জানা যায় না। তাছাড়া শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও ছিলেন না — এমনকি তিনি (শেখ হাসিনা) আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্যও ছিলেন না।

তাছাড়া শেখ হাসিনা মহিলা, অন্যদিকে দেশের বাইরে থাকেন। কাজেই কোন দিক থেকেই রাজনৈতিক দক্ষতা ও অরাজনৈতিক মহিলা হওয়ায় অবশেষে আব্দুর রাজ্জাক যেভাবে চালাবেন, শেখ হাসিনা সেইভাবেই চলবেন। এই ধারণা থেকেই আব্দুর রাজ্জাক শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের সভাপতি করেন।

অন্যদিকে মালেক উকিলকে আওয়ামী লীগের কনভেনার এবং জোহরা তাজউদ্দীনকে যুবলীগের সভাপতি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় অবশেষে, তাছাড়া ছাত্র লীগ বাহিনীর আব্দুর রাজ্জাকের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা কমে যায় এবং শেখ মুজিবের মেয়ে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি হওয়ায় শক্তি বোধ করে।

সেনাবাহিনী এবং জেনারেলরা রাজনীতিতে বেআইনি ও অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং জনগণের উপর প্রভুত্ব করতে থাকলে আমরা ৭১ ও ৭৫-এর যোদ্ধারা সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে শক্তি তৈরীর চিন্তা করতে থাকি। ছাত্রদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণকালে ছাত্রদের সেনাবাহিনীর চাইতেও শক্তিশালী বাহিনী হতে পরামর্শ দেওয়া হতো। ছাত্রদের বুঝানো হতো, সশস্ত্র কিন্তু অশিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে সেনাবাহিনী। নিরস্ত্র কিন্তু শিক্ষিত বাহিনী হচ্ছে ছাত্রবাহিনী। সেনাবাহিনী বাস করে ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাকে এবং ছাত্ররা বাস করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসে।

সেনাবাহিনী জনগণের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং জনতার স্বার্থের পরিপন্থি কাজ করে। ছাত্ররা জনগণের পক্ষাবলম্বন করে এবং জনতার জন্য জীবন দান করে। আগামী দিনে লড়াই হবে, সেই লড়াইয়ে শিক্ষিত ছাত্রবাহিনীর কাছে অশিক্ষিত সেনাবাহিনী পরাজিত হবে।

সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল শওকত আলী এই দুই ব্যক্তি আওয়ামী লীগে যোগদান করলে, রেজাউল বাকি, গোলাম মোস্তফা খান মিরাজ, আব্দুস সালাম পিন্টু, মরহুম মোজাহেদুল ইসলাম কাজল, মোশারফ হোসেন সেলিম এবং আরো কয়েকজন '৭১ ও '৭৫ এর যোদ্ধা মিলে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলাম কর্নেল শওকত আলীকে সাথে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি সংগঠন করার। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কর্নেল শওকত আলীকে আহ্বায়ক করে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ নামে '৭১ ও '৭৫ এর যোদ্ধাদের একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলা হলো। আমাদের দৃষ্টি ক্যান্টনমেন্টের দিকে।

লক্ষ্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নে আমাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হলো। আমরা ছাত্র-যুবকদের আমরা সমাজ বিপ্লবে অংশগ্রহণের ও সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের দীক্ষা দিতে থাকলাম। ছাত্র-যুবকদের হাসি মুখে জীবন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে লাগলাম। বিপ্লব করতে হলে ব্যক্তি জীবনের অবশ্যই ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষতির হিসেব রাখা যাবে না। কেননা, বিপ্লব ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির হিসেব রাখে না। বিপ্লব ব্যক্তিগত ক্ষয়-ক্ষতির মধ্যে দিয়ে সামগ্রিক ফসল এনে দেয়। যা মূলত অধিকার বঞ্চিতদের নিশ্চিত সুন্দর জীবন এনে দেয়। কার্যক্রমের এই পর্যায়ে আমাদের সাথে যোগ দেন, '৭৫-সালের ৩রা নভেম্বর জেনারেল খালেদ মুশাররফ-এর নেতৃত্বে সংগঠিত ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানের অংশীদার মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার। যোগদানকারী সামরিক অফিসারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন লেঃ কর্নেল এ, এইচ, এম, গাফফার বীর বিক্রম। '৭৫-এর ৩রা

মতজারেল বার্ন অনুবাদের পাত্রে সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত এবং পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের মন্ত্রিসভার মন্ত্রী), মেজর নাসির (পরিচয় অজানা লেখক এবং বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী সুবর্ণা নাহার পত্তর স্বামী) এবং ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লা। কর্নেল শওকত সব সময় ইংরেজিতে রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন। এক ক্লাসে তিনি শিখিয়েছিলেন চোখে শুধু সুখ আছে, কিন্তু তৃপ্তি নেই। ভাতে সুখ এবং তৃপ্তি দুটোই আছে। '৮১ সালের ১৭ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবে দেশে ফিরে এলে আওয়ামী লীগের কর্মী এবং জনতা বিমান বন্দরে শেখ হাসিনাকে নজিরবিহীন সম্বর্ধনা দেয়।

এই জিয়া সেই জিয়া নয়

শেখ হাসিনার দেশে ফিরে আসার তিন চারদিন পরই তার সাথে আমাদের প্রথম বৈঠক হয়। এই বৈঠকে আলোচনার শুরুতেই শেখ হাসিনা ছাত্রনেতা ও মুক্তিযোদ্ধাদের বলেন, আজ থেকে প্রচার চালাতে হবে যে, এই জিয়া সেই জিয়া নয়।

অর্থাৎ বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক মেজর জিয়াউর রহমান নয়। শেখ হাসিনা হিটলারের তথ্য উপদেষ্টা গোয়েবলস-এর থিওরি অনুসারে বলেন, তোমরা যদি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারো, এই জিয়া স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া নয়, তাহলে দেখবে একদিন মানুষ এটাই বিশ্বাস করবে।

আমাদের মধ্য থেকে একজন প্রশ্ন করলো, তাহলে এই জিয়াকে কোন জিয়া বলবো?

শেখ হাসিনা বললেন, অত কথার দরকার নেই; শুধু বলবে এই জিয়া সেই জিয়া না।

এই কথা শুনে আমরা সবাই বিস্মিত হলাম এবং নিজেদের মধ্যে ফিসফাস ও হাসাহাসি করলাম। কিন্তু আমরা কেউ কোন দিন শেখ হাসিনার এ শিক্ষা "এই জিয়া সেই জিয়া নয়" প্রচার করলাম না।

রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যা

'৮১ সালের ২৩শে এবং ২৪শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি, এস, সির তিন তলায় সেমিনার কক্ষে '৭১ ও '৭৫-এর যোদ্ধাদের এবং সেনাবাহিনীর চাকুরিরত অফিসারদের গোপন ও জরুরী বৈঠক বসে। এই বৈঠকে কর্নেল শওকত আলী (বর্তমানে আওয়ামী লীগের এম. পি. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী)

মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান বীর উত্তমকে হত্যার পরিকল্পনা এবং হত্যাকালীন ও হত্যা পরবর্তী সময়ে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করেন। কর্নেল শওকত আলী বলেন, জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে গেলে চট্টগ্রামের জি, ও, সি মেজর জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম-এর নেতৃত্বে জিয়াকে হত্যা করা হবে এবং এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নেত্রী শেখ হাসিনা অবহিত আছেন। নেত্রী আমাদেরকে এই হত্যাকাণ্ডে সহায়তা ও ভূমিকা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা মাত্র কয়েক দিন হলো দেশে এসেছেন, এর মধ্যেই তিনি এমন একটি নির্দেশ কিভাবে দিতে পারেন? প্রশ্ন করা হলে কর্নেল শওকত আলী বলেন, শেখ হাসিনা দেশের বাইরে (ভারত) থাকতেই এ বিষয়ে অবহিত আছেন। কর্নেল শওকত আলী জিয়া হত্যাকাণ্ডে ও হত্যা পরবর্তী সময়ে আমাদের করণীয় সম্পর্কে বলেন যে, হত্যাকাণ্ডের সময় আমাদের চট্টগ্রামে ও ঢাকায় থাকতে হবে। আমাদের যারা চট্টগ্রামে থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে জেনারেল মঞ্জুর-এর কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় চলে আসা এবং ঢাকায় যারা থাকবে তাদের দায়িত্ব হবে চট্টগ্রাম থেকে আনা অস্ত্র নিয়ে ঢাকায় রেডিও-টেলিভিশনসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের মধ্যে একজন প্রশ্ন করে যে কখন এই হত্যাকাণ্ড হতে পারে প্রশ্ন করায় কর্নেল শওকত বলেন, এখন থেকে যে কোন সময় হতে পারে। যখনই জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে যাবেন তখনই তাকে হত্যা করা হবে। কর্নেল শওকত আরো বলেন, জিয়া হত্যা সংগঠন পর্যন্ত সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম, এরশাদসহ অন্যান্য জেনারেলগণ এবং রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান-এর গার্ড রেজিমেন্টের কর্নেল মাহফুজুর রহমান অস্থায়ীদের নেতা জেনারেল মঞ্জুরের সাথে থাকবেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে জিয়া হত্যা সংঘটিত হয়ে যাবে সেই মুহূর্ত থেকে এরা বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং দ্বন্দ্ব শুরু হবে। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বে থাকবে পাকিস্তান প্রত্যাগত (রিপ্যাট্রিয়েট) অফিসার ও জোয়ানসহ ঢাকার জেনারেলগণ। অন্যদিকে জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে থাকবে চট্টগ্রামের মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসার ও জোয়ানরা। জিয়া হত্যার পর জেনারেল এরশাদের আনুগত্যশীল সেনাবাহিনী এবং জেনারেল মঞ্জুরের আনুগত্যশীল সেনাবাহিনীর লড়াই হবে, যুদ্ধ হবে। এই যুদ্ধে উভয় গ্রুপেরই ক্ষতি হবে এবং একটি গ্রুপকে পরাজিত করে অপর গ্রুপটি বিজয়ী হলেও খুবই দুর্বল থাকবে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমরা ঐ বিজয়ী দুর্বল গ্রুপকে আক্রমণ করে পরাজিত করবো। এই হচ্ছে আমাদের হত্যা ও হত্যা পরবর্তী করণীয়।

এই জরুরী গোপন বৈঠকে ৩রা নভেম্বর '৭৫-এ সামরিক অভ্যুত্থানকারী কর্নেল গাফফার, মেজর নাসির, ক্যাপ্টেন হাফিজ এবং আরো অনেকজন সদস্য

নহ প্রায় সত্তর পঁচাত্তর জন যোদ্ধা উপস্থিত ছিল। বৈঠকে আমাদেরকে প্রধানত ৩টি গ্রুপে ভাগ করা হয়। একটি গ্রুপকে চট্টগ্রাম থেকে জেনারেল মঞ্জুরের কাছ থেকে অস্ত্র নিয়ে আসার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ সদস্যের দ্বিতীয় গ্রুপকে সারা দেশ নজর করে জিয়া বিরোধী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এই সংবাদ পৌঁছানো ও যে কোন মুহূর্তে যে কোন ধরনের এ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বাকি সবাইকে তৃতীয় গ্রুপ হিসেবে চব্বিশ ঘন্টা প্রস্তুত করে ঢাকায় রাখা হয়।

মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম পৌঁছলে, জেনারেল মঞ্জুরের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের কিছু সংখ্যক সেনা অফিসার অভ্যুত্থান করে এবং যে প্রকারে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অতি সহজে, বলা যায় বিনা বাধায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যা করতে পারলেও সেনাবাহিনীর সাধারণ জোয়ান ও জনগণ এই হত্যাকাণ্ড প্রত্যাখ্যান করে।

জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম এর আনুগত্যশীল অফিসারগণ চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশন দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রাখে। এদিকে ঢাকায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ, জেনারেল মীর শওকত বীর উত্তম, জেনারেল রহমানসহ সকল অফিসার ও জোয়ানেরা জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

জেনারেল মঞ্জুরকে মোকাবেলা করার জন্য কুমিল্লা ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টের জি ও সি ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানকে এক ব্রিগেড সৈন্যসহ চট্টগ্রামের দিকে পাঠান হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান চট্টগ্রাম সড়কের শুভপুর ব্রিজের ঢাকা পাড়ে অবস্থান নেয়। এবং শুভপুর ব্রিজের চট্টগ্রাম পাড়ে ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানকে মোকাবেলা করার জন্য জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি আনুগত্যশীল ক্যাপ্টেন লেঃ মোজাম্মেল খান সৈন্যসহ অবস্থান নেয়। অন্য দিকে ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার প্রতিবাদে এবং জেনারেল মঞ্জুরের বিরুদ্ধে জনগণ ব্যাপক বিক্ষোভ, মিছিল, মিটিং সমাবেশ করলেও উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার জিয়া হত্যার সংবাদ শোনামাত্র অসুস্থ হয়ে ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সি. এম. এইচ)-এ "রোগী নিরিবিলি কারো সাথে দেখা হবে না" বোর্ড লাগিয়ে ভর্তি হন। পরে জিয়াউর রহমানের প্রধানমন্ত্রী শাহ্ আজিজুর রহমান এবং যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুল আলীম সি. এম. এইচ-এ গিয়ে উপরাষ্ট্র পতি সাত্তারকে বলেন, সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ বলেছেন আপনি এখন রাষ্ট্রপতি।

প্রতি উত্তরে উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার বলেন, আগে সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদকে আনেন।

তারপর সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। দৃশ্যত সেনাবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে শুভপুর ব্রিজে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখি অবস্থান নিলেও এবং ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাতের ও বীভৎসতার অবস্থা সৃষ্টি হলেও কার্যত জেনারেল মঞ্জুর চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। ফলে আমাদেরকে অস্ত্র সমর্পণের দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। সেনাবাহিনীর সাধারণ সৈনিক জোয়ানেরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা সমর্থন করে না, এবং জি ও সি জেনারেল মঞ্জুরের প্রতি আনুগত্য পরোক্ষভাবে অস্বীকার করে। জেনারেল মঞ্জুরের পক্ষে শুভপুর ব্রীজে আসে ক্যাপ্টেন মোস্ত মোহাম্মদ-এর সৈন্যরা, ব্রীজের অপর পারে ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করে। নন-কমিশন অফিসার এবং সিপাহিরা ক্যাপ্টেন মোস্ত মোহম্মদকে সরাসরি পরিষ্কার বলে দেয়, জেনারেল মঞ্জুর প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা করেছে। এখন জেনারেল মঞ্জুর নিজে প্রেসিডেন্ট হবে। আমরা সুবেদার, হাবিলদার, সিপাহিরা যা আছি তাই থাকবো। আমরা নিজেরা নিজেদের জীবন দিব না। আপনারা অফিসারেরা অফিসারদের যুদ্ধ করেন। আমরা যুদ্ধ করবো না।

তখন ক্যাপ্টেন মোস্ত মোহম্মদ অবস্থা বেগতিক দেখে ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় এবং আত্মসমর্পণ করে। জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশনে ভাষণ দিতে এবং সাংবাদিক, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আলোচনা করতে ক্যান্টনমেন্টের বাইরে এলে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট তার সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে যায়। সেনাবাহিনীর বিশেষত নন কমিশন এবং জোয়ানেরা মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি এতই আনুগত্যশীল ছিল যে, সুযোগ পাওয়া মাত্র মুহূর্তের মধ্যেই তারা জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তম এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ফলে জেনারেল মঞ্জুর ও তার প্রতি আনুগত্যশীল অফিসারেরা আর ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যেতে তো পারেনইনি বরং পালিয়ে যেতেও পারেননি। পালিয়ে যাওয়ার সময় দৃশ্যত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার সরকারের প্রতি আনুগত্যশীল কিন্তু প্রকৃত অর্থে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের প্রতি আনুগত্যশীল সৈন্যদের আক্রমণে মঞ্জুর সমর্থিত কয়েকজন অফিসার হতাহত হলেও মেজর খালেদ ও মেজর মুজাফফর পালিয়ে ভারত সীমান্তের দিকে না গিয়ে লুকিয়ে থাকতে সমর্থ হয় এবং কর্নেল শওকত আলীর সেবাটারে (আড়ালে) থাকে। অন্যদিকে জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমসহ তার আরো কয়েকজন অনুগামী অফিসার বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে গ্রেফতার হলে, জিয়াউর রহমান হত্যার বিচারের পূর্বে থেকে আড়িত তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ প্রেরণকৃত জেনারেল মঞ্জুরকে

সাথে সাথে হত্যা করান। জেনারেল এরশাদ জিয়া হত্যায় তার সংশ্লিষ্টতা যাতে প্রকাশ না হয়ে পড়ে সেই জন্য জেনারেল মঞ্জুর বীর উত্তমকে গ্রেফতার হওয়ার সাথে সাথে হত্যা করান।

জেনারেল মঞ্জুর আত্মগোপন করে থেকে ব্যর্থ হন এবং গ্রেফতার ও নিহত হন। আমাদের সার্বিক সহায়তা নিয়ে এসে মেজর খালেদ ও মেজর মুজাফফরকে রাজশাহী সীমান্ত দিয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ পৌঁছে দেই। মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যায় জড়িত এবং প্রকৃতপক্ষে জেনারেল মঞ্জুরের সাথী তেরজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের গোপন সামরিক আদালত (কোর্ট মার্শাল)-এ বিচার শুরু হলে কর্নেল শওকতের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংস্কৃতি পরিষদ মেজর জিয়াউদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ এবং মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার লেঃ কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এই তিনটি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন ঐ বিচারের বিরুদ্ধে এবং গ্রেফতারকৃত মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলনের ডাক দেয়। উল্লেখিত তিনটি মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন ঢাকায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ ইত্যাদি কর্মসূচি চালিয়ে যেতে থাকে এবং এই সকল কর্মসূচিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহের সমর্থন ও অংশগ্রহণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। কিন্তু একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক নেতাকে ঐ সময় পাওয়া যায়নি। মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের মুক্তির জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের আন্দোলন সত্ত্বেও মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার অভিযোগে সামরিক আদালতের গোপন বিচারে বারজন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারের ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলো। এদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম, এরশাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঘোষণা করেন এবং তিনি নিজে প্রার্থী হন।

আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের বিপরীতে ড. কামাল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও নির্বাচনের তারিখ পিছানোর দাবী করতে থাকেন। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদ সমর্থিত বিচারপতি সাত্তার সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পিছানোর দাবী অগ্রাহ্য করে। '৮১ সালের ঐ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচাইতে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হলে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থা এন, এস, আই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স বা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা) এর কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতি প্রার্থীদের মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করায়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা যে কোন একজন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে হত্যা করে তাদের নির্বাচন পিছানোর দাবী

বাস্তবায়িত করার গোপন নির্দেশ দেন। উল্লেখ, এক প্রার্থী খুন হলে নির্বাচনী আইন অনুযায়ী ঐ নির্বাচন তিন মাসের জন্য স্থগিত হয়ে যাবে। প্রার্থী হত্যার শেখ হাসিনার গোপন নির্দেশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় এবং সাত্তার সরকার আওয়ামী লীগের নির্বাচন পিছানোর দাবি মেনে না নেওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় এবং সেই নির্বাচনে সেনাবাহিনী সমর্থিত বি. এন. পি. প্রার্থী বৃদ্ধ বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড. কামাল হোসেনকে পরাজিত করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

বিচারপতি সাত্তার রাষ্ট্রপতি হলেও মূল ক্ষমতা থেকে যায় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের হাতে। জেনারেল এরশাদ যখন যেভাবে খুশি সেইভাবেই রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে পরিচালনা করতে থাকেন। প্রকৃত অর্থে জনগণের ভোটে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার হয়ে যান সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের হাতের পুতুল।

জেহাদের ট্রেনিং

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর যারা কাদের সিদ্দিকী (বাঘা সিদ্দিকী)র সঙ্গে মিলে ঐ হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে যুদ্ধ করেছিল, তাদের অনেকজন ১৯৮২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে, ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (ঢাকা সেনানিবাস) দখল করার একটা প্রস্তাব ও পরিকল্পনা জানালে শেখ হাসিনা উক্ত প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সানন্দে গ্রহণ করেন। পরিকল্পনাটি ছিলো এই রকম যে, রাজনৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদান এবং কমিটেড পঁচিশ ত্রিশ হাজার যুবককে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করে, নির্দিষ্ট একটি দিনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অতর্কিত হামলা করে দখলে নিয়ে নেওয়া। আর ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করে নেওয়া মানেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে ফেলা। শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দিলেন এবং তার নিজের (শেখ হাসিনার) পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা এবং নেতৃত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন।

শুরু হলো ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দখল করার জন্য রাজনৈতিক কর্মী তৈরি করা এবং সাথে সাথে এই কর্মীদের কোথায় সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া যায় সেই স্থান খুঁজে বের করা। কর্মী সংগ্রহের জন্য সারা দেশে গোপনে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ শুরু হলো। এই কর্মীদের মন-মানসিকতা ও চাল-চলন এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হলো। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বড় ধরনের একটা কর্মী বাহিনী তৈরি করা গেল। এই কর্মী বাহিনীর মধ্যে থেকে

রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়ে বাছাই করে একটা ব্যাচ তৈরি করা হলো সামরিক শিক্ষার জন্য। অর্থাৎ মিলিটারী (আর্মি) ট্রেনিং-এর জন্য প্রথম ব্যাচ তৈরি করা হলো। কিন্তু সমস্যা হলো সামরিক শিক্ষা দেওয়ার জায়গা এবং অস্ত্র কোথায় পাওয়া যাবে? রাজনৈতিক শিক্ষা দেওয়া যত সহজ সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া তত সহজ নয়। সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা নিরাপদ মুক্ত এলাকা। যে এলাকায় প্রশিক্ষণার্থীরা নিরাপদে অস্ত্র চালনার মাধ্যমে অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করবে। '৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা ভারতীয় এলাকা নিরাপদে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। দশ বছর আগে ভারত তার মাটি থেকে আমাদের মিলিশিয়া বাহিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য ভারতের মাটি ব্যবহারের কোনই সম্ভাবনা নেই। বাংলাদেশের সুন্দরবন এবং চিটাগাংও সামরিক শিক্ষার জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় আমাদের কোন বন্ধু নেই। আফগানিস্তান রুশীয় সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। সেখানেও আমাদের কোন জায়গা নেই। সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) এর কোনই সাড়া শব্দ নেই। এমতাবস্থায় চিন্তা করতে করতে লেবানন এবং পি এল ও (প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন) এর কথা বিবেচনায় এসে গেল। গোপন যোগাযোগ করা হলো পি, এল, ও'র ঢাকাস্থ প্রতিনিধি আহমেদ এ, রাজেক এর সাথে। পি,এল,ও'র ঢাকাস্থ দূতাবাস এম্বাসিতে পি, এল, ও প্রতিনিধি আহমেদ এ, রাজেকের সাথে গোপনে কয়েক দফা বৈঠক হলো। আহমেদ এ, রাজেককে খোলাখুলি বলা হলো আমরা সামরিক প্রশিক্ষণ চাই বিনিময়ে তোমরা যা চাও আমরা দেব। আহমেদ এ, রাজেক আলোচনার সময় চাইলো।

আলোচনার পর আহমেদ এ রাজেক এর সাথে আবার বৈঠক হলো। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হলো পি, এল, ও আমাদেরকে লেবাননের মাটিতে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে দিবে। বিনিময়ে আমাদেরকে পি, এল, ও'র পক্ষে ইসরাইলীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আমরা রাজি হলাম। আমাদের প্রথম ব্যাচ লেবাননে গেলে তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে ইসরাইলের বিপক্ষে পি, এল, ও'র পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য দক্ষিণ লেবাননে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। প্রথম ব্যাচ যুদ্ধ করতে থাকবে, দ্বিতীয় ব্যাচ লেবানন যাবে। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষে রণাঙ্গনে গিয়ে যুদ্ধ করতে শুরু করলে প্রথম ব্যাচ বাংলাদেশে ফেরত দেবে। অর্থাৎ আমাদের একটা ব্যাচকে সব সময়ই পি, এল, ও'র হয়ে যুদ্ধ করতে হবে।

আমাদের বিমানে করে লেবাননে নিয়ে যাওয়া এবং ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যয় পি, এল, ও বহন করবে। আমাদের যারা যুদ্ধ করবে তাদেরকে পি, এল, ও বেতন দেবে।

সময়ে সময়ে সকল বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে জানানো হলো এবং তার পরামর্শ নেওয়া হলো। পি, এল, ও'র সাথে বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথম ব্যাচকে '৮২ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে লেবানন পাঠিয়ে দেওয়া হলো।

প্রথম ব্যাচ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে ইসরাইল সীমান্তে গিয়ে পি, এল, ও'র পক্ষে যুদ্ধ করতে লাগলো। এদিকে দ্বিতীয় ব্যাচ লেবানন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। এমন সময় ইসরাইল আক্রমণ করে লেবাননই দখল করে নিল। আমাদের সকল যোদ্ধা ইসরাইলীদের হাতে বন্দি হলো। আমাদের সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচী ভেস্তে গেল। আমাদের যোদ্ধাদের মা-বাবা আত্মীয়স্বজন সবাই কান্না কাটি শুরু করলো। মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা বেমালুম সব ভুলে গেলেন। নিশ্চুপ নীরব থাকলেন। আমাদের ছেলেদের ব্যাপারে কোনদিন আর কোন কথা বললেন না। অতঃপর অতি কষ্টে পাকিস্তান রেডক্রস এর মাধ্যমে ইসরাইলের হাতে বন্দি আমাদের যোদ্ধাদের দেশে ফিরিয়ে আনা হলো।

এরশাদকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ

এদিকে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম এরশাদকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পুনঃ আমন্ত্রণ জানাতে থাকেন।

জননেত্রী শেখ হাসিনা জনগণের পক্ষ থেকে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দিতে থাকেন। নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ও সরকার উৎখাত করে সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চার-পাঁচ দফা গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

অতঃপর জেনারেল এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের ইতিহাসে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ক্ষমতা দখলের অনেক আগেই ঢাকা সেনানিবাসে সংবাদ পত্রের সম্পাদকদের বৈঠক ডেকে সামরিক অভ্যুত্থানের ঘোষণা দেন।

'৮২ সালের মার্চের ২৪ তারিখ জেনারেল এরশাদ বিনা বাধায় বিনা বাক্যে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে রাষ্ট্রপতি ভবন বঙ্গভবন থেকে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেন এবং পরের দিন আবার তাকে ধরে নিয়ে এসে রেডিও টেলিভিশনে নিজের অযোগ্যতা ও তার সরকারের দুর্নীতি অরাজকতা ইত্যাদি কারণে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনী প্রধান এরশাদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে তিনি (রাষ্ট্রপতি সাত্তার) বিদায় নিলেন এ মর্মে ভাষণ দিতে বাধ্য করে। অশীতিপর বৃদ্ধ অথর্ব রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার কাপুরুষের মতো নিরবে নিঃশব্দে ভাষণ দিয়ে বিদায় নিলেন। সেনাবাহিনী প্রধান

লেঃ জেঃ হোঃ মোঃ এরশাদ দেশে সামরিক আইন জারি করলেন এবং তিনি স্বয়ং হলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও বিচারপতি এ, এফ, এম, আহসানউদ্দিন চৌধুরীকে করলেন ক্ষমতাবিহীন নামকাওয়াস্তে রাষ্ট্রপতি। শেখ হাসিনার গোপন আশ্রয়ে ও সহযোগিতায় জেনারেল এরশাদ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে জগদ্দল পাথরের ন্যায় জনগণের বুকে চেপে বসলো।

'৮৩র মধ্য ফেব্রুয়ারী ছাত্র হত্যা

বছর না ঘুরতেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ আর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার গোপন আতাতের মাঝে গোপন বিরোধ সৃষ্টি হলো। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ আলী মিয়ার মহাখালীস্থ আণবিক শক্তি কমিশনের সরকারী বাসভবনে শেখ হাসিনা বলেন, লেঃ জেঃ এরশাদ হাতের মুঠোয় আর থাকতে চাচ্ছে না। আমার হাতের মুঠো থেকে বাটাসটা ক্রমশ বেরিয়ে যাচ্ছে। ওকে হাতের মুঠোয় শক্ত করে আটকে রাখা দরকার।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য শেখ হাসিনা স্বামী ওয়াজেদকে দিয়ে এক ছাত্র আন্দোলনের পরিকল্পনা হাজির করে বলেন, এই ছাত্র আন্দোলনে অবশ্যই ছাত্র নিহত হতে হবে। যে করেই হোক ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যা হতেই হবে।

ছাত্র হত্যা হলে ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা হবে। আর ছাত্র আন্দোলন চাঙ্গা থাকলেই কেবল সি, এম, এল, এ জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় শক্ত ভাবে রাখা যাবে। শেখ হাসিনা ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার কঠিন নির্দেশ ও পরিকল্পনা দিলেন। কেবল আততায়ী বা অজ্ঞাত ঘাতকের হাতে ছাত্র হত্যা হলে কাজ হবে না। ছাত্র হত্যা হতে হবে সামরিক শাসক এরশাদের মিলেটারী অথবা পুলিশের হাতে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, উপায় যা-ই থাকুক, এটা করতেই হবে। কিভাবে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায় সবাই এ নিয়ে খুব ব্যস্ত এবং চিন্তিত।

যোগাযোগ হলো সাবেক মিলেটারী ট্রুপস আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার (সিনিয়র এস, পি) হাফিজুর রহমান লস্করের সাথে। এই হাফিজুর রহমান লস্কর পুলিশের অফিসার হয়েও দীর্ঘদিন যাবত এন, এস, আই (ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টিলিজেন্স বা রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা) এর ডেপুটি ডাইরেক্টর পদে ঘাপটি মেরে বসে ছিলেন। এরশাদ ক্ষমতায় এসেই হাফিজুর রহমান লস্করকে এই বলে এন, এস, আই থেকে হটিয়ে বিদায় করেছেন যে, তুমি পুলিশের লোক হয়ে

এখানে কি করা? যাও পুলিশের গোয়েন্দাপদে আত্মার জোর ধর। বলেই এন এস আই-এর ডেপুটি ডাইরেক্টরের পদ থেকে হাফিজুর রহমান লস্করকে সোজা আর্মড পুলিশের তৎকালীন হেডকোয়ার্টার ১৪নং মিরপুরে কোম্পানী কমান্ডার পদে বদলী করে পাঠিয়ে দেয়। এই কারণে আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার (পুলিশের সিনিয়র এস. পি) হাফিজুর রহমান লস্কর জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে খুবই চটা ও বৈরী ছিলেন। এর উপর ছিল নগদ অর্থের টোপ। এরশাদের প্রতি ভয়ানক ক্ষোভ ও বিরাগভাজন এবং নগদ অর্থের টোপ দুইয়ে মিলে, ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার প্রস্তাব আসা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে হাফিজুর রহমান লস্কর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এন, এস, আই-এর মূল কাজ হচ্ছে কোন সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের লিস্ট বা তালিকা তৈরি করে সরকারকে সরবরাহ করা। এবং সরকারের পতন হলে, সঙ্গে সঙ্গে পতন হয়ে যাওয়া সরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নথি-পত্র পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলে নতুন সাদা ফাইল নিয়ে নতুন সরকারের কাছে হাজির হওয়া।

৩০শে মে '৮১ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে এন, এস, আই-এর কর্মকর্তাগণ জিয়া বা বি, এন, পি, সরকারের আমলে তৈরি করা সমস্ত নথি-পত্র পুড়িয়ে ফেলতে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তে নথি-পত্রে অগ্নিসংযোগ করতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। অর্থাৎ বি, এন, পি, সরকারই টিকে যায়। ফলে এন, এস, আই কর্মকর্তাগণ নথি-পত্র পুড়িয়ে না ফেলে আবার তা সংরক্ষণাগারে বন্ধ করে তুলে রাখেন। উপ-রাষ্ট্রপতি সাত্তার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হলেও মূলত ক্ষমতা চলে যায় সেনাবাহিনী প্রধান হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের হাতে। সেই সুবাদে জেনারেল এরশাদ বিচারপতি সাত্তারকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদে রেখে এন, এস, আই-এর নথি-পত্রগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এন, এস, আই-এর নথিপত্রে জিয়াউর রহমান বা বি, এন, পি সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারীদের তালিকায় জেনারেল এরশাদ-এর নামও ছিল। ফলে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসেই প্রথমেই এন, এস, আই থেকে হাফিজুর রহমান লস্করকে খেদিয়ে বিদায় করে। আর সেই কারণেই এবং নগদ অর্থের বিনিময়ে হাফিজুর রহমান লস্কর গং জেনারেল এরশাদ ও তার সামরিক শাসনের পতনের যে কোন প্রস্তাব বা প্রক্রিয়ায় শামিল হন।

আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের সঙ্গে ছাত্র আন্দোলনের নামে ছাত্র হত্যার নীলনকশা চূড়ান্ত হয়। নীল নকশা অনুযায়ী যে কোন প্রকারে কোন রকমে ছাত্রদের একটা মিছিল বাংলা একাডেমির দক্ষিণে, কার্জন হলের উত্তরে শিশু একাডেমির পশ্চিমে দোয়েল চত্বর পর্যন্ত নিয়ে আসতেই হবে। বাকি কাজ আর্মড পুলিশ সেরে ফেলবে। অর্থাৎ আমাদের নিরীহ ছাত্রদের একটা

মিছিল দোয়েল চত্বর পর্যন্ত নিয়ে আসা, তারপর সেই মিছিলের উপর গুলি চালিয়ে ছাত্র হত্যার দায়িত্ব আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করের। এই নীলনক্সা অনুযায়ী মিছিল নিয়ে আসার প্রাথমিক দায়িত্ব পড়ে জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের জি-এস কাদেরীয়া বাহিনীর সদস্য নিরঞ্জন সরকার বাপ্পু, নাথন সরকার, মানস, বিদ্যুৎ, শ্যামল, মধুর এর উপর।

জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে একটা মিছিল করার প্রস্তাব নিয়ে ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান, মাহমুদুল মজনুন দুলু, ডাঃ মোস্তাফা মহিউদ্দিন জালাল, খ, ম জাহাঙ্গীর, ডাকসু ভিপি আক্তারুজ্জামান, জি এস জিয়াউদ্দিন বাবলু, ফারুক, আনোয়ার, মিলন, জালাল প্রমুখ ছাত্র নেতাদের সাথে আলোচনা করা হলে সকলেই মিছিলের পক্ষে মত দেন।

ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমেই মিছিলের তারিখ নির্ধারণ হলো এবং মিছিল শিক্ষা ভবন পর্যন্ত যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো। সিদ্ধান্ত মোতাবেক কলা ভবন থেকে ছাত্র মিছিল শুরু হলো। এদিকে শিক্ষা একাডেমির কাছে আর্মড পুলিশ নিয়ে মিছিলে গুলি করে ছাত্র হত্যার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে হাফিজুর রহমান লস্কর দাঙ্গা পুলিশ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকলো।

কিন্তু কিছুতেই মিছিলকে কলা ভবনের আশপাশের বাইরে নেওয়া গেল না। অধিকাংশ ছাত্রনেতা মিছিল নিয়ে এগিয়ে যেতে মুখে অস্বীকার না করলেও, কার্যত মিছিল নিয়ে কেউ কলা ভবনের বাইরে গেল না। ফলে নীলনক্সা ভেস্তে যাওয়ায় আমরা উত্তেজিত হয়ে ছাত্রনেতাদের গালিগালাজ করলাম এবং কোন কোন ছাত্রনেতাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করলাম। আবার ছাত্র মিছিলের নতুন তারিখ নির্ধারিত হলো।

আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩, ১লা ফাল্গুন ছাত্র মিছিল হবে এবং মিছিল শিক্ষা ভবন অভিমুখে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

১২ই ফেব্রুয়ারী '৮৩, সকাল ৮টায় ১৪নং মীরপুর আর্মড পুলিশের হেড কোয়ার্টারে এন, এস, আই-এর সাবেক কর্মকর্তা পুলিশের সিনিয়র এস, পি আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান লস্করকে আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী ছাত্র মিছিলের চূড়ান্ত কর্মসূচী অবহিত করা হলো এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী রাত আটটায় হাফিজুর রহমান লস্কর-এর মীরপুর দুই নম্বরের বাসায় আগামীকাল ১৪ই ফেব্রুয়ারী সকাল দশটায় যে কোন কিছুর বিনিময়ে ছাত্র মিছিল শিক্ষা একাডেমী পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী নিশ্চিত করা হলো এবং নগদ অর্থ প্রদান করা হলে তিনিও (হাফিজুর রহমান লস্কর) ছাত্র হত্যার জন্য প্রস্তুত বলে চূড়ান্তভাবে জানান।

রাত এগারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের এ্যাসেম্বলী বিল্ডিং-এ জগন্নাথ হল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক '৭৫-এর কাদেরীয়া বাহিনীর সদস্য

ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাচ্চুর রুমে সর্বশেষ গোপন বৈঠক হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছাত্রনেতা নিরঞ্জন সরকার বাচ্চু, মোজাম্মেল হোসেন সৌমিত্র, ডাকসুর মহিলা সম্পাদিকা নাহিদ আমিন খান, সাধন সরকার, মাহবুব, বিদ্যুৎ প্রমুখকে আগামীকাল ১লা ফাল্গুন মোতাবেক ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ সকালের ছাত্র মিছিল ও ছাত্র হত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো ও আলোচনা শেষে সিদ্ধান্ত হয় যে, ছাত্রনেতা ফজলুর রহমান, খায়রুল আমিনুল হকসহ প্রগতিশীল ছাত্র নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কোন অবস্থাতেই আনবিক শক্তি কমিশনের পরে যাতে মিছিলে না থাকে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে।

আজ ১লা ফাল্গুন, ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩। ফুল ফুটুক আর নাই ফুটুক আজ বসন্ত। ফাল্গুন রাঙা বসন্তের এই সমীরণে আজ সবাই উদ্বেলিত। বাঙালি রমণীরা লাল পেড়ে হলুদ শাড়ি পরে ভোর হতে না হতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে বসন্তকে অবগাহন করতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া ও সামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা খুব ভোর থেকেই লাল পেড়ে বাসন্তি রঙের শাড়ি পরে বসন্ত উৎসবে মেতে উঠেছে। বসন্ত উৎসব মুখর বিশ্ববিদ্যালয়। লাল পেড়ে হলুদ বর্ণের শাড়ি পরে কোন কোন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ছেড়ে মনের মানুষের সাথে বসন্ত উৎসব করতে দূর-দূরান্তে চলে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লাল পেড়ে হলুদ শাড়ির সমারোহ। আজি এ বসন্ত .... সবাই বসন্তের দোলায় দুলছে। কেউ জানে না একটু পরে কি ঘটতে যাচ্ছে। কে নিহত হতে যাচ্ছে। কোন্ স্নেহময়ী মায়ের বুক খালি হচ্ছে। কোন পিতা সন্তান হারা হচ্ছে। বেলা দশটার দিকে কলাভবনের সামনে অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে মিছিলের উদ্দেশ্যে ছাত্ররা জমায়েত হতে শুরু করে। একটি মটর সাইকেলে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে শেখ হাসিনা, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আর্মড পুলিশের হাফিজুর রহমান শঙ্কর এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছে। মটর সাইকেলটি দ্রুত গতিতে ৩২ নাম্বারে শেখ হাসিনা ও শিশু একাডেমীর পূর্ব পাশে অবস্থানরত আর্মড পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার হাফিজুর রহমান শঙ্করের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানিয়ে যাচ্ছে। বেলা এগারোটা নাগাদ ছাত্র মিছিল শুরু হলো।

যেসব ছাত্রনেতা ও কর্মীদের আনবিক শক্তি কমিশনের পরে মিছিলে আর না থাকতে জানিয়ে দেওয়ার কথা তাদেরকে তা জানিয়ে দেওয়া হলো।

সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা মতো মিছিলসহ সব কিছুই ঠিকঠাক চলতে থাকলো। ছাত্র মিছিল আনবিক শক্তি কমিশন পর্যন্ত এগিয়ে গেলে কিছু ছাত্রনেতা ও কর্মীরা মিছিলের পিছন থেকে সরে পড়লো। মিছিল এগিয়ে গেল বাংলা একাডেমী ছেড়ে আরো সামনে দক্ষিণের দোয়েল চত্বরের দিকে। একেবারে দোয়েল চত্বরের কাছে

এবং মিছিল এই লোডেন চত্বর পিছনে ফেলে পূর্ব দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা হাবিবুর রহমান লস্করের আর্মি পুলিশের গুলি, গুড়ুম গুড়ুম, ঠাস ঠাস: মুহূর্তের মধ্যে লুটিয়ে পড়লো কয়েকজন ছাত্র।

মটর সাইকেলটি দ্রুত ধানমণ্ডি ৩২ নাম্বারে গিয়ে শেখ হাসিনাকে এই সংবাদ দিয়ে আবার ছুটে চললো ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ইতিমধ্যে ছাত্ররা হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের নিয়ে এসেছে, গুলিবিদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে জয়নাল ও জাফর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী ছেড়ে পরকালে চলে গেছে। জয়নাল ও জাফরের মায়ের কোল খালি হয়েছে। শূন্য হয়েছে পিতার বুক। নীল-নকশা বাস্তবায়িত হওয়ার দুঃসহ সংবাদটি নিয়ে মটর সাইকেলটি চলে গেল ধানমণ্ডি ৩২ নাম্বারে। দুজন ছাত্র হত্যার মর্মান্তিক সংবাদটি শেখ হাসিনাকে দিয়ে মটর সাইকেলটি ফিরে এলো বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঢেকে গেছে ১লা ফাল্গুনের বসন্তের উৎসব। ছাত্ররা ভাস্কর শিল্পী জাফর ও জয়নালের লাশ কলা ভবনের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ঐতিহাসিক বটতলায় নিয়ে এসেছে। বিকাল তিনটায় জানাজা ও শোক সভার কর্মসূচিটা ৩২ নাম্বারে দিলে, দুপুর ২টা নাগাদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা আসেন এবং তার (শেখ হাসিনার) দীর্ঘ প্রতিক্ষিত নিহত ছাত্রদের লাশ দেখে রুমালে নিজে চক্ষু মোছার ভান করতে করতে কোন কর্মসূচী না দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করেন। শোকে মুহ্যমান ছাত্র-ছাত্রীরা বটতলায় সমবেত হতে থাকে এবং ১লা ফাল্গুনে বসন্তের পোষাক লাল পেড়ে বাসন্তি রং-এর শাড়ি পরে প্রভাতে ক্যাম্পাসের বাইরে যাওয়া রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফিরে এসে ছাত্র হত্যার ঘটনায় শোকে বিহ্বল হয়ে বটতলার শোকসভায় সমবেত হয়।

শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে সোজাই সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে কোন রূপ আন্দোলনের কর্মসূচী না দেওয়ার বিনিময়ে এরশাদের কাছ থেকে কতগুলো গোপন দাবী আদায় করে নেন। ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে আন্দোলনের কর্মসূচী দেওয়া হবে না এই মর্মে শেখ হাসিনার কাছ থেকে নিশ্চয়তা ও আশ্বাস পাওয়ার পর জেনারেল এরশাদ সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় চতুর্দিক থেকে নজিরবিহীন পুলিশি ও মিলিটারী হামলা চালায়। পুলিশের চতুর্দিক থেকে সাঁড়াশি হামলার মুখে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বটতলায় অনুষ্ঠিত জানাজা ও শোক সভায় সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়াতে থাকে। কিন্তু যেদিকেই দৌড়ায় সেদিকেই পুলিশের ও আর্মির বেধড়ক মার। নিমেষের মধ্যেই বটতলায় হাজার হাজার স্যান্ডেল জুতা পড়ে থাকা ছাড়া কোন মানুষের চিহ্ন থাকে না।

জাফর ও জয়নালের লাশ দুটি গুটি করে খাজেআ ধরাধরি করে সূর্যসেন হলে নিয়ে যায় এবং সূর্যসেন হলের গেটের ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে বন্ধ করে দেয়। হলের রুমের ভেতরে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী, আর হলের আঙিনাসহ সারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু পুলিশ আর সেনাবাহিনী। মুহূর্তের মধ্যে পুলিশ আর আর্মি হলের কেচি গেট ভেঙে রুমের মধ্যে প্রবেশ করলো। অবস্থা বেগতিক দেখে মটর সাইকেল আরোহী সূর্যসেন হলের দোতলা থেকে এক লাফ দিয়ে পড়লো হলের আঙিনায়। আর অমনি শকুনের দল যেমনি মরা গরু ঘিরে ধরে খায় তেমনি পুলিশের দল মটর সাইকেল আরোহীকে ঘিরে পেটাতে লাগলো। এরই মধ্যে মটর সাইকেল আরোহী প্রাণপণ বেগে ছুটে চললো সূর্যসেন হলের বাউন্ডারী ওয়ালের দিকে। মটর সাইকেল আরোহী দৌড়াচ্ছে আগে আগে, পিছনে পিছনে শকুনের ঝাঁকের ন্যায় দৌড়াচ্ছে আর পিটাচ্ছে পুলিশ ও আর্মি। পরি কি মরি করে এক লাফে সূর্যসেন হলের প্রাচীর টপকে কাটাতার আর পলাশির রাস্তায় গিয়ে পড়লো মটর সাইকেল আরোহী। সেখান থেকে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে গিয়ে শেখ হাসিনাকে না পেয়ে আণবিক শক্তি কমিশনের পরিচালক শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার মহাখালি সরকারী বাসভবনে গিয়ে শেখ হাসিনার গাড়োয়ার জীপ পাওয়া গেলেও শেখ হাসিনাকে পাওয়া গেল না। শেখ হাসিনার প্রিয় এবং বিশ্বাসী বাবুর্চি রমাকান্তর কাছ থেকে জানা গেল তিনি (শেখ হাসিনা) কাউকে সাথে না নিয়ে অপরিচিত একটি প্রাইভেট কারে-এ করে অপরিচিত একমাত্র চালক আরোহীর সাথে বোরখা পরে অজানা স্থানে গিয়েছেন

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হলের গেট ও দরজা ভেঙে পুলিশ এবং মিলিটারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী এবং ছাত্রদের বেধরক মারপিট ও গ্রেফতার করে সারারাত খোলা আকাশের নিচে বসিয়ে রাখে এবং নিহত ছাত্র জাফর ও জয়নালের লাশ নিয়ে যায়। বলাবাহুল্য, ঐ সময় (১৯৮৩ সালে) বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বি. এন. পি-র সাংগঠনিক কোন অস্তিত্ব ছিল না। ফলে বেগম খালেদা জিয়া ছাত্র হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয়েও আসেননি। সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদ এবং তার সামরিক আইনের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের ঐতিহ্যবাহী সহজ সরল প্রাণ এদেশের ছাত্র সমাজের প্রথম আন্দোলন, প্রথম বিদ্রোহ এবং আত্মদান। রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা এবং শেখ হাসিনার পাতানো আপোষকামীতার কারণে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বৃথা হয়ে যায় জাফর ও জয়নালের আত্মদান। সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ নিশ্চিন্তে, নির্বিঘ্নে, নির্ভাবনায় ক্ষমতায় বসে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভাবে ছাত্র সমাজ দিশেহারা হয়ে পিছিয়ে যায়। এদেশের আন্দোলন সংগ্রাম-এর মূল চালিকা শক্তি আওয়ামী লীগ এবং তার নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সামনে রেখে দোর্দণ্ড প্রতাপে চলতে থাকে এরশাদের সামরিক শাসন।

সেলিম ও দেলোয়ার হত্যা

বছর ঘুরে এলো ১৯৮৫ সাল। আবার ফিরে এলো ভাষা আন্দোলনের শহীদের মাস, ফেব্রুয়ারী মাস। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নতুন করে নির্দেশ, এরশাদের বিরুদ্ধে আবারো ছাত্র আন্দোলন করতে হবে।

৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ সাল। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনে বিশেষ গোপন বসলো এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক। বৈঠকে নেত্রী যে কোন প্রকারেই হোক ছাত্র আন্দোলন করার কঠোর নির্দেশ দিলেন। শুরু হলো আবার ছাত্র হত্যার নতুন পরিকল্পনা। একদিকে চলতে লাগলো ছাত্র হত্যাকারী পুলিশ অফিসার হাফিজুর রহমান গংদের ভাড়া করার কাজ। অন্যদিকে চলতে লাগলো সাধারণ ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার কাজ।

শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে খুবই দ্রুত ছাত্র হত্যাকারী পুলিশ অফিসারদের ভাড়া করার কাজ সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু ছাত্রদের আন্দোলন করার জন্য সংগঠিত করা সম্ভব হলো না। নানাভাবে নানা রকম চেষ্টা তদবির করেও ছাত্রদের আন্দোলনে শরীক করা গেল না।

গোটা ছাত্র সমাজই এরশাদের বিরোধী। কিন্তু আন্দোলনের প্রশ্নে, আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রশ্নে ছাত্র সমাজ শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করতো না। বেগম জিয়া এবং বি,এন,পি-র তখনো তেমন কোন অস্তিত্ব অনুভব করা যায়নি। দিন গড়িয়ে যায়, কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এদিকে ছাত্র হত্যাকারী ভাড়াটে পুলিশেরা '৮৩র মধ্য ফেব্রুয়ারীতে সংঘটিত ছাত্র হত্যার অনুরূপ পরিকল্পনা ও কর্মসূচী হাতে নিয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে এবং মধ্য ফেব্রুয়ারীর নাগাদ একটা ছাত্র মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছে। তাগাদা দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। দিন যায় কিন্তু আন্দোলনের কোন খবর নেই। এক পর্যায়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা অধৈর্য হয়ে তোমাদের দ্বারা কিছুই হবে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

অনেক চেষ্টা করেও শ'খানেক ছাত্রের একটা মিছিল নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে আসতে পারলাম না। ফলে গত '৮৫র মধ্য ফেব্রুয়ারীর নাগাদ ছাত্র হত্যা সম্ভব না হওয়ায় ছাত্র হত্যার সময় পাল্টাতে হলো।

ভাড়াটে পুলিশের কোম্পানী কমান্ডার পুলিশের ডিভিশন এস,পি, হাফিজুর রহমান নতুন ছাত্র হত্যার পরিকল্পনায় ভাড়াটে পুলিশের পরিবর্তে আনসার পুলিশকে সম্পৃক্ত করে এবং নতুন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হয় যে, ২০/৩০ জনের একটি মিছিল কোন রকমে যে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন দিক দিয়ে বাইরে

নিয়ে এলেই রায়ট পুলিশ (যে পুলিশ ২৪ ঘন্টা বিশ্ববিদ্যালয়েই থাকে) ছাত্র হত্যা পরিকল্পনা সফল করে দেবে। সাধারণ ছাত্র তো দূরের কথা ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরাই মিছিলে আসতে চায় না।

এদিকে কেন্দ্রীয় কড়া নির্দেশ ছাত্রলীগের একটা বড় মিছিল নিয়ে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে যেতে হবে, নইলে তোমাদের দায়িত্ব থেকে বিদায় নিতে হবে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস-এর বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো এবং যথারীতি এই সিদ্ধান্ত জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জানানো হলো, শেখ হাসিনার মাধ্যমে এই সংবাদ হাফিজুর রহমান লস্করের মারফত রায়ট পুলিশের চালকদের জানানো হলো।

২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, হঠাৎ ৩০/৪০ জন ছাত্রের একটা মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ত্যাগ করে শাহবাগপুল হয়ে ফুলবাড়িয়া বাস ষ্ট্যান্ড এর দিকে দ্রুত যেতে থাকলো। এই মিছিলের পেছনে পেছনে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী রায়ট পুলিশের একটি লরি আসতে থাকলো।

বুঝা গেল এইবার সামনে থেকে ছাত্র হত্যা করা হবে না। হত্যা করা হবে মিছিলের পেছন থেকে। যারা এই পরিকল্পনা অবহিত তারা যতটা সম্ভব মিছিলের সামনে থাকতে লাগলো। মোটামুটি মিছিলের অনেকেই জানে পেছন থেকে মিছিলে আক্রমণ করা হবে। রায়ট পুলিশের গাড়ি থেকেই এই আক্রমণ করা হবে। তবে রায়ট পুলিশের গাড়ি থেকে গুলি করা হবে, না অন্য যেকোন ভাবে আক্রমণ করা হবে এটা কেউ জানতো না। তখন বিকেল পাঁচটা, ক্ষুদ্র ছাত্র মিছিলটি নিমতলী পার হয়ে ফুলবাড়িয়া বাসষ্ট্যান্ডে ঢুকার সঙ্গে সঙ্গেই রায়ট পুলিশ তাদের লরিটি বিদ্যুৎ গতিতে মিছিলের উপর তুলে দিল। মিছিলের পিছন দিকে থাকা সেলিম মুহূর্তের মধ্যে পুলিশের লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে গেল। বাকি সবাই রাস্তার দুই দিকে ছিটকে পড়ে প্রাণে বাঁচলেও দেলোয়ার সোজা দৌড়াতে লাগলো। প্রাণভয়ে দেলোয়ার দৌড়ায় আগে, দেলোয়ারের প্রাণ বধ করতে পেছনে দ্রুত ছুটছে রায়ট পুলিশের লরি।

মিনিট দু'য়েক-এর মধ্যেই দেলোয়ারের দেহ চাকায় পিষে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেয় পুলিশের লরি। দেলোয়ারের দেহ এমন ভাবে রাস্তার সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এটা যে দেলোয়ারের দেহ তা বুঝাতো দূরের কথা, এটা যে একটা মানুষের দেহ তাই বুঝা যাচ্ছে না। আর পেছনে পিচ ঢালা রাস্তার সাথে লেপ্টে মিশে আছে সেলিমের দেহ।

ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধু ভবনে সংবাদের জন্য অধির আগ্রহে উন্মুখ হয়ে বসে থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী, সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে রায়ট পুলিশের চাকায় পিষ্ট হয়ে সেলিম এবং দেলোয়ারের নিহত হওয়ার সংবাদটি পৌঁছলে মতিন নাইক্লেন আহোরী।

ছাত্রলীগের দুইজন নেতার নিহত হওয়ার সংবাদটি শুনে শেখ হাসিনা পুলকিত হয়ে আনন্দিত হয়ে বলে উঠলেন, মারহাবা।

তারপর গাড়ির ড্রাইভার জালালকে বললেন, জালাল গাড়ি আবারও বাড়ি ঘুরিয়ে নাও।

মটর সাইকেল আরোহী যুবক জোরে চাইলে নেত্রী বললেন, তোমরা এক কাজ করো, আগামীকাল সকালে ৩২নং সবাই আস। এখন সবাই চলে যাও।

পরদিন সকালে ৩২নং গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে মটর সাইকেল আরোহী সোনা সহযোগী ছেলে গিয়ে ড্রাইভার জালাল এবং পাহারাদের কাছে জেনে নিশ্চিত হলো নেত্রী এখানেই আছেন। কিন্তু পরে গিয়ে নেত্রীকে না পেয়ে অনুচি লোকজনের কাছে জানতে পারলো নেত্রী জালাল গাড়ী নিয়ে ঢাকার বাইরে অজ্ঞাত স্থানে গিয়েছেন অনেক আগে।

দুপুর ১টার দিকে ফিরে এসে নেত্রী খাওয়া দাওয়া করে সোজা চলে এলেন ধানমন্ডি ৩২নং বঙ্গবন্ধু ভবনে। ছাত্রলীগের বেশ কিছু নেতা বিকাল তিনটায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে এলে সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ছাত্রলীগ নেতা সেলিম ও দেলোয়ারকে পুলিশের গাড়ির চাকায় পিষ্ট করে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করার প্রতিবাদে সামরিক একনায়ক স্বৈরাচারী, এরশাদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করার কর্মসূচী চাইলে সভানেত্রী শেখ হাসিনা এই বলে ছাত্রনেতাদের সান্ত্বনা দেন যে, আমাদের মূল শত্রু জিয়াউর রহমান এবং তার দল বি, এন, পি। জিয়া তো শেষ। কেবল এখন বি, এন, পির কাছ থেকে মাত্র কিছু দিন হলো ক্ষমতা দখল করেছে। আমাদের এখন প্রধান কাজ বি, এন, পিকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া। এই মুহূর্তে আমরা জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে সরাসরি যাব না। আমাদের মূল শত্রু বি. এন. পি. এটা মনে রাখতে হবে। ছাত্রনেতারা সেলিম ও দেলোয়ারের হত্যার জন্য আবেগ আপ্লুত হলে শেখ হাসিনা বললেন, আবেগপ্রবণ হয়ে লাভ নেই। সময় হলেই এদের পরিবারকে পুষিয়ে দেওয়া হবে।

ছাত্রনেতারা কোন রকম কর্মসূচী ছাড়াই ভারা হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করলো।

সেনাদ্রোহী অসভ্য বাহিনী

৩রা মে ১৯৮৪-এর এক পড়ন্ত বিকেলে ধানমন্ডি ৩২নং বঙ্গবন্ধু ভবনে গল্প গুজব করছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ অনেক জন। গল্পে গল্পে ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রসঙ্গ উঠলো। প্রসঙ্গ উঠলো '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কথা।

জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পর্কে বললেন, এটা একটা সেনাবাহিনী হলো? এটা একটা বর্বর, নরপিশাচ, উচ্ছৃঙ্খল, লোভী, বেঈমান

কাহিনী। এই কাহিনীর আনুগত্য নেই, শৃংখলা নেই, মানবিকতা নেই, সততা নেই, নেই দেশপ্রেম। এটা একটা দেশদ্রোহী ক্ষমতা দখলের কাহিনী। তোমরা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কথা বল। আজ বিশ্বে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতো শত ভদ্র, নম্র, সভ্য, বিনয়ী এবং আনুগত্যশীল খুঁজে পাওয়া যাবে না। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মানবিকতা বোধের কোন তুলনাই চলে না। কি অসম্ভব সভ্য আর নম্র তারা!

পঁচিশে মার্চ রাতে তারা (পাকিস্তান আর্মি) এসে, এসে আব্বাকে (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব) সেলুট করলো, মাকে সেলুট করলো, আমাদের সেলুট করলো। সেলুট করে তারা বলল, স্যার আমরা এসেছি শুধু আপনাদের নিরাপত্তা দেবার জন্য। অন্য কোন কিছুর জন্য নয়। আপনারা যখন খুশি, যেখানে খুশি যেতে পারবেন। যে কেউ আপনার এখানে আসতে পারবে। আমরা শুধু আপনাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবো। আপনারা বাইরে গেলে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য আমরা আপনাদের সঙ্গে যাবো। কেউ আপনাদের এখানে এলে আমরা তাকে ভালভাবে তল্লাশি করে ভেতরে ঢুকতে দিব। এসবই করা হবে আপনাদের নিরাপত্তার জন্য। সত্যিই পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যা করেছে তা সম্পূর্ণ আমাদের নিরাপত্তার জন্যই করেছে। ২৬শে মার্চ দুপুরে আব্বাকে (শেখ মুজিব) যখন পাকিস্তানী আর্মিরা নিয়ে যায়, তখন জেনারেল টিক্কা খান নিজে এসে আব্বাকে ও মাকে সেলুট দিলে, আমাদের সাথে দাঁড়িয়ে বিনয়ের সাথে আব্বাকে (শেখ মুজিবকে) বলে, স্যার আপনাকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য নিয়ে যেতে বলেছেন। আমি আপনাকে নিতে এসেছি। আপনাকে নেবার জন্য বিশেষ বিমান তৈরি (স্পেশিয়াল ফ্লাইট রেডি)। আপনি তৈরি হয়ে নেন এবং আপনি ইচ্ছে করলে আমার (বেগম মুজিব) সহ যে কাউকে সঙ্গে নিতে পারেন। আব্বা খাঁ'র সঙ্গে আলোচনা করে একাই গেলেন। পাকিস্তান আর্মি যতদিন ডিউটি করেছে এসেই প্রথমেই সেলুট দিয়েছে।

শুধু তাই নয়, আমার দাদীর যখন অসুখ হয়েছিল পাকিস্তানীরা হেলিকপ্টারে করে টুঙ্গিপাড়া থেকে দাদীকে ঢাকা এনে পি. জি হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েছে। জয় (শেখ হাসিনার ছেলে) তখন পেটে, আমাকে প্রতি সপ্তাহে সি. এম. এইচ (সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল) নিয়ে চেক আপ করাতো। জয় হওয়ার একমাস আগে আমাকে সি. এম. এইচ-এ ভর্তি করিয়েছে। '৭১ সালে জয় জন্ম হওয়ার পর পাকিস্তান আর্মিরা খুশিতে মিষ্টি বাটোয়ারা করেছে। এবং জয় হওয়ার সমস্ত খরচ পাকিস্তানীরাই বহন করেছে। আমরা যেখানে খুশি যেতাম। পাকিস্তানীরা শুধু জীপ করে আমাদের সাথে যেতো। নিরাপত্তার জন্য পাহারা দিত।

আর বাংলাদেশের আর্মিরা জানোয়ারের দল, অমানুষের দল এই অমানুষ জানোয়ারেরা আমার বাবা-মা, ভাই সবাইকে মেরেছে—একথা যেন মনে রয়।

মসজিদ সরিয়ে ফেলুন

১৯৮৫ সালের শুরু থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আবার ছাত্র আন্দোলনের জন্য নতুন করে তাগিদ দিতে থাকলেন। বহু চাপাচাপি, ধমক ধামকি এবং তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও যখন আন্দোলনের কিছুই সৃষ্টি হলো না তখন তিনি দেশের যে মাসের মাঝামাঝি তার জন্মস্থান এবং পিতার বাড়ি টুঙ্গিপাড়ায় চলে গেলেন। এবং বেশ কিছুদিন টুঙ্গিপাড়ায় থাকলেন। এরই মধ্যে একদিন শেখ বাড়ি (শেখ হাসিনার নিজের বাড়িতে) কিছু মুরুব্বীসহ টুঙ্গিপাড়া গ্রামের ২০/৩০ জন মুরুব্বী এসে শেখ হাসিনার বাড়ির একটি নারিকেল গাছ যাহা শেখ বাড়ির জন্য শরীফের জায়গায় নির্মিত মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে জানিয়ে সেই নারিকেল গাছটি কেটে ফেলার প্রস্তাব করলে, শেখ হাসিনা সরাসরি বলে দেন আমার নারিকেল গাছ কাটা হবে না। দরকার হলে মসজিদ সরিয়ে ফেলেন। তখন সকল মুরুব্বী অত্যন্ত দুঃখের সাথে মসজিদ সরানো নিষেধ আছে বলে মসজিদের দেওয়াল ও ছাদ ঘেঁষে থাকা শেখ হাসিনার জায়গায় অবস্থিত নারিকেল গাছটি কেটে ফেলার জন্য বার বার অনুরোধ করতে থাকে। তখন শেখ হাসিনা বলেন, এই মসজিদ বন্ধ করে দেন। আমি আরো বড় মসজিদ বানিয়ে দেব।

মুরুব্বীরা বলেন, একটু বাতাস হলেই নারিকেল গাছটি মসজিদের গায়ে এবং ছাদে লাগতে থাকে। এইভাবে চললে মসজিদের ছাদ এবং দেওয়াল অচিরেই ভেঙ্গে যাবে।

শেখ হাসিনা বলেন, ভেঙ্গে যায় যাক, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আপনারা লক্ষ বছর কান্নাকাটি করলেও নারিকেল গাছ কাটবো না।

'৮৬ নির্বাচন

১৯৮৬ সালের ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ছাত্রলীগ নেতা মোমিন ও নেজোয়ার নিহত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রাণপণ চেষ্টা করেও আর ছাত্র আন্দোলন করতে পারলেন না। ইত্যবসরে সামরিক জান্তার জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ পাকাপোক্তভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে নিজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। অপরদিকে এরই মধ্য দিয়ে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বি. এন. পি. উল্লেখযোগ্য একক রাজনৈতিক শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলো।

এরশাদ তার ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক করতেই ১৯৮৬তে সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা ও প্রস্তাব দেন। এরশাদের প্রস্তাবিত সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, না করার বিষয় নিয়ে দেশের রাজনৈতিক মহলে ও নেতাদের মধ্যে ব্যাপক আলাপ-আলোচনা শুরু হলে বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বি. এন. পির পক্ষ থেকে এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ হটাও আন্দোলন করার প্রস্তাব দেয়।

তখন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে এরশাদের অন্যতম ব্যবসায়ী এম. আই. চৌধুরী (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী)র এরশাদের বাসায় তৎকালীন ডি. জি. ডি-এফ-আই (ডাইরেক্টর জেনারেল অব ডিফেন্স ফোর্স ইন্টেলিজেন্স) ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের সাথে গোপন বৈঠক হয়। ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান জেনারেল এরশাদের পক্ষ থেকে ব্যক্তিগতভাবে শেখ হাসিনাকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অনুরোধ করেন এবং নির্বাচনী সকল ব্যয়ভার বহন করার প্রতিশ্রুতি দিলে শেখ হাসিনা আন্দোলনের অংশ হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করার পক্ষে মত দেন। এই পরিস্থিতিতে দেশের বামপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড ফরহাদ-এর প্রচেষ্টায় বেগম খালেদা জিয়া এবং শেখ হাসিনার মধ্যকার এই কৌশলে ঠিক করা হয় যে, নির্বাচনে শুধু মাত্র দুই নেত্রী (খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা) ছাড়া আর কেউ দাঁড়াবে না। অর্থাৎ বামপন্থী নেতৃবৃন্দ বেগম জিয়াকে এটা বুঝাতে সমর্থ হয় যে, বেগম জিয়া এবং শেখ হাসিনা দু'জনে দেড়'শ দেড়'শ তিন'শ আসনে নির্বাচনে দাঁড়াবেন, আর বাকি সবাই মিলে দুই নেত্রীকে তিনশ আসনে জিতিয়ে দিবেন। তাহলে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনের মাধ্যমে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করা যাবে। এবং তাতে করে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টি হবে না।

বেগম খালেদা জিয়া এরশাদকে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রয়াসে দুই নেত্রী ১৫০+১৫০ = ৩০০ আসনে নির্বাচনের প্রস্তাবে সায় দেন এবং শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া মুখোমুখি সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন। কিন্তু এরশাদের ব্যবসায়ী এম. আই. চৌধুরীর মাধ্যমে দুই নেত্রীর এই গোপন নির্বাচনী কৌশলের কথা এরশাদের কাছে পৌঁছে যায়। এবং এরশাদ রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি করে যে, এক ব্যক্তি পাঁচের অধিক বা বেশি আসনে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবে না।

ফলে দুই নেত্রীর দেড়'শ দেড়'শ তিন'শ আসনে নির্বাচন করার কৌশল ভন্ডুল হয়ে যায়। তখন বেগম জিয়া এরশাদের নির্বাচনী ফাঁদে পা না দিয়ে এরশাদ পতনের আন্দোলনের পুরোনো অবস্থানে চলে যান। এদিকে এরশাদের এম. আই. চৌধুরীর বাড়িতে ডি. জি. ডি. এফ. আই. ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসানের সাথে শেখ হাসিনার আবার বৈঠক হয়। এবং সেই বৈঠকে দাবি করা হয় নির্বাচনী ব্যয় হিসেবে আগে যে পরিমাণ অর্থ দেয়া হয়েছে, এখন তার তিনগুণ অর্থ দিতে হবে। ডি. জি. ডি. এফ. আই. ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান এক ঘণ্টার সময় চেয়ে চলে যান। এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধু ভবনে চলে আসেন। ঘণ্টা দুই পর সন্ধ্যার দিকে ব্যবসায়ী

এস. আই, চৌধুরী দুইটি মাইক্রোবাস সঙ্গে নিয়ে ৩২ নাম্বারে এসে হাজির। এস, আই, চৌধুরী আর শেখ হাসিনার মধ্যে এক-দেড় মিনিট কথা, তারপরই হুকুম হলো তাড়াতাড়ি মাইক্রোবাস থেকে বস্তাগুলি নামিয়ে আনো। সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোবাস থেকে মুখ সেলাই করা মোট সাতটি নতুন বস্তা নামিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের নিচতলায় লাইব্রেরী আর বেডরুমের মাঝে যে বাড়তি বাথরুম সেই বাথরুমে রাখা হলো।

এরপর শেখ হাসিনা আদেশ করলেন সাংবাদিক সম্মেলন-এর আয়োজন করতে এবং ডঃ কামাল হোসেনসহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধু ভবনে জরুরী ভিত্তিতে আসতে বলার জন্য।

ডঃ কামাল হোসেনসহ যে সকল নেতাদের টেলিফোনে পাওয়া গেল তাদের অনতিবিলম্বে বঙ্গবন্ধু ভবনে আসতে বলা হলো. বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে টেলিফোনের মাধ্যমে এবং লোক পাঠিয়ে জরুরী সাংবাদিক সম্মেলনের সংবাদ জানান হলো। সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাংবাদিকদের কিছু জানানো সম্ভব হলো না। শুধু বলা হলো জরুরী এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন। আসলে সঠিক কথা বলতে কি, সাংবাদিক সম্মেলনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ডঃ কামাল হোসেনসহ কোন নেতাই কিছুই জানেন না। মূল বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানেন মূলত চার ব্যক্তি (১) শেখ হাসিনা (২) ব্যবসায়ী এস, আই, চৌধুরী (৩) ডি, জি, ডি, এফ, আই ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুল হাসান এবং (৪) প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেনাবাহিনী প্রধান রাষ্ট্রপতি জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ।

অধিক রাত হওয়া সত্ত্বেও বহু সংখ্যক সাংবাদিক এসে উপস্থিত হলো ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধু ভবনে।

শেখ হাসিনা ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ নেতাদের এরশাদের নির্বাচনে যাওয়ার (অংশ গ্রহণ করার) সিদ্ধান্ত জানালেন। নেতারা বললেন, নির্বাচনে যাব ঠিক আছে, কিন্তু একদিন আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করি, তারপর সিদ্ধান্ত নেই।

শেখ হাসিনা বললেন, আমাদের সময় নেই, তাড়াতাড়ি করতে হবে। খালেদা জিয়া এবং তার দল বি, এন, পিকে বাদ রেখে নির্বাচনে যেতে হবে- কাজেই এটা নিয়ে এত আলোচনার দরকার নেই। বাইরে সাংবাদিকরা বসে আছে, এখনই নির্বাচনে যাওয়ার ঘোষণা দিতে হবে। বলেই সরাসরি সাংবাদিকদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন এবং নির্বাচনে যাওয়ার (অংশগ্রহণ করার) ঘোষণা দিলেন। তার পরদিন ছয় ফুট লম্বা তিন ফুট চওড়া পাঁচ তলা (পাঁচ তাক) একটি স্টিলের আলমারি আনা হলো এবং যে বস্তাগুলো সেলাই করা

বস্তাগুলো ঘরের সেখানে রাখা হলো। তারপর একে একে বস্তাগুলো খোলা হতে লাগলো। আর বস্তার ভিতরে থাকা পাঁচ শত টাকার নতুন বান্ডিলগুলো ঐ রুমের ওয়ার ড্রপ (আলমারী)-এ সাজিয়ে রাখা হলো। সব টাকা ওয়ার ড্রপে না ধরায় বাকি টাকা অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হলো।

শুরু হলো ১৯৮৬-এর সংসদ নির্বাচনী প্রক্রিয়া। দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হলো। এক ভাগ শেখ হাসিনা নেতৃত্বে জেঃ এরশাদের পাতানো নির্বাচনে জড়িয়ে পড়লো। আরেক ভাগ বেগম খালেদা জিয়ার আহ্বানে এরশাদ পতন ও পাতানো নির্বাচন বর্জন ও ঠেকানোর চেষ্টায় রত হলো। শেখ হাসিনা সর্বশক্তি দিয়ে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়ার জোরালো আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, এই নির্বাচনের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় নিতে হবে এবং সামরিক শাসক এরশাদকে বিদায় করতে হবে।

শেখ হাসিনার আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জনগণ এগিয়ে না এলেও আওয়ামী লীগের কর্মী এবং সমর্থকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলো।

আওয়ামী লীগের কর্মী এবং সমর্থকরা সারা দেশেই একটা নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করে তুললো। ঐ সময়ই ফিলিপাইনে সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস-এর বিরুদ্ধে নিহত জননেতা মিঃ একুইনোর বিধবা স্ত্রী মিসেস কোরাজন একুইনো প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। সারা বিশ্ব ফিলিপাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে বাংলাদেশের সামরিক শাসকের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ফিলিপাইনের মতোই প্রায় দৃষ্টি আকর্ষণ করে আছে।

শেরে-এ বাংলা নগরে মানিক মিয়া এভিনিউ-এ আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী জনসভা। বিশাল নির্বাচনী জনসভা। এর মাত্র দুই দিন আগে ফিলিপাইনে নির্বাচন হয়ে গেছে। সামরিক একনায়ক জেনারেল মার্কোস নির্বাচনের ফলাফল পাল্টে দিয়ে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছে। অপর দিকে মিসেস কোরাজন একুইনো ঐ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করেছেন। মিসেস কোরাজন একুইনোর পক্ষে ফিলিপাইনের জনগণ রাস্তায় নেমেছে। আর সেই জনগণকে দমিয়ে দেওয়ার জন্য একনায়ক মার্কোস-এর পক্ষে সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। একদিকে জনগণের বিক্ষোভ অপরদিকে সামরিক বাহিনীর ট্যাংক। ফিলিপাইনের অবস্থা গত দুই দিন থেকে খুবই উত্তপ্ত। জনগণও বিক্ষোভে শামিল হওয়ার জন্য জেনারেল মার্কোসের কার্ফু ভেঙে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে। আর সেই জনগণের দিকে তাক করে ট্যাংক নিয়ে বসে আছে সেনাবাহিনী। ফিলিপাইনের দিকে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি থাকলেও গরীব বাংলাদেশের জনগণের দৃষ্টি তার চাইতে অনেক বেশি গভীর।

ফিলিপাইনের মতো বাংলাদেশেও প্রায় একই ঘটনা, একই অবস্থা। জনগণ বনাম সামরিক বাহিনী। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি বনাম সামরিক একনায়ক।

বাংলাদেশের জনগণ সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে ফিলিপাইনের শেষ পরিণতির দিকে। ফিলিপাইনের উত্তাপ বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে লাগছে। এমনি মুহূর্তে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের শেষ নির্বাচনী বিশাল জনসভা চলছে। হঠাৎ মঞ্চের নেতার বক্তৃতা বন্ধ করে মাইকে ঘোষণা করা হলো ফিলিপাইনের একনায়ক জেনারেল মার্কোস দেশ (ফিলিপাইন) থেকে পালিয়ে গিয়েছে। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ গতিতে জনতা উল্লাসে ফেটে পড়লো। মনে হলো যেন বাংলাদেশ থেকে জেনারেল এরশাদ পালিয়ে গেছে এবং শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেছেন। মঞ্চের নেতারা একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলেন।

এ যেন পথের দিশা পাওয়া গেল। বাংলাদেশেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে। দুই দিন পর বাংলাদেশে নির্বাচন হলো। জেনারেল এরশাদ জেনারেল মার্কোসের ন্যায় মিডিয়া ক্যু করে জনগণকে দাবিয়ে দিয়ে নিজের দল জাতীয় পার্টিকে বিজয়ী ঘোষণা করলো। অপর দিকে শেখ হাসিনা ঐ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে ফিলিপাইনের মিসেস কোরাজন একুইনোর মতো নিজেকে বিজয়ী ঘোষণা করলেন। জেনারেল এরশাদ পার্লামেন্ট অধিবেশন ডাকলো শেখ হাসিনাও পাল্টা পার্লামেন্ট অধিবেশন ডাকলেন। জেনারেল এরশাদের পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু হলো পার্লামেন্ট হাউজে। শেখ হাসিনার পার্লামেন্ট অধিবেশন শুরু হলো পার্লামেন্টের সিঁড়িতে। এইভাবে কয়েক দিন চলতে লাগলো। একদিন সন্ধ্যার পর জনশক্তির ব্যবসায়ী এস. আই. চৌধুরী ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে তিনটি মাইক্রোবাস নিয়ে এলেন। আগে থেকে অপেক্ষায় থাকা বঙ্গবন্ধু কন্যা নেত্রী শেখ হাসিনা দৌড়ে এলেন। এবং এস. আই. চৌধুরীকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরীতে বসিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে এসে মাইক্রোবাস থেকে দ্রুত তাদের বস্তা গুলো আগের জায়গায় নামিয়ে রাখতে বললেন। তড়িঘড়ি বস্তাগুলো নামিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা হলো। এবার বস্তা হলো তেরটি। নেত্রীকে বস্তা নামানো শেষ হয়েছে জানানো হলো। নেত্রী মাইক্রোবাসের সাথে আসা বঙ্গবন্ধু ভবনের বাইরে থাকা সাদা পোশাকের অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের চা নাস্তার কথা বললে এস. আই. চৌধুরী আপত্তি করে এখনই চলে যেতে হবে বলে তখনই বিদায় নিলেন। নেত্রী তাকে মাইক্রোবাসে তুলে দিয়ে ফিরে এলেন।

অনুমান করা গেল নির্বাচনে যাওয়ার আগে নয় বস্তায় দশ কোটি টাকা ছিল। আর এখন তের বস্তায় পনর কোটি টাকা। বাংলাদেশের জনগণের আশা ছিল,

আকাঙ্ক্ষা ছিল জননেত্রী শেখ হাসিনা ফিলিপাইনের বিরোধী কোরাজন একুইনোর মতো আপোসহীন থাকবেন, জনগণকে রাস্তায় বেরিয়ে আসার আহ্বান জানাবেন। জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে আসবে, সামরিক একনায়ক এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে। এরশাদ জনগণ-এর দিকে সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক নামাবে। জনতার প্রতিরোধের মুখে সেনাবাহিনী এবং ট্যাঙ্ক অকার্যকর হবে, সামরিক স্বৈরাচার এরশাদ দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। কিন্তু না, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা জনতার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা জলাঞ্জলী দিয়ে নীরবে নিঃশব্দে চুপিসারে স্বৈরাচারী জেনারেল এরশাদের পার্লামেন্টে যোগ দিলেন এবং এরশাদের পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেত্রী হলেন। দেশ থেকে সামরিক শাসন এবং সমর নায়ক স্বৈরাচারী এরশাদ তো গেলই না বরং '৮৬-এর নির্বাচনের পাতানো খেলায় সামরিক একনায়ক জেনারেল এরশাদ পূর্বের চাইতে আরো শক্তিশালী রূপে জগদ্দল পাথরের ন্যায় জনগণের ঘাড়ে চেপে বসলো।

এত বড় মাঠ

এরশাদের পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার নিশান পেট্রোল জীপের এক পাশে জাতীয় পতাকা অন্য পাশে দলীয় (আওয়ামী লীগ) পতাকা লাগিয়ে তার (শেখ হাসিনার) নিজ জন্মভূমি এবং পিত্রালয় টুঙ্গিপাড়ায় এলেন। পরদিন সকালে সেখা গ্রামের এক জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষকরা তাঁদের স্কুল পরিদর্শনের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এক বিকেলে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ঐ স্কুল পরিদর্শনে যান। গ্রামের পথ, মাটির পথ। সেই পথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যাচ্ছে। মাইল খানেক যাওয়ার পর দেখা গেল স্কুল। একটি মাঠ তার তিন দিকে লম্বা তিনটি বড় টিনের ঘর। তিনটি ঘরের দু'টিই অর্ধেকের বেশি ভেঙে পড়ে আছে। একটি ভাল আছে। এই ভাল ঘরটি বেশি দিন হয়নি তৈরি হয়েছে। আর ভাঙা দু'টি ঘর জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। কেউ সেই দেখার তা বোঝাই যাচ্ছে। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে এবং শোনা যাচ্ছে স্কুলের মাঠে পাঁচ সাত'শ শিশু, কিশোর এবং বালক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং স্লোগান দিচ্ছে, জয় শেখ হাসিনা। জয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বলতে গেলে এদের কারো গায়েই জামা নেই। গায়ে দায়ে কেউই কেউ আছে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র। অর্থাৎ গায়ের জামা তো নেই-ই, পরনের প্যান্টও নেই। সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়েই লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। আর উঁচু কণ্ঠে স্লোগান দিচ্ছে, জয় শেখ হাসিনা, জয় জাতির পিতা শেখ মুজিব।

ভেঙে পড়ে থাকা স্কুল ঘর। আর সেই স্কুল মাঠেই দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ সাত'শ বস্ত্রহীন শিশু, কিশোর আর বালকেরা দল। এই হচ্ছে শেখ হাসিনার ও

শেখ হাসিনার বিয়ের অনুষ্ঠানে যেতাম। শিক্ষাঙ্গন বিবর্ণ, গায়ে বস্ত্র নেই, এরা দিনে দিনে আরো বড় হলে আর যাবে কোথায়? ভেবে গা শিউরে উঠলো। হঠাৎ মনে হলো, সামনের মাঠে তো বঙ্গবন্ধু কন্যা এরশাদের বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আছেন। দেখি তিনি কি বলেন।

মাঠের এক কোণায় একটি জীর্ণ টেবিল, একটি চেয়ার আর একটি মাইক লাগানো আছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী ধীরে ধীরে এই টেবিলের সামনে এলেন, কিন্তু চেয়ারে বসলেন না। মহামূল্যবান মাইকে বক্তৃতা শুরু করলেন। না, তিনি তাদের বিধ্বস্ত শিক্ষাঙ্গনের কথা বললেন না, বললেন না বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা, বললেন না বাঁশখালীর জন্য সংগ্রামের কথা। অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা এসব তিনি কিছুই বললেন না। তিনি বললেন, এত বড় মাঠ! এত বড় মাঠের কথা শহরের ছেলেরা তো চিন্তাই করতে পারে না। মাঠ ভরে ঘাস লাগিয়ে দিবেন। অনেক ঘাস লাগাবেন।

নেত্রীর সকল কর্মীদের মধ্য থেকে একজন বললেন, সেখানে ঘাস লাগাবেন। ছেলেরা খেলতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেত্রী বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সেখানে ঘাস লাগাবেন। এই ছেলেরা খেলতে পারবে। অতঃপর নেত্রী ফিরে এলেন তার নিজ গাড়িতে।

সামরিক এক নায়ক জেনারেল এরশাদ একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। জননেত্রী শেখ হাসিনা তার (এরশাদের) সাজানো নির্বাচনে পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় নেত্রী। অপর দিকে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আপোষহীন মনোভাব নিয়ে তার সংগঠন বি. এন. পিকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে একক আন্দোলনের চেষ্টায় রত।

জনগণের কাছে ধীরে ধীরে বেগম খালেদা জিয়া আপোষহীন নেত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছেন এবং মাঝে মাঝে আন্দোলনের কর্মসূচী দেওয়াও আরম্ভ করেছেন। বেগম জিয়ার আন্দোলনের কর্মসূচীর সাথে তাল মিলিয়ে শেখ হাসিনাও কৌশলে কর্মসূচী দিয়ে যাচ্ছেন।

আন্দোলন আন্দোলন খেলা

স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদের সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে দেখে, বেগম খালেদা জিয়া একক আন্দোলন করলে কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না ভেবে, [illegible] সাইকেল আরোহী আন্দোলনের আন্তরিকতার বিষয়ে প্রশ্ন করলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দেন "আমি (শেখ হাসিনা) আছি ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) পিছনে পিছনে। ম্যাডাম (খালেদা জিয়া) যে কর্মসূচী দেবে, আমিও (শেখ হাসিনা) সেই কর্মসূচী দেব। তাতে মনে হয় আমি (শেখ হাসিনা)

ও আন্দোলনকে চাই। আন্দোলন সফল করে তোলার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলিষ্ঠ ভূমিকার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ কর্মীদের বলে দিবে তারা যেন আন্দোলন আন্দোলন খেলা করে কিন্তু আন্দোলন যেন না করে। অর্থাৎ আন্দোলনের সাথে থেকে আন্দোলনের পিঠে ছুরি মারতে হবে। ম্যাডামকে (খালেদা জিয়া) ব্যর্থ করে ঘরে বসিয়ে দিতে হবে, আর যাতে রাজনীতির নাম না নেয়। জনগণ এবং আওয়ামী লীগের মাঠ কর্মীরা এরশাদ পতনের আন্দোলনের জন্য এতই উদগ্রীব যে, আন্দোলন প্রশ্নে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তারা (আওয়ামী লীগ কর্মীরা) আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে থাকে। যখন আওয়ামী লীগের কর্মীদের কাছে জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্দোলন না করার গোপন নির্দেশ পৌঁছানো হলো, তখন আওয়ামী লীগ কর্মীরা সরাসরি শেখ হাসিনার মুখ থেকে সরাসরি এই নির্দেশ শুনতে চাইলো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পক্ষে সরাসরি এই নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হলো না।

ফলে আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে থাকলেন বেগম খালেদা জিয়া আর জীবন দিতে থাকলো নূর হোসেনসহ আওয়ামী লীগ কর্মীরা।

হাসিনার পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া

১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর ঢাকায় আওয়ামী যুবলীগ কর্মী নূর হোসেন বুকে "স্বৈরাচার নিপাত যাক, আর পিঠে গণতন্ত্র মুক্তি পাক" লিখে বিক্ষোভ মিছিল করার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হলে দেশী এবং বিদেশী বিশেষ করে বহির্বিশ্বের প্রচার মাধ্যমে তা ফলাও করে প্রচার করে।

ফলে সামরিক একনায়ক হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ খুবই অসন্তুষ্ট এবং রাগান্বিত হন। আওয়ামী লীগের কর্মীদের আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা থাকায় এরশাদ মনে করেন (ভুল বুঝেন) যে, শেখ হাসিনা তলে তলে কর্মীদের তার (এরশাদ) বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছেন। তিনি (এরশাদ) এই বলে গর্জন করেন যে, আমার খাবে আমার পরবে, আবার আমার সাথে গাদ্দারী। শেখ হাসিনা গাদ্দারী করছে, আমার সাথে বেঈমানি করছে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। আমিই (এরশাদ) শেখ হাসিনাকে বিরোধী দলীয় নেত্রী বানিয়ে মন্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছি, মন্ত্রীর চাইতে বেশি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। বেশ ভালভাবে থেকে শুরু করে সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি করছি। আর তলে তলে আমার (এরশাদ) সাথে গাদ্দারী বিশ্বাসঘাতকতা। আমি (এরশাদ) আর শেখ হাসিনাকে কোন ছাড় দেব না, বিরোধী দলের নেত্রীও রাখবো না। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ব্যবসায়ী এম, আর চৌধুরী এবং ডি, জি, ডি, এফ, আই মাহাবুবুর রহমানের মাধ্যমে এরশাদকে আন্দোলনে তার (শেখ হাসিনার) অনাগ্রহ, অনিচ্ছা,

এবং আন্দোলনের নামে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পিছন থেকে ছুরি মেরে আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়ার চেষ্টার বিষয়টি অনেক বুঝাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এরশাদ নাছোড়বান্দা। তাঁর এক কথা, আন্দোলনের নামে পিছন থেকে আন্দোলনকে ছুরি মারতে হবে না। আন্দোলনের বিরুদ্ধে আমাকে (এরশাদকে) প্রকাশ্যে সরাসরি সমর্থন দিতে হবে। নইলে আমি (এরশাদ) পার্লামেন্টও রাখব না, শেখ হাসিনাকেও বিরোধী দলীয় নেত্রী রাখবো না। বিরোধী দলীয় নেত্রী থাকতে হলে এবং মন্ত্রীর মর্যাদাসহ অন্যান্য সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা পেতে হলে আমাকে (এরশাদ) কোন প্রকার বাধাদান না করে সরাসরি ভাবে সমর্থন করতে হবে।

শেখ হাসিনা কৌশলগত কারণে প্রকাশ্যে সরাসরি স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে সমর্থন করতে অপারগতা প্রকাশ করলে অবশেষে এরশাদ ১৯৮৮ সালে মাত্র দুই বছর আগে গড়া তার (এরশাদের) নিজ সাজানো পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়। এবং নতুন করে বিরোধীদলবিহীন তার (এরশাদ) নীল নক্সার পার্লামেন্ট নির্বাচন দিয়ে জাসদের আ স ম রব (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী) কে পার্লামেন্টে বিরোধী দলের নেতা বানান।

এরশাদ পতন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার

জনতা স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয় এবং বেগম জিয়া ক্রমে ক্রমে জনতার কাছে আপোষহীন নেত্রী রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। অবস্থা বেগতিক দেখে শেখ হাসিনার বেগম খালেদা জিয়ার আন্দোলনের সাথে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হওয়া ছাড়া কোন গত্যান্তর থাকে না। আগে থেকেই আওয়ামী লীগের মাঠ কর্মীরা এরশাদ হটাও আন্দোলনে তাদের সক্রিয় ভূমিকা বজায় রেখেছে। এখন শেখ হাসিনা বাধ্য হয়ে আন্দোলনে অংশ নেয়ায় আন্দোলন আরো বেগবান হয়েছে।

জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং দেশনেত্রী খালেদা জিয়া দুই নেত্রীর আন্দোলন একসাথে মিলিত হলো। আন্দোলন আরো ফুঁসে উঠলো। দুর্বার গণ আন্দোলন চলতে থাকলো। স্বৈরাচারী সামরিক একনায়ক জেনারেল এরশাদ কার্ফু জারি করলো, সেনাবাহিনীকে জনগণের বিপক্ষে রাস্তায় নামালো। কিন্তু জনগণকে দমানো গেল না। জনগণ উপেক্ষাও দৃঢ় ঐক্য বদ্ধে জেনারেল এরশাদের কার্ফু ভাঙলো, সেনা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ শুরু করলো। সারা দেশে স্ফুলিঙ্গের মতো আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। ছাত্র যুবক আর জনতার আন্দোলনের মুখে বিশ্ব বেহায়া স্বৈরাচারী এরশাদের সকল কূটকৌশল আর শক্তি পরাস্ত হতে থাকলো।

জেনারেল এরশাদ ছাত্রনেতাদের ক্রয় করার জন্য শত কোটি টাকা খরচ করলো এবং জেলখানা থেকে দাগী অপরাধীদের ছাড়িয়ে এনে কোটি কোটি টাকা

সাথে অস্ত্র দিয়ে আন্দোলন দমানোর ব্যবস্থা করলো। এই দাগী অপরাধীরাই ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর পূর্ব দক্ষিণ কোণের দূর থেকে গুলি করে ডাঃ মিলনকে হত্যা করলো। ডাঃ মিলন নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র জনতার আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের রূপ নিল। আন্দোলন নতুন মোড় নিল। ঠিক যেমন ১৯৬৯-এ আসাদ হত্যার পর হয়েছিল। অনির্দিষ্ট কালের হরতাল, অনির্দিষ্ট কালের কার্ফুতে দেশের সমস্ত কিছু অচল। কার্ফিউ শুধু পিকেটিং মিছিল টিয়ার গ্যাস আর গুলি।

এরশাদ পতনে সেনাবাহিনীর ভূমিকা

সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারগণ সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নুরুদ্দিন খান (বর্তমানে শেখ হাসিনা সরকারের মন্ত্রী)কে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের একটি গোপন বৈঠক ডাকতে বাধ্য করলো এবং সেই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদকে আর সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত হয়। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নুরুদ্দিন খানকে বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দিলে তিনি (সেনাপ্রধান নুরুদ্দিন খান) এই দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করলে নবম ডিভিশনের (সাভার ক্যান্টনমেন্টের) জি, ও, সি মেজর জেনারেল আব্দুস সালাম (বর্তমানে আওয়ামী লীগের এম পি, এবং ফিনেন্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান) বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নেন। এবং বৈঠক থেকে সোজা ঢাকা সেনাভবনে গিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের বৈঠকে তাকে (এরশাদকে) আর সমর্থন না করার সিদ্ধান্তের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দেন।

তখন স্বৈরাচারী হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সম্পূর্ণ ভেঙ্গে নিরুপায় হয়ে পড়ে এবং তারপরই পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি ব্যারিষ্টার মওদুদ আহমেদ পদত্যাগ করেন এবং সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ উপরাষ্ট্রপতি হন। তারপর রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের কাছে পদত্যাগ করলে উপরাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। এবং তাঁর নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের নির্বাচন দেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই প্রথম দেশের সবকয়টি রাজনৈতিক দল স্বাধীন, মুক্ত এবং স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ-এর নেতৃত্বে গঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনী প্রক্রিয়া দ্রুত এবং জোরদার ভাবে এগিয়ে চলছে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল প্রার্থী মনোনয়ন চূড়ান্ত

করেছে। দেশের জনগণও এই প্রথম মুক্ত স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে আপন ভোট আমি দিব যাকে খুশি তাকে দেয়ার দৃঢ় মনোভাব নিয়ে আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ সাল ভোট দেবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। সারা দেশে চলছে ব্যাপক নির্বাচনী প্রচারাভিযান। পোস্টার আর দেয়াল লিখনে ভরে গেছে সমস্ত জায়গা। দিবা-রাত্রি চলছে মিছিল মিটিং। আওয়ামী লীগ এবং বি, এন, পি মূলতঃ এই দুইটি দলের মধ্যে তীব্র নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। বি, এন, পি এবং আওয়ামী লীগ এই দুটি দলের কোথায় কে জেতে কে হারে বলা কঠিন। এরই মধ্যে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বললেন বি, এন, পি দশটির বেশি সিট পাবে না। অর্থাৎ বি, এন, পি তিনশ (৩০০) আসনের মধ্যে দশটি (১০) আসনে বিজয়ী হবে এবং দুইশত নব্বই টি (২৯০) আসনে পরাজিত হবে বলে শেখ হাসিনা বললেন।

স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, ঘরে-বাইরে, মাঠে-ঘাটে সর্বত্র নির্বাচনী আলোচনা আর প্রচারণা। এক কথায় নির্বাচনী প্রচারণা এখন তুঙ্গে। আজ ১০ই ফেব্রুয়ারী। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের একটি কক্ষে রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসেছে। আসন্ন ২৭শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচন। এই নির্বাচন উপলক্ষেই আজকের বৈঠক। এই বৈঠকের আলোচনায় মটর সাইকেল আরোহী যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পরাজিত হবে এবং জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তাহার দুইটি আসনেই পরাজিত হবেন।

বৈঠকে উপস্থিত রফিউল আলম চৌধুরী (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পি এস সেকান্দির চৌধুরী) ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, কিসে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না মানে কি? আওয়ামী লীগ তো ক্ষমতায় গেছেই আছে। ঐ যে, পাশের ঘরে বসে আছে হোম সেক্রেটারী, সংস্থাপন সচিব, পররাষ্ট্র সচিব। অন্য পাশের ঘরে বসে আছে পুলিশের আই জি। একটু আগে এসেছিল সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নূরউদ্দিন খান। তারপরও বলেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে না। শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবে না।

মটর সাইকেল আরোহী বলে সেক্রেটারীরা (সচিবগণ) যতই বসে থাকুক, পুলিশ প্রধান, সেনাপ্রধান যতই সালাম দিয়ে যাক ২৭শে ফেব্রুয়ারী নির্বাচনে জিতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

এই কথা বলার সাথে সাথে বৈঠকে উপস্থিত জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, তুমি এখনই বের হয়ে যাও। আর আসবে না।

বের হয়ে যেতে যেতে মটর সাইকেল আরোহী বলে নেত্রী, আপনি বের করে দিলে আমি বেরিয়ে যেতে বাধ্য তবে যা বললাম আর ক'দিন পরেই তা আপনিও বুঝবেন।

১৯৯১-এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুধু বাংলাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে নয়, উপ-মহাদেশের নির্বাচনী ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নর নারী নির্বিশেষে জনগণ স্বাধীন ভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলো। ভোট গণনায় দেখা গেল আওয়ামী লীগ পরাজিত হলো। এমনকি দুই আসনেই জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিপুল ভোটে [illegible] পরাজিত হলেন। বেগম খালেদা জিয়া এবং তার দল বি, এন, পি নির্বাচনে বিজয়ী হলেন। জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বললেন, ভোটে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে, আর সূক্ষ্ম কারচুপির মাধ্যমেই আমাকে পরাজিত করা হয়েছে। আমি এই ফলাফল মানি না এবং বেগম জিয়া সরকার গঠন করলে আমি এক মিনিটের জন্যও বেগম জিয়াকে সুস্থ থাকতে দেব না।

পদত্যাগ নাটক

হঠাৎ জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণা করলেন তিনি (শেখ হাসিনা) আওয়ামী লীগের সভানেত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। রাজনৈতিক সকল মহলে এই পদত্যাগের ঘটনা আলোড়ন সৃষ্টি করলো। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা তো হতবাক! হতবাক কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহীরা। কথা নেই, বার্তা নেই, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করলেন তিনি পদত্যাগ করেছেন। কিন্তু তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করলেন কার কাছে? কোথায় তার (শেখ হাসিনার) পদত্যাগ পত্র? দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কোন কেন্দ্রীয় নির্বাহীর কাছে সভানেত্রীর পদত্যাগ পত্র নেই। কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মিটিং-এ ও তিনি পদত্যাগ করলেন না। তাহলে তিনি পদত্যাগ করলেন কোথায় এবং কার কাছে? তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে সাংবাদিকদের কাছে ঘোষণাই বা করলেন কিভাবে? সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই পদত্যাগের বিষয় নিয়ে দলের ভেতরে ও বাহিরে চলছে জল্পনা কল্পনা। কেউ বলছেন না তিনি (শেখ হাসিনা) পদত্যাগ করেননি। কেউ বলছেন, না তিনি (শেখ হাসিনা) স্বয়ং পদত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার পদত্যাগ প্রত্যাহার করার দাবীতে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ কর্মীদের ব্যাপক মিছিল মিটিং এবং আমরণ অনশন করার নির্দেশ দেন। কিন্তু জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনার এই নির্দেশে যুবলীগ ছাত্রলীগের কর্মীরা তেমন সাড়া না দিলে এবং পত্রপত্রিকা পদত্যাগ নাটক নিয়ে হৈ চৈ শুরু করলে, দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা দলের সাধারণ সম্পাদিকা সাজেদা চৌধুরীকে (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রীসভার বন ও পরিবেশ মন্ত্রী) সভানেত্রীর পদত্যাগ পত্র ছিঁড়ে ফেলেছেন বলে ঘোষণা দেওয়ার জন্য করজোড়ে অনুরোধ করেন। এই অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সাজেদা চৌধুরী

মহাদেবী শেখ হাসিনা তার (সাজেদা চৌধুরী) কাছে পদত্যাগ পত্র দিলে তিনি তা ছিঁড়ে ফেলেছেন বলে ঘোষণা দেন। এবং পদত্যাগ নাটকের অবসান ঘটান।

ফটিক সাইকেল আরোহী পুনরায় ফিরে এলে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী সাজেদা চৌধুরীকে তার (শেখ হাসিনার) ব্যক্তিগত পরামর্শকের দায়িত্ব ও মর্যাদা পুনরায় ফিরিয়ে দেন। ফটিক সাইকেল আরোহী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে দল, সমাজ নির্যাতন সম্পর্কে এবং নতুন সরকার সম্পর্কে আর কোন কঠোর উক্তি না করে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পরামর্শ দেয়।

টাকার বিনিময়ে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী

রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের জন্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুল হোসেন (বর্তমানে আওয়ামী লীগের মনোনীত মোহাম্মদপুর এলাকার এম. পি. এবং মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি) কে তিরিশ (৩০) লক্ষ টাকার বিনিময়ে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেন। অন্যদিকে বি.এন.পি এবং তার দল জাতীয় পার্টির সমর্থন নিয়ে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হন। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হাজী মকবুলকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে দেখলেন তার (শেখ হাসিনার) এবং তার দল আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে; ঐতিহ্য নষ্ট হবে ইত্যাদি বুঝিয়ে সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে সর্বদলীয় বিরোধী দলীয় প্রার্থী করার পরামর্শ দিলে এক পর্যায়ে তিনি (শেখ হাসিনা) রাজি হন। এবং বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে ডেকে এনে আলাপ-আলোচনা শেষে, জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীকে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের আমির যুদ্ধ অপরাধী '৭১-এর ঘাতক অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে দেখা করে দোয়া নিয়ে আসার জন্য বলেন।

এদিকে হাজী মকবুল হোসেনকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করার জন্য বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিলেও হাজী মকবুল প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে গড়িমসি শুরু করে। এক পর্যায়ে হাজী মকবুল হোসেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে দেওয়া তার তিরিশ লক্ষ টাকা ফেরত না পেলে রাষ্ট্রপতি প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে অস্বীকৃতি জানায়।

তখন জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে লোক দিয়ে হাজী মকবুল হোসেনকে ডেকে (প্রায় ধরে এনে) এনে ধমকে শাসিয়ে জিজ্ঞেস করেন তার (মকবুল) কতো লোকের পক্ষে

আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী হওয়া সাজে কি না? তখন বলেন, আমি (শেখ হাসিনা) আপনার মতো লোককে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করে দিয়ে সম্মানের ও মর্যাদার অধিকারী করেছি। এটা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তাছাড়া নির্বাচনে তো জিতবেনই না। রাষ্ট্রপতি তো হবেনই না। এখন সম্মানের সাথে চুপচাপ বসে থাকুন।

প্রার্থী মকবুল আমতা আমতা করতে থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, আপনি যা করেছেন, যা দিয়েছেন ভবিষ্যতে আমি তা মনে রাখবো এবং পুষিয়ে দিব। এই নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করে আমাকে ক্ষেপাবেন না। নিজেকে পদত্যাগ করে আমার প্রতি আনুগত্য দেখান। অতঃপর আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী মকবুল হোসেন ভবিষ্যতের আশায় প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

জাহানারা ইমাম ও শেখ হাসিনা

বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেত্রী। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার মাঝে সহযোগিতা সম্প্রীতি দূরের কথা বরং বিদ্বেষ এবং হিংসা আগের চেয়ে আরো তীব্র হলো।

এই সুযোগে স্বাধীনতা বিরোধী মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী তাদের নেপথ্যের মূল নেতা যুদ্ধ অপরাধী ঘাতক গোলাম আযমকে জামায়াতে ইসলামীর আমির (প্রধান) বানায়। এর প্রতিবাদে এবং যুদ্ধ অপরাধী ঘাতক গোলাম আযমসহ সকল যুদ্ধ অপরাধীর বিচারের দাবীতে ১৯৯২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি নামে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলেন এবং আন্দোলন শুরু করেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা এই নতুন সংগঠনের আন্দোলন কর্মসূচীতে জনগণ ব্যাপক সাড়া দিলো। নতুন প্রজন্ম শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্ব ও কর্মসূচীতে ব্যাপক উৎসাহ ও আস্থা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি (শেখ হাসিনা) কেবলই বলতে থাকেন জাহানারা ইমাম নতুন দোকান খুলেছে। নতুন ব্যবসা ধরেছে, নেত্রী হতে চায়, জননেত্রী হতে চায়। [illegible] জায়গা পায় না, মুক্তিযুদ্ধের নাম দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে।

মটর সাইকেল আরোহী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলে, নেত্রী একি বলেছেন আপনি? সমগ্র জাতি জানে জাহানারা ইমাম শহীদ জননী। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে তাঁর (জাহানারা ইমাম) ছেলে রুমি শহীদ হয়েছে। তিনি শহীদ জননী। আর আপনি একি বলছেন?

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা উত্তেজিত হয়ে বলেন, রাখ তোমার শহীদ জননী! ও কিসের শহীদ জননী! ওর ছেলে রুমি লুটপাট করতে যেয়ে নিজেদের গুলিতেই মারা গেছে। ওর স্বামী '৭১ সনের যুদ্ধের সময় আর্মিদের সাপ্লাই দিতো।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, একি বলছেন নেত্রী। এসব কথা জনগণকে বললে হিতে বিপরীত হবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, এই জন্যই তো সবসময় চুপ করে আছি। এবং তোমাদের বলে রাখছি, তোমরা একথা বাইরে বলবে। ওরা (জাহানারা ইমাম) ধানমন্ডি বত্রিশের রাস্তায় ঢুকতেই ডান দিকের কোণায় প্রথম ২য় তলা বাড়িতে থাকতো। আমাদের বাড়ির (ধানমন্ডি বত্রিশের বঙ্গবন্ধু ভবনের) পূর্ব দিকের প্রথম বাড়িটায় থাকতো। জাহানারা ইমামদেরও পাকিস্তানী আর্মিরা পাহারা দিয়ে রাখতো। জাহানারা ইমামের জামাই (স্বামী) পাকিস্তানী আর্মিদের সাপ্লাই করতো। ঐ সময় প্রচুর টাকা পয়সা কামিয়েছে এরা। আর এখন এসেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে। আসলে এ (জাহানারা ইমাম) এসেছে আমার নেতৃত্ব দখল করতে। আমি নির্বাচনে হেরেছি এই সুযোগে তলে তলে খালেদা জিয়ার সাথে লাইন করে জননেত্রী হওয়ার পরিকল্পনায় আছে জাহানারা ইমাম। আর তাই গোলাম আযমের বিচার, যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার, মুক্তি যুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ইত্যাদি নানা কথার আড়ালে নেত্রী হওয়ার খায়েশে আছে। তোমরা এর থেকে সাবধান থাকবে এবং আমাদের সকল কর্মীদের সাবধান রাখবে। কেউ যেন জাহানারা ইমামের খপ্পরে না পড়ে।

মটর সাইকেল আরোহীর প্রশ্ন, নেত্রী (শেখ হাসিনা) আপনি কি জাহানারা ইমামের সাথে, ঘাদাল নির্মূল কমিটির কর্মসূচীতে যাবেন না?

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জবাব ছিল, যে আমি যাই বা না যাই তোমরা যাবে না। আর আওয়ামী লীগের কোন কর্মীকে যেতে দেবে না। বুঝ না, আমার তো ইচ্ছে না থাকলেও অনেক জায়গায় যেতে হয়। জাহানারা ইমামের মুক্তিযুদ্ধের নামে দেওয়া কর্মসূচীতে হয়তো আমি (শেখ হাসিনা) কৌশলগত কারণে যাব। কিন্তু তোমরা যাবে না।

গোলাম আযম ও শেখ হাসিনা বৈঠক

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটির আহবায়িকা হিসেবে ঘাতক গোলাম আযমসহ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গণআদালত গঠন করেন।

১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের সভাপতিত্বে গণ-আদালত ঘাতক যুদ্ধ অপরাধী গোলাম আযমকে ১০টি অভিযোগে ফাঁসির রায় দেয়। গণ-আদালতের দেওয়া গোলাম আযমের ফাঁসির এই রায় কার্যকরী করার জন্য শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সরকারের কাছে আহবান জানালে এবং গণ-আদালতের এই রায় কার্যকর করার দাবীতে আন্দোলনের কর্মসূচি দিলে যুদ্ধাপরাধী ঘাতক গোলাম আযম শেখ সেলিম উদ্দিন (শেখ সেলিম উদ্দিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একমাত্র আপন ভাই শেখ নাসেরের বড় ছেলে শেখ হাসিনার আপন চাচাতো ভাই। বর্তমানে বাগের হাটের মোল্লার হাট ও ফকিরের হাট নির্বাচনী এলাকায় আওয়ামী লীগের এমপি) এর ইস্কাটন রোডের বাসায় বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে গোপন বৈঠকে বসেন। এই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হয় ঘাতক গোলাম আযম ও তার দল জামাতে ইসলামী (জামাত) আর বি, এন, পি,র পেছনে ঘুরঘুরি না করে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে সর্বতোভাবে সমর্থন ও সাহায্য সহযোগীতা করবে এবং শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সাথে মিলে খালেদা জিয়া ও বি, এন, পি সরকার পতনের আন্দোলন করবে। বিনিময়ে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধী ঘাতক গোলাম আযমের ফাঁসি কার্যকর করার দাবীতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গড়ে উঠা গণ-আন্দোলন এবং গণ আদালত নস্যাৎ ও বানচাল করার দায়িত্ব নেন। সেই থেকে ঘাতক গোলাম আযম আর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মাঝে গড়ে ওঠে গোপন নিবিড় ঐক্য ও সম্পর্ক।

১৯৯২-এর হিন্দু মুসলিম রায়ট

১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সার্কের চেয়ারম্যান। সার্কভুক্ত সাতটি রাষ্ট্রের শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায়। সাত জাতির শীর্ষ সম্মেলনের নিরাপদ স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। সার্কের চেয়ারপার্সন হিসেবে বেগম খালেদা জিয়া শীর্ষ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষে কোন কোন রাষ্ট্রের সরকার প্রধানগণ আসতেও শুরু করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এখনও ঢাকায় পৌঁছেননি। এরই মধ্যে ভারতে বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা হিন্দু-মুসলিম রায়ট শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলীয় নেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জরুরী ভিত্তিতে মতিন সাইকেল আরোহীকে ডাকলেন। মতিন

সাইকেল আরোহী ২৬নং মিন্টো রোডে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বাসায় উপস্থিত হলে বাবুর্চি কিরন দৌড়ে এসে খবর দেয় যে, আপা (শেখ হাসিনা) আপনাকে এখনই ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনে যেতে বলেছেন।

মটর সাইকেল আরোহী বত্রিশে পৌঁছলে সঙ্গে সঙ্গে জননেত্রী শেখ হাসিনা তাকে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরী রুমে ডেকে বলেন, সারা দেশে হিন্দু মুসলিম রায়ট (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা) লাগিয়ে দাও।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, এটা ঠিক হবে না।

নেত্রী বলেন, ঠিক-বেঠিক তোমার ভাবতে হবে না, রায়ট লাগাতে বলেছি তুমি লাগাও।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, আপনি এটা বলেন কি! আমি আরো কয়দিন পরিশ্রম করে পাড়ায় মহল্লায় যুবকদের সতর্ক করে রেখেছি যাতে করে হিন্দুদের উপর কোন প্রকার আক্রমণ না হয়। আর আপনি বলছেন রায়ট লাগিয়ে দিতে।

নেত্রী বলেন, হ্যাঁ আমি বলছি, তুমি রায়ট লাগাও।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, না নেত্রী, এটা নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

নেত্রী রাগান্বিত হয়ে বলেন, রাখ তোমার নীতি ফিতি। আমি যা বলছি তাই করো। আমি তোমার নেত্রী না তুমি আমার নেতা? আমাকে যদি নেত্রী মানো তাহলে আমি যা বলবো তাই করতে হবে।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, আপনিই তো আমাদের নেত্রী, আপনি যা বলবেন তাই তো শিরোধার্য। তবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করলে হিন্দুরা আর এদেশে থাকবে না। সবাই চলে যাবে। আর এই হিন্দুরা তো আমাদেরই ভোট। আমাদেরই রিজার্ভ ভোটার।

নেত্রী বলেন, রাখ, যাবে কোথায়? যাবার জায়গা নেই। তুমি রায়ট লাগাও।

মটর সাইকেল আরোহী বলে, হিন্দুরা ভারতে চলে গেলে ভারত থেকে যে মুসলমান আসবে সে মুসলমানেরা সবাই হবে খালেদা লীগ, মানে বি, এন, পি। এটা কি ভেবে দেখেছেন নেত্রী?

নেত্রী বলেন, আরে খোকা সার্ক সম্মেলন পণ্ড করতে হবে না? কয়েক দিন পরেই সার্ক সম্মেলন। খালেদা জিয়া সার্ক সম্মেলন উদ্বোধন করবে। ইন্ডিয়ার প্রাইমমিনিস্টার নরসীমা রাও এখনও আসে নাই। এই-ই সুযোগ, এখনই রায়ট লাগিয়ে দিলে সার্ক সম্মেলন পণ্ড হয়ে যাবে। তাছাড়া জাহানারা ইমাম যেভাবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে তাকেও তো সাইজ করতে হবে। জাহানারা ইমাম আমার নেতৃত্বের প্রতি হুমকি। যেভাবে সে নিজকে দিন মুক্তিযুদ্ধের ধারক-বাহক হয়ে যাচ্ছে তা ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে (জাহানারা ইমাম) আর ছাড় দেওয়া যায় না, এই সুযোগ। এই সুযোগেই জাহানারা ইমামকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এক ঢিলে দুই পাখি। সার্ক সম্মেলন পণ্ড, জাহানারা

ঈমান সহিত। তুমি দাঙ্গা লাগাও। হিন্দুদের উপর হামলা কর। এদেশের সকল হিন্দুরাই এখন আওয়ামী লীগের পিছনে চলে গেছে।

ঢাকায় রায়ট বা হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা লাগানোর দায়িত্ব দেওয়া হলো মটর সাইকেল আরোহীকে এবং সিদ্ধান্ত হল ২৯ মিন্টো রোড বিরোধী দলের নেত্রীর বাসভবন এবং ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের টেলিফোন ব্যবহার না করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার তাঁদের চাচা বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টের সম্পাদক শেখ হাফিজুর রহমানের বাসার টেলিফোন থেকে ঢাকার বাইরের জেলাগুলোতে হিন্দু-মুসলমান রায়ট লাগানোর নির্দেশ দেওয়া হবে। গোয়েন্দা বিভাগ সরকার যাতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক রায়ট লাগানোর পরিকল্পনা টের না পায় সেই জন্য এই সতর্কতা।

বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দ্রুত গতিতে হিন্দু মুসলমান রায়ট লাগানোর জন্য সারা ঢাকা শহরের সকল গুন্ডা মস্তান এবং সন্ত্রাসীর হাতে নগদ পাঁচ (৫) লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার জন্য প্রথমেই যাওয়া হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের পূর্ব পাশে অবস্থিত শিববাড়ী মন্দিরে। সেখানে দেখা গেল লুটেরা আর সুযোগ সন্ধানীদের জটলা, এই জটলাকারী লুটেরা সুযোগ সন্ধানীদের হাতে সংগোপনে একাধিক একশত (১০০) টাকার কড়কড়ে নোট গুঁজে দিয়েই বলা হলো, ভারতে মুসলমানদের খুন করা হচ্ছে, মুসলমান নারীদের ইজ্জত আর ধন সম্পদ লুট করে নেওয়া হচ্ছে। আর আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা চুপচাপ বসে বসে দেখছি, শুনছি। যান জঙ্গ করেন, ভাঙেন, লুট করে নেন।

সঙ্গে সঙ্গে সবাই সুযোগ সন্ধানী লুটেরা হই হই করে গিয়ে উপস্থিত শিববাড়ী মন্দিরে লুটপাট শুরু করে দিল। সেখান থেকে চলে আসা হলো ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। এখানেও উৎসুক সুযোগ সন্ধানী লুটেরার জটলা। এখানেও নগদ টাকা আর একই কায়দায় গুজব এবং ঢাকেশ্বরী মন্দির লুট। এরপর এল রামকৃষ্ণ মিশন। নগদ অর্থ আর গুজবে কাজ হলো। রামকৃষ্ণ মিশন এ লুটপাট শুরু হলো। তারপর যাওয়া হলো পুরান ঢাকার তাঁতি বাজার, শাঁখারিপট্টি, বাংলাবাজার, মালাকারটোলা, মিলব্যারাক, কসাই বাড়ী, নারিন্দা, টিকাটুলি, ইসলামপুর ইত্যাদি জায়গায়। কিন্তু না, এটা পুরোনো ঢাকা, এখানে সবাই পরিচিত। এখানে বক্তৃতা করা যাবে না। এখানে শুধু টাকার উপর দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। বিভিন্ন মস্তান সন্ত্রাসীও লোক-জনকে প্রচুর টাকা দেওয়া হলো। টাকায় কথা বললো। পুরাতন ঢাকায় হিন্দুদের দোকান বসত প্রতিষ্ঠান বাড়ীঘরে লুটপাট আরম্ভ হলো।

ঘন্টা তিন/চারেক পরে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরের বঙ্গবন্ধু ভবনে বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সারা ঢাকা শহরে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা রায়ট লাগিয়ে দেওয়ার সফল সংবাদ দিলে তিনি বেজায় খুশিতে আপ্লুত হয়ে

বলে উঠেন, এই তো কাজের ছেলে। তুমি না হলে কি হয়! তাই তো আমি তোমাকে খুঁজি। সামনের নির্বাচনে তোমাকে আমি মোকসেদপুর থেকে (গোপালগঞ্জের মোকসেদপুর কাশিয়ানী আসন) এম. পি বানাব।

সারা দেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হলো। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও ঢাকা এলেন না। সার্ক সম্মেলন পণ্ড হলো।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল, বৃহস্পতিবার, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমামের ডাকে গণআদালত কর্তৃক ঘোষিত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত গোলাম আযমের ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবীতে মানব-বন্ধন কর্মসূচিতে হিন্দু সম্প্রদায় যোগদান করলো না।

মাত্র অল্প দিন আগে ঘটে যাওয়া হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কারণে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ঘাতক গোলাম আযমের ফাঁসির দাবিতে মানব-বন্ধন কর্মসূচিতে হিন্দু সম্প্রদায় যোগদান করবে না, এটা প্রায় নিশ্চিত ছিল। আর সেই কারণেই ঘাতক দালাল নির্মূল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন কমিটির নেত্রী শহীদ জননী জাহানারা ইমাম আগে থেকেই আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ করে বন্ধু-বান্ধব, পরিবার পরিজন নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর-এর মানব বন্ধন কর্মসূচিতে যোগদান করার আহ্বান জানান, একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে শহীদ জননীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারিনি।

তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি আমাকে মর্মে মর্মে আঘাত করেছিল। এ জন্যই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে না জানিয়ে আমার একমাত্র শিশু কন্যা স্বর্ণলতা ও প্রিয়তমা স্ত্রী মনোকে সাথে নিয়ে মানব-বন্ধন কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করি। মানব-বন্ধন কর্মসূচির পরের দিন ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সাল শুক্রবার দৈনিক ভোরের কাগজ ও দৈনিক আজকের কাগজ-এর প্রথম পাতায় বড় করে আমাদের (আমি, আমার কন্যা এবং আমার স্ত্রী) ছবি ছেপে দিয়ে নিউজ করে।

ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজের এই ছবি দেখে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং টেলিফোনের মাধ্যমে আমাকে জরুরী তলব করেন।

সকাল দশটা নাগাদ ২৯ মিন্টো রোড-এ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার বাসভবনে পৌঁছে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতালার ড্রয়িংরুমে উঠে দেখি বঙ্গবন্ধু কন্যা গম্ভীর হয়ে সোফায় বসে আছেন। আমাকে দেখেই ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজ পত্রিকা দু'টি আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে উত্তেজিত হয়ে বললেন, এই তোমাদের বিশ্বাস! মুখে এক কথা আর কাজে আর এক।

পত্রিকা দু'টি হাতে নিলাম এবং এই প্রথম সপরিবারে পত্রিকায় নিজেদের ছবি দেখে বুঝে ফেললাম মহিলা অনেক খারাপ। আর এখানে অনেক কারসাজি আছে।

জাগরণের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত

[illegible]

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলতে লাগলেন, নেতৃত্বের প্রতি এই তোমাদের আস্থা, এই বিশ্বাস, এই আনুগত্য। যেখানে আমি নিজে জাহানারা ইমামের কর্মসূচীতে তোমাদের অংশ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছি এবং অন্য কর্মীরা যাতে অংশ গ্রহণ করতে না পারে তার দায়িত্ব তোমাকে দিয়েছি, সেখানে তুমি নিজেই কেন জাহানারার বড় ছবি নিয়ে হাজির হলে? একদিকে থাক, জাহানারা পছন্দ হয়, জাহানারা ইমামকে নিয়েই থাক; আমার দিকে আর এসো না।

আমি চুপ করে ভাবছি এখন কি বলা যায়, মাথায় একটা যুক্তি এলো। ধীরে ধীরে বললাম, নেত্রী আমি কিছু বলতে চাই।

তুমি আবার কি বলবে, তোমার আবার কি বলার আছে? বল।

নেত্রী, আমরা তো আসলে প্রেসের (কর্মীদের) ছবি তোলার জন্য এদিকেই যাচ্ছিলাম। কিন্তু আপনার নির্দেশ পালন করার জন্য একটু আগে আগেই বেরিয়ে ছিলাম। এবং প্রেসক্লাবে এসে অনেক তিনশ কর্মীকে কানে কানে জাহানারা ইমামের এই কর্মসূচীতে যোগ না দেওয়ার আপনার নির্দেশ জানিয়ে বিদায় করেছি। কিন্তু ফটো সাংবাদিকদের হাত থেকে বাঁচতে পারলাম না। তারা নাছোড়বান্দা, ফটো না তুলে ছাড়লোই না। আসলে এটা মানব-বন্ধন কর্মসূচির ফটো না। কৌশলে তোলা এই ছবি। মাত্র কয়েক দিন আগে বাবাটা মরে গেল। আওয়ামীলীগের সচিব, দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি আমি বড় ছবি নিয়ে জাহানারা ইমামের মানব-বন্ধন কর্মসূচীতে যাব? আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমরা শুধু আপনার নির্দেশ পালন করার জন্যই এই ঝুঁকি নিয়ে সেখানে গিয়েছি।

তোমরা তো এই রকমই কাজ করবা, হিতে বিপরীত করবা, তোমাদের দিয়ে যদি একটুও নিশ্চিন্ত থাকা যেত। শুধু এইবার ছেড়ে দিলাম, সবাই পত্রিকায় ছাপবে দেখবে শেখ হাসিনার নিজের লোকেরাই জাহানারা ইমামের কর্মসূচিতে। এখন যাও অন্যদের নিষেধ করো না যাওয়ার জন্য। তোমাদের নিয়ে আমার যত জ্বালা।

ফেরী আটকিয়ে রেখে যাত্রা

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার সরকারী বাসভবন ২৯ মিন্টো রোডে দুপুরের খাবার খেতে খেতে বললেন, বেশ কিছুদিন হলো টুঙ্গিপাড়া যাই না। চল আগামী কাল টুঙ্গিপাড়ায় যাই। আই ডব্লিউ টি এ (অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন) কে বিশেষ (স্পেশিয়াল) ফেরী রাখার নির্দেশ দিয়ে দাও।

নেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হলো কোন পথে যাওয়া হবে? আরিচা দিয়ে না মাওয়া দিয়ে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আরিচা দিয়ে অনেক ঘুরা হয়, অনেক দেরী হয়। আর মাওয়া দিয়ে পথ কম। সময়ও কম লাগে। মাওয়া দিয়েই যাব। মাওয়াতে তিন ঘাটে (অর্থাৎ ধলেশ্বরী নদীর দুই ঘাটে দুইটি এবং পদ্মা নদীর ঘাটে একটি) তিনটি স্পেশাল (বিশেষ) ফেরী রাখার নির্দেশ ভাই জহুরুল ডিএ কে দিয়ে দাও। স্পেশাল মানে হলো ভোর থেকে যতক্ষণ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফেরী পার না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরীগুলো জাতীয় পতাকা লাগিয়ে ঘাটের পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই স্পেশাল হয়ে থাকা ফেরীগুলোতে কোন যানবাহন এবং মানুষ পার করা হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা পার না হবেন। ফলে প্রচণ্ড যান জট এবং নদী পারাপারের মানুষ জট হবে। রাতের পর রাত এমন কি সারাদিন পর্যন্ত মানুষ এবং যানবাহন ফেরীতে নদী পারাপারের জন্য ঘাটে বসে থাকবে। জনসাধারণের এই সীমাহীন দুর্ভোগের কথা ভেবেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো নেত্রী, মাওয়া রোডে তিনটি ফেরী_ বিশেষ করে ধলেশ্বরী নদীর দুই ঘাটে দুইটি ফেরী স্পেশাল করে রেখে দিলে এই রাস্তায় প্রচণ্ড যানজট হবে। মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ হবে। তার চেয়ে আরিচা দিয়ে একটি ফেরী পার হতে হয়, আমরা আরিচা দিয়ে যাই।

উত্তরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, জনগণের অনেক দুর্ভোগ হবে তাই বলে কি আমি পথ কম ছেড়ে দিব? আমি মাওয়া দিয়েই যাব। তুমি ভাই জহুরুল ডিকে তিনটি ফেরী স্পেশাল করার নির্দেশ দাও। সে কথা সেই কাজ। টেলিফোনে ভাই জহুরুল ডি একে মাওয়া ঘাটে তিনটি ফেরী স্পেশাল করার নির্দেশ দেওয়া হলো। রাতে মিন্টো রোড থেকে বিদায় নিয়ে আসার সময় জননেত্রী শেখ হাসিনাকে বললাম, নেত্রী, আমার বাসা থেকে বুড়িগঙ্গা (মেয়র সেতু) ব্রীজ অর্থাৎ মাওয়া রোড তার পাঁচ মিনিটের রাস্তা আমি মিন্টো রোডের উল্টো রাস্তায় না এসে বুড়িগঙ্গা ব্রীজ থেকে আপনার সাথে একত্রীত হতে চাই।

নেত্রী বললেন, না উল্টো আসবে কেন, তুমি বুড়িগঙ্গা ব্রীজ থেকেই একত্রীত হয়ো। আর সাথে মরণাকে (মরণা মানে আমার স্ত্রী) নিয়ে নিও।

ঠিক আছে নেত্রী।

বলে বিদায় নিলাম।

পরদিন সকাল সাড়ে সাতটার আমাদের গাড়িতে করে স্ত্রী মরণা আর কন্যা অর্থিকাকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বুড়িগঙ্গা ব্রীজে পৌঁছে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার অপেক্ষায় রইলাম। জননেত্রী শেখ হাসিনার সকাল সাড়ে সাতটায় রওয়ানা হওয়ার কথা এবং অবশ্যই সাড়ে সাতটা আটটার মধ্যে বুড়িগঙ্গা ব্রীজে পৌঁছার কথা। সাড়ে আটটা পর্যন্ত বুড়িগঙ্গা ব্রীজে অপেক্ষা করে নেত্রী না আসায় ধলেশ্বর ফেরী ঘাটে অপেক্ষা

নানা চিন্তা করতে চলে এলাম। যশোহরের প্রথম ফেরী ঘাটে এসে দেখি জাতীয় পতাকা টাঙিয়ে একটি ফেরী-ঘাটের পাশে বঙ্গবন্ধু কন্যার জন্য অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে পুলিশ বাহিনীর একটি দল। আর ফেরীঘাটে অসংখ্য মানুষ জড় হয়ে গেছে। ঘাটের দু'টি ফেরীর মধ্যে একটি স্পেশাল হয়ে আছে। অবশিষ্টটি যানবাহন পার করে কুলাতে পারছে না। বেলা দশটা বেজে গেল। অথচ বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আসছেন না, তবে কি কর্মসূচীর কোন পরিবর্তন হলো? পুলিশ বাহিনীর অফিসারের কাছে জিজ্ঞেস করলাম। পুলিশ অফিসার বললো, আমরা তো বিরোধী দলীয় নেত্রী এই পথে যাবেন সেই ডিউটিতেই আছি।

এর পর আমি প্রথম ফেরী ঘাট পার হয়ে দ্বিতীয় ফেরী ঘাটে এসে দেখলাম এখানেও একটি ফেরী জাতীয় পতাকা টাঙিয়ে স্পেশাল হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অপেক্ষা করছে। আর পারাপারের অপেক্ষায় থাকা মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ শুরু হয়ে গেছে। যশোহরের দ্বিতীয় ফেরীও বেলা বারোটা নাগাদ পার হয়ে এলাম। এবার এলাম মাওয়া ফেরী ঘাটে। এখানেও একটি সুন্দর বড় ফেরী সবুজ লাল জাতীয় পতাকা টাঙিয়ে ঘাটের বাইরে অপেক্ষা করছে। পুলিশের একটি বিশেষ দলও এখানে অপেক্ষা করছে।

আমার স্ত্রী দিলারাকে বললাম, একটা ফেরী এলেই আমরা পদ্মা পার হয়ে ফরিদপুরের ঘাটে গিয়ে অপেক্ষা করবো। কারণ দেরী তো সয় না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আরিচা দিয়ে চলে যেতে পারেন

দিলারা বললো, তুমি তা হয় না। এখানে তিন তিনটা ফেরী অপেক্ষা করছে, জায়গায় জায়গায় পুলিশ বাহিনী অপেক্ষা করছে। নেত্রী আরিচা দিয়ে চলে গেলে অবশ্যই একটা সংকেত (ইনফরমেশন) দিতেন। যাতে করে তিনি (শেখ হাসিনার) অপেক্ষায় থাকা ফেরী এবং পুলিশ স্পেশাল ডিউটি থেকে নিয়মিত স্বাভাবিক ডিউটিতে ফিরে যেতো।

একটা বড় ফেরী এলে, আমি ফেরীতে গাড়ি তুললাম। পদ্মা পার হয়ে ফরিদপুরের ঘাটে এসে অপেক্ষা করতে থাকলাম। প্রায় ঘন্টাখানেক অপেক্ষায় থাকার পর দেখলাম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার জাতীয় পতাকাবাহি গাড়ি ফরিদপুরের দিক থেকে আসছে। অর্থাৎ জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আরিচা দিয়ে এসেছেন। আমাদের দেখে জননেত্রী গাড়ি থামালেন। আমরা তার (শেখ হাসিনার) গাড়ির বহরের সাথে যোগ দিলাম। চলতে থাকলাম। গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউসে বঙ্গবন্ধু কন্যার সাথে এসে থামলাম। জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বললাম, মাওয়া দিয়ে না এসে আরিচা দিয়ে এলেন?

তিনি বললেন, সে জানি বললো যাওয়া রাস্তার কার্পেটিং সুন্দর না, তাই আরিচা দিয়ে এলাম।

যাওয়া রাস্তায় তিন তিনটি ফেরী অপেক্ষা করছে, পুলিশ অপেক্ষা করছে, একটা ইনফরমেশন তো পাঠাবেন। নেত্রী তার সাথে আসা ব্যক্তিদের বললেন, তোমরা ইনফরমেশন দেও নাই? উত্তরে কেউ কোন কথা বললনা। আমি বললাম, হাজার হাজার মানুষ ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় মানিকগঞ্জ নদী পারাপারের অপেক্ষায় কষ্ট করছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, রাস্তায় বইসা থাকা এই তো? এ আর কি কষ্ট! আমাদের এ দেশের মানুষের (মানুষের) তো আর তেমন কাজকর্ম নেই। রাস্তায়ই না হয় ঘন্টার পর ঘন্টা পার করে দিল এতে কি আর এমন, তুমি এ নিয়ে বেশি চিন্তা কইরো না।

এরপর সন্ধ্যার দিকে শেখ হাসিনার পিত্রালয় এবং পিতার কবর টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছলাম।

শেখ হাসিনার গোলাম আযমের ২য় বৈঠক

৩০শে জানুয়ারী ১৯৯৪ ঢাকা সিটি করপোরেশন এর মেয়র ও কমিশনার নির্বাচন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ হানিফকে ঢাকার মেয়র পদে মনোনয়ন দিয়েছে।

জোর কদমে নির্বাচনী প্রচার প্রপাগান্ডা এগিয়ে চলছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা থেকে শুরু করে দলের সকল নেতা কর্মীই বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের কাছে মেয়র পদে তাদের প্রার্থী হানিফের জন্য ভোট চাইছে। অধিক রাত পর্যন্ত চলছে মিছিল এবং নির্বাচনী জনসভা। প্রতিটি পাড়া-মহল্লা অলি গলিতে চলছে মেয়র কমিশনার নির্বাচনের কাজ। আওয়ামী লীগ, বি, এন, পি, জাতীয় পার্টি, জামাত, কমিউনিস্ট পার্টিসহ সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত আছে। ঢাকায় টানটান নির্বাচনী উত্তেজনা। নির্বাচনের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। ২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যা বেলায় ধানমন্ডি ৩/এ রোডে বঙ্গবন্ধুর চাচাতো ভাই শেখ হাফিজুর রহমান টোকনের বাসায় (শেখ হাফিজুর রহমান টোকন বর্তমানে বঙ্গবন্ধু পরিষদের মহাসচিব) '৭১-এর যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দ্বিতীয় দফা বৈঠক হয়। এই বৈঠকে অধ্যাপক গোলাম আযম মেয়র নির্বাচনে বি, এন, পি প্রার্থীকে সমর্থন না দেওয়ার আশ্বাস দিলে শেখ হাসিনাও রাজনীতিতে জামাতকে আক্রমণ না করার আশ্বাস দেন।

নির্বাচন বাতিলের দাবী

আজ ৩০শে জানুয়ারী ১৯৯৪। ঢাকায় প্রথম বারের মতো সরাসরি জনগণের ভোটে মেয়র নির্বাচন চলছে। সকাল আটটা থেকে বিরতিহীনভাবে বিকাল চারটা পর্যন্ত একটানা ভোট গ্রহণ করা হবে। গত রাতেই জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন, আজ ৩০শে জানুয়ারী সকাল ছ'টায় ৩২ মিন্টো রোডে তার বাসায় হাজির হওয়ার জন্য। নির্দেশ মোতাবেক নেত্রীর বাসায় সকাল পৌনে ছ'টা নাগাদ হাজির হয়েছি। বঙ্গবন্ধু কন্যা ঘুম থেকে উঠলেন, একসাথে নাস্তা করলেন। তারপর সকাল পৌনে সাতটায় তার (শেখ হাসিনার) লাল রঙের নিশান পেট্রোল জীপ গাড়িতে করে আমাদের সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রথমে গেলেন শেরে-এ বাংলা নগরের রাজধানী হাই স্কুলে। তারপর গেলেন ধানমন্ডি গভঃ হাই স্কুলে, এরপর গেলেন ধানমন্ডি বত্রিশ তার (শেখ হাসিনার) পিতার বাড়ি বঙ্গবন্ধু ভবনে। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চা খেয়ে নিজের ভোটার স্লিপ নিয়ে চলে এলেন সিটি কলেজে ভোট দিতে। সিটি কলেজে ভোট দেওয়া শেষ করে, আরো কিছু ভোট কেন্দ্র ঘুরে বেলা এগারোটা নাগাদ ফিরে এলেন ৩২ মিন্টো রোডে তার সরকারী বাসভবনে। জননেত্রী শেখ হাসিনা মিন্টো রোডের বাসভবনে ফিরে আসার দশ পনের মিনিটের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক (বর্তমানে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য) নওগাঁর আব্দুল জলিল। সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে আব্দুল জলিল বললেন, নেত্রী আমাদের অবস্থা ভাল না। আমরা নির্বাচনে জিততে পারব না। আমাদের লোকদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। আপনাকে তো আগেই বলেছি আওয়ামী লীগ হলো রাজপথ আর আন্দোলনের দল, নির্বাচনের দল না। আপনি অযথা নির্বাচনে যান।

আব্দুল জলিলের কথা শেষ না হতেই এসে হাজির হলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক (বর্তমানে এলজিআরডি মন্ত্রী) জিল্লুর রহমান। জিল্লুর রহমানের পেছনে পেছনে এলেন প্রেসিডিয়াম সদস্য (বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রী) আব্দুর রাজ্জাকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া সকল নেতৃবৃন্দেরই এক কথা, নেত্রী নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হচ্ছে। আমাদের কর্মীদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দিচ্ছে। নির্বাচন বাতিলের দাবী করা হোক। আন্দোলন করা হোক ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক বললেন, নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে, আমাদের কর্মীদের বের করে দেওয়া হচ্ছে, এটা কি আপনারা কেউ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে দেখেছেন?

নেতারা কেউ কোন উত্তর দিলেন না, কোন কথাও কেউ বললেন না, সবাই চুপ।

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এটা / এভাবে ভোট কেন্দ্র দিয়ে দেখতে হয় নাকি? ওরা যেন ভোট কারচুপি করবেই। এ কথা না বললে একটু পরে করবে। কাজেই আমাদের নির্বাচন বাতিলের দাবী করতে হবে এবং এই ইস্যু নিয়ে বি.এন.পি সরকার পতন আন্দোলন করতে হবে। খালেদা জিয়া সরকারের পতন ঘটাতে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন তোলা হলো [illegible] নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্বয়ং প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ফোন করলেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে না পেয়ে, অন্য একজন নির্বাচন কমিশনারকে নির্বাচন বাতিল করার কথা বললে, নির্বাচন কমিশনার বিনয়ের সাথে বললেন, ম্যাডাম নির্বাচন বাতিল করা তো দূরের কথা, কোন ভোট কেন্দ্রের নির্বাচন স্থগিত করার মতোও কোন ইনফরমেশন এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি।

জবাবে জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমার কাছে ইনফরমেশন আছে, নির্বাচনে কারচুপি হচ্ছে। আমি বলছি— নির্বাচন বাতিল করুন।

নির্বাচন কমিশনার বললেন, ম্যাডাম আপনি কাইন্ডলি বলেন, কোন কেন্দ্রে কারচুপি হচ্ছে, আমরা অবশ্যই তার ব্যবস্থা নিব।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চীফ ইলেকশন কমিশনারকে বললেন আমাকে ফোন করতে বলে ফোন রেখে দিলেন। এর পর প্রায় প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন বাতিল করার দাবী জানিয়ে ফোন করা শুরু হলো। বিকাল চারটা নাগাদ একবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্বাচন বাতিলের দাবীর জবাবে বললেন, ম্যাডাম আমি ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। নানান গোলযোগের কারণে আমি অনেকগুলি ভোটকেন্দ্রের ভোট স্থগিত করেছি।

শেখ হাসিনা পুনরায় নির্বাচন বাতিলের দাবী করলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ম্যাডাম আমি নির্বাচন কমিশনে বসে নেই। আমি সরাসরি ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজেই নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যে কোন প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে আমি মোটেই পিছপা হবো না।

হ্যাঁ, আপনি নির্বাচন বাতিলের সিদ্ধান্ত নিন। আমি পরে আবার ফোন করবো বলেই জননেত্রী শেখ হাসিনা ফোন রেখে দিলেন। এরপর আর অনেক বার ফোন করেও প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেলো না। কিন্তু রাত দশটার সময় প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে পাওয়া গেল। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ফোন ধরতেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উচ্চ স্বরে বললেন, কি হলো, নির্বাচন বাতিলের ঘোষণা দিলেন না?

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বললেন, ম্যাডাম আমাদের কাছে যে ফলাফল এসেছে তাতে দেখা যাচ্ছে শাহ্ মার্কায় মোহাম্মদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে। এখন আমরা কি নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করবো?

শেখ হাসিনা বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ কি বললেন? হ্যাঁ ম্যাডাম, এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে শাহ্ মার্কায় মোহাম্মদ হানিফ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছে এবং মোহাম্মদ হানিফের মেয়র হওয়া প্রায় নিশ্চিত। আমরা কি এই নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করবো?

তাই নাকি, তাই নাকি, না না বাতিল করবেন কেন? আপনি খেয়াল রাখবেন যাতে এই ফলাফল উল্টে না যায়। আমি পরে আবার আপনার সাথে যোগাযোগ করব।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা টেবিল টেলিফোন সেট নামিয়ে রেখে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, জানেন তো হানিফ নাকি মেয়র হয়ে যাচ্ছে। এখন তো আমাদের নির্বাচন বাতিলের দাবী করা ঠিক হবে না; কি বলেন?

জিল্লুর রহমান বললেন, নেত্রী এইটা আবার কোন চাল!

আব্দুর রাজ্জাক বললেন, নেত্রী নির্বাচন কমিশনে আমার একজন খাস লোক আছে, আমি তার কাছে যেয়ে সঠিক খবর নিয়ে আসি।

সভানেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাই যান। আপনারা সকলেই যান, যার যেখানে লোক আছে সেখান থেকেই সঠিক খবরটা সংগ্রহ করেন।

রাত তখন মধ্যরাত্রী, সবাই চলে গেল। একমাত্র আব্দুর রাজ্জাক ছাড়া আর কোন নেতাই রাতে আর ফিরে এলেন না। রাত দেড়টার দিকে আব্দুর রাজ্জাক ছিটো দৌড়ে এসে বললেন, সভানেত্রী কোথায়, হানিফ তো মেয়র হয়ে গেছে। নির্বাচন কমিশন দেশি-বিদেশী সমস্ত মিডিয়া মিডিয়াতে হানিফের মেয়র হওয়ার ফলাফল পাঠিয়ে দিয়েছে। এখন হানিফ বেসরকারী ভাবে ঢাকার মেয়র। সভানেত্রীকে সংবাদটা দিতে হয়।

আপনি বলেন বলে উপরে গেলাম। সভানেত্রী শেখ হাসিনা তিন তলায় টিভি দেখছিলেন, তাকে আব্দুর রাজ্জাকের আগমন সংবাদ এবং হানিফের বেসরকারী ভাবে মেয়র হওয়ার সংবাদ দিলে তিনি বলেন হানিফের কপাল ভাল। আব্দুর রাজ্জাক দেখা করতে চায় জানালে, শেখ হাসিনা বলেন, ঘুম ঘনিয়ে জমে উঠেছে এই সময় দেখাদেখি হবে না। তুমি বলে দাও আমি (শেখ হাসিনা) ঘুমিয়ে পড়েছি।

যথারীতি নেত্রী, বলে নিচে এসে আব্দুর রাজ্জাককে বলা হলো আপনি চলে যান, নেত্রী ঘুমিয়ে পড়েছেন। আজ আর উঠবেন না।

আব্দুস সামাদকে ফোনে পেলেন এরপর ফোনে এলো প্রেসিডিয়াম সদস্য (বর্তমানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী) আব্দুস সামাদ আজাদ এর, সভানেত্রীকে সামাদ আজাদের ফোনের কথা বলা হলে, তিনি ঐ একই কথা বলেন, খুব মাথাব্যথা বেড়ে উঠেছে, বলে দাও ঘুমিয়ে গেছি। এরপর থেকে যেই ফোন করুক বলে দিবে ঘুমিয়ে গেছি।

এরপর থেকে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা যে রুমে বসে ভিসিআরে হিন্দি ফিল্ম দেখছেন সেই রুম থেকেই ফোনসেট নিয়ে যেই ফোন করছে তাকেই বলে দেওয়া হচ্ছে নেত্রী ঘুমাচ্ছেন। এই দিনে আবার জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং উপস্থিত হিন্দি ফিল্ম দর্শকদের মাঝে হাসাহাসির রোল পড়ে গেল।

শেখ হাসিনা এবং হানিফ

পরদিন বিকাল বেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, কিরে, এত লোক আসে যায়, এত ফুলের তোড়া, ফুলের মালা কিন্তু হানিফকে (নব নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফ) দেখছি না! এখন পর্যন্ত হানিফ একটা টেলিফোনও করলো না। আপাতত কি ঠিক আছে তো, না ভাইগা টাইগা গেল। এই মেয়র হওয়ার লোভেই কিন্তু হানিফ স্বৈরাচারী জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টিতে যোগ দিয়েছিল। এরশাদের কাছে চান্স না পেয়ে হানিফ মেয়র হওয়ার জন্য আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি এক কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা খরচ করে হানিফকে মেয়র করেছি। তাড়াতাড়ি খোঁজ খবর নাও। ফোন কর এবং একজন হানিফের বাড়ি গিয়ে দেখে আসো ব্যাপার কি!

সদ্য নির্বাচিত মেয়র মোহাম্মদ হানিফের বাসায় ফোন করে বলা হলো, জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হানিফ ভাইয়ের সাথে কথা বলবেন।

জবাবে দিলেন হানিফ বললেন, তিনি অসুস্থ এখন কথা বলতে পারবেন না।

জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এই কথা বলার সাথে সাথে তিনি (শেখ হাসিনা) বললেন দ্রুতই হানিফের বাসায় যাও, দেখ গিয়ে ঘটনা খারাপ।

তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মেয়র হানিফের বাড়ি ছুটে যাওয়া হলো। মেয়র হানিফ তখন দশ বারো জন লোকের সঙ্গে বসে কথা বলছেন। সেখানেই শোনা গেল বিকেলে লালবাগের বি.এন.পির পরাজিত কমিশনার প্রার্থী আব্দুল আজিজ গুলি করে সাতজন লোককে হত্যা করেছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা কথা বলতে চেয়েছেন বলায় মেয়র হানিফ বললেন, নেত্রীকে আমার সালাম দিও, বলো আমার শরীরটা খুব খারাপ, আমি কথা বলতে পারছি না। তবু লালবাগের খুনের জন্য আমি ওনাদের সাথে কথা বলছি।

মেজর ডালিমের বাসা থেকে সোজা মিন্টো রোড-এ এসে বঙ্গবন্ধু কন্যাকে পাকবাহিনীর পি.এস.পি কমিশনার খুনী আজিজ কর্তৃক বাবা মনকে খুন করার সংবাদ দিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা খুশিতে হিন্দী হিন্দী গান গাইতে থাকেন আর নাচতে থাকেন।

রুমালে গ্লিসারিন

পরদিন সকালে বাংলাদেশে নিহত সাত জনের লাশ রাখা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে দেখতে যাওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলতে থাকেন, আমার (শেখ হাসিনা) রুমালে একটু গ্লিসারিন মেখে দাও, ঐ যে নায়িকারা অভিনয়ের সময় গ্লিসারিন দিয়ে চোখের পানি বের করে কান্নার অভিনয় করে। আমার রুমালে ঐ রকমের গ্লিসারিন লাগিয়ে দাও, যাতে লাশ দেখে রুমাল ধরলেই চোখে পানি এসে যায়।

একদম কম গ্লিসারিনের দরকার নাই, শুধু চোখে রুমাল ধরে থাকলেই মনে হবে আপনি কাঁদছেন। আর আমরা ফটো সাংবাদিক (ফটো সাংবাদিক) ছবির নীচে লিখে দিব আপনি কাঁদছেন ক্যাপশন লাগিয়ে দিবে।

হাসপাতালের মর্গে নিহত সাত জনের লাশ দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চোখে রুমাল ধরলে সাথে সাথে ফটো সাংবাদিকগণ অনেক ছবি তুললো। ছবি তুলা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা গাড়িতে উঠলেন। গাড়ি চলতে শুরু করলো। তখনও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার চোখে রুমাল। গাড়ির ভিতর ড্রাইভার আমাকে বলল আপা (শেখ হাসিনা) এখন রুমাল নামান ফটো সাংবাদিক নেই।

গাড়ির সকল আরোহী হেসে উঠলো। জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক মতো দেখেছ তো, কোন ফটো সাংবাদিক নেই তো?

না নেই।

তাহলে আমি (শেখ হাসিনা) একটু রুমাল নামাই।

আজ আমি বেশি খাব

৩২নং মিন্টো রোডের বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, মন্টু (মিসেস শফিকুর রহমান মেন্টু) খাওয়া দাওয়া বেশি করে এনেছ তো? লাশ দেখে এসেছি, লাশ। আজ আমি বেশি করে খাব।

তারপর তিনি হিন্দী হিন্দী গান গাইতে গাইতে, নাচতে লাগলেন। খাওয়া দাওয়াই তিনি (শেখ হাসিনা) অস্বাভাবিক রকমের বেশি খেলেন। এমনিতেই তিনি (শেখ হাসিনা) বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে নিহতদের লাশ দেখে এসে স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি খেতেন। কিন্তু আজ খেলেন স্বাভাবিকের চাইতেও অনেক বেশি।

টাকার ভাগ দিতে হবে

টুঙ্গিপাড়ায় শেখ হাসিনার পিতা আওয়ামী লীগের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবরে গিয়ে মেয়র মোহাম্মদ হানিফের আনুষ্ঠানিক শপথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হলো। ঢাকা থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফকে সঙ্গে নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যাবেন এবং সেখানে বেসরকারীভাবে হানিফ মেয়র হিসেবে শপথ নেবেন। নির্দিষ্ট দিনে সকাল বেলা সকলেই টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু মেয়র হানিফ এলেন না। টুঙ্গিপাড়ায় যাওয়া হলো না। মেয়র হানিফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলো তিনি বললেন, তিনি অসুস্থ। এরপর আর মেয়র হানিফ শেখ হাসিনার বাসা, আওয়ামী লীগ অফিস কোথাও এলেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়র পদে মোহাম্মদ হানিফ শপথ নিলেন। নগর ভবনের দায়িত্ব ভার নিলেন। হট লাইনের রেড টেলিফোনে প্রতিদিন দুই একবার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলেন। প্রতিদিন না হলেও প্রায় প্রতিদিন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করেন এবং যুক্তি পরামর্শ করে সিটি কর্পোরেশন পরিচালনা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগ নেতা কর্মী ও আওয়ামী লীগ অফিসের ত্রিসীমানাতেও আসেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা কপাল চাপড়াতে আর বলতে থাকেন, নিমকহারাম, বেঈমান, ওরে আমি এক কোটি সাত ত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেয়র করেছি। বেঈমান নিমকহারাম।

যে আসে, যাকে পান তার কাছেই তিনি (শেখ হাসিনা) এই কথা বলতে লাগলেন।

একজন বললো, ঠিক আছে হানিফ ভাই মেয়র হয়েছে, টাকা বানাবে, টাকা খাবে, খাক, আমরা তো আর ভাগ চাই না! কিন্তু দলের কাজ করবে না কেন?

জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, কেন? একা টাকা খাবে কেন? আমাদের ভাগ দিতে হবে। ওকে এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে মেয়র বানিয়েছি। তোমাদের হাত দিয়েই তো ঐ টাকা খরচ করেছি। হানিফ তো এক পয়সাও খরচ করে নাই। সব আমি খরচ করেছি। এখন হানিফ একা খাবে কেন? আমাদেরও ভাগ দিতে হবে। নইলে আমি শেখ হাসিনা একদিন না একদিন এর উসুল করে ছাড়ব।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কথা বললেন, কত শতবার ফোন করা হয়, কেন হানিফ ফোন ধরে না। আসতে বলা হয়, দেখা করতে বলা হয়। হানিফ আসে না, দেখা করে না। লোক পাঠালে মেয়র হানিফ বলে, যা যা, যেই জায়গায় আছিলে সেই জায়গায় যা। ক্ষমতায় যাওয়া লাগবো না। যে পর্যন্ত আগাইছস ঐ বিরোধী দল পর্যন্তই থাক, আর ক্ষমতায় যাওয়া লাগবে না। আমি তোদের দলে নাই।

জাহানারা ইমাম মরাতে আপদ গেছে

১৯৯৪ সালের ২৬শে অথবা ২৭শে জুন সন্ধ্যাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি টেলিফোন করে ২৬শে জুন '৭১ শহীদ জননী জাহানারা ইমামের মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ দিলে, জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আনন্দে নাচতে নাচতে আর বলতে থাকেন মিষ্টি খাও, মিষ্টি। আমার একটা প্রতিদ্বন্দ্বী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। আল্লাহ বাঁচাইছে। নেত্রী হতে চেয়েছিল। আমার জায়গা দখল করতে চেয়েছিল। জাহানারা ইমাম মরাতে আপদ গেছে। বাঁচা গেছে। আমার জায়গা দখল করতে চেয়েছিল। তোমরা জান না, ইন্ডিয়ান গোয়েন্দা এজেন্সি 'র' (ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার নাম 'র') আমার পরিবর্তে জাহানারা ইমামকে নেতৃত্বে বসাতে চেয়েছিল। বেটি মরছে, মিষ্টি খাও। সকলকে পয়সা দেও।

এর কয়েকদিন পরে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিমানে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এলে, জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, চল, এয়ারপোর্টে যাই, আপদের লাশটা এসে পড়েছে বোধ।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা তার দলের কয়েকজন নিয়ে পেট্রোল খরচ করে বিমান বন্দর-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যেতে যেতে বলতে লাগলেন, বেটি (জাহানারা ইমাম) আমাকে অনেক জ্বালাইছে (জ্বালিয়েছে)। এর মরা মুখও দেখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু না যেয়ে তো উপায় নেই। পলিটিক্স-এর (রাজনীতির) খাতিরে ইচ্ছে না থাকলেও করতে হয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিমান বন্দরের রানওয়ে পর্যন্ত গেলেন ঠিকই, কিন্তু শহীদ জননী জাহানারা ইমামের লাশের ধারে কাছেও গেলেন না।

শেখ হাসিনার ট্রেন ভ্রমণ

১৯৯৪ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিমানযোগে যশোর হয়ে খুলনা এলেন। এবং বিকেলে শহীদ হাদিস পার্কের জনসভায় ভাষণ দিলেন। রাতে নেত্রীর চাচাতো ভাই শেখ নাসেরের বড় ছেলে শেখ হেলালের বাড়িতে খেলেন এবং থাকলেন। পরদিন ২৩শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার সকাল নয়টায় সড়ক উত্তর বঙ্গের উদ্দেশ্যে ট্রেন যাত্রা শুরু করলেন। বেশ লম্বা ট্রেন। অনেক সাধারণ যাত্রী আছে ট্রেনে, সাধারণ যাত্রীরা জানে না বা বুঝতে পারছে না, শেখ হাসিনার রেলপথে সফর করতে যাওয়া এই ট্রেন কবে কখন গন্তব্যে পৌঁছবে। ঠিক সকাল নয়টায় ট্রেন ছাড়লো। প্রতিটি রেলস্টেশনেই ট্রেন থামিয়ে সভা করা শুরু হলো। ট্রেন থেকে নেমে জনসভা আয়োজকদের নির্দিষ্ট জায়গায় যেয়ে বক্তৃতা দিয়ে আবার ট্রেনে ফিরে

থামতে গেলে এক ঘণ্টা থেকে একঘণ্টা সময়ে লাগতে লাগলো। এইভাবে প্রতিটা স্টেশনে গড়ে প্রায় একঘণ্টা সময় ব্যয় হতে থাকলো। দিন পেরিয়ে রাত হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা প্রায় ডজনখানেকেরও বেশি সাংবাদিক (বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ভাষায় সাংঘাতিক) এই ট্রেনে রয়েছে। ট্রেনের শেষের দিকে একটি ভি. ভি. আই. পি স্পেশাল কামরায় বা কম্পার্টমেন্ট এ (বগীতে) জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা। ঐ কম্পার্টমেন্ট-এর সামনে এবং পেছনে ঢাকা থেকে নিয়ে আসা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নিরাপত্তায় নিয়োজিত স্পেশাল (এসবি) ব্রাঞ্চ পুলিশের বারো জন সদস্য। তারপরের কম্পার্টমেন্টে সাংবাদিকগণ। এরপর সবগুলো কম্পার্টমেন্ট বা বগিগুলোতে সাধারণ যাত্রী। ট্রেনের এই অস্বাভাবিক দীর্ঘ বিলম্বে সাধারণ যাত্রী নারী-পুরুষ আর শিশুদের ত্রাহিমধুসূদন অবস্থা। ছয় ঘণ্টার যাত্রা পথ চব্বিশ ঘণ্টায়ও না ফুরানোর ফলে অনেক আগেই পানিসহ ট্রেনের সকল খাবার ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলে সাধারণ যাত্রীদের কষ্ট আর দুর্ভোগ সীমাহীন পর্যায়ে পৌঁছে।

ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত শিশুদের কান্না আর আহাজারীতে অনেক সাধারণ যাত্রীই পরিবার পরিজন নিয়ে গন্তব্যের আগেই ট্রেন থেকে নেমে পালিয়ে যান। জননেত্রী শেখ হাসিনা তার সফর সঙ্গী এবং সাংবাদিকদের জন্য প্রায় প্রতিটি স্টেশন থেকেই অঢেল খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির (মিনারেল ওয়াটারের) পর্যাপ্ত বোতল সরবরাহ করা হতে থাকে।

সারাদিন জননেত্রী শেখ হাসিনা প্রায় কুড়িটির মতো স্টেশনে জনসভায় ভাষণ দেন। কোথায় কোথায় স্টেশন ছাড়াই উৎসুক জনতা ট্রেন থামালে সেখানেও তিনি বক্তৃতা করেন। প্রতিটি জনসভাতেই ঢাকা থেকে আসা সাংবাদিকরা উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এবং শেখ হাসিনাও সাংবাদিকদের নজরে রাখেন। কিন্তু রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের আর নজরে রাখতে পারেননি। এদিকে শেখ হাসিনা বার বার একই বক্তৃতা দেওয়ায় সাংবাদিকদের তা মুখস্থ হয়ে যাওয়ায় অনেক সাংবাদিকই রাতের অন্ধকারে ট্রেন থেকে নেমে শেখ হাসিনার বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করতে যাননি।

রাত তখন এগারোটা সতের মিনিট। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেন ঈশ্বরদী রেলস্টেশন পৌঁছাতে কিছু সময় বাকি রয়েছে। এমন সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এই টাকা পয়সা খরচ করে আমরাই আদর করে ঢাকা থেকে যে সাংঘাতিকদের (সাংবাদিক) এনেছি, তারা কি সব ঘুমাচ্ছে? জনসভায় এতো লোক হচ্ছে, আমি এতো বক্তৃতা করছি, সাংঘাতিকদের

(সাংবাদিক) নজরে পড়বে না তো। তোমরা একটু সাংবাদিকদের (সাংবাদিক) ঘুম ভাঙিয়ে আমার (শেখ হাসিনার) জনসভায় পাঠাও যাতে পত্রপত্রিকায় প্রচার নিউজ হয়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দেহরক্ষক স্টাফ সহকারী মদন মোহন দাস (যার নামে শেখ হাসিনার দান করা নিশান পেট্রোল জীপ গাড়িটি রেজিস্ট্রেশন করা) বলল, ভাইজান ঘুম ভাঙান লাগব না। পিস্তল দিয়া দুই রাউন্ড গুলি করিলে সাংবাদিকগো ঘুম কই যাইব, সব দৌড়াইয়া ট্রেন থাইক্যা নিচে নাইম্যা যাইব।

আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের মতো সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে বাহাউদ্দিন নাসিমকে (বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ. পি. এস) বললেন, যে দুই রাউন্ড গুলি কর।

আর উপস্থিত সবাইকে বললেন, তোমরা আমাকে (শেখ হাসিনাকে) হত্যার জন্য ট্রেন-এ গুলি করা হয়েছে বলে সাংবাদিকদের (সাংবাদিক) কাছে প্রচার করে দেবে। ট্রেন ঈশ্বরদি প্লাটফর্মে ঢোকার কয়েক মিনিট আগে বাহাউদ্দিন নাসিম ট্রেনের জানালা দিয়ে সাংবাদিকদের কম্পার্টমেন্ট লক্ষ্য করে পিস্তল দিয়ে তিন (৩) রাউন্ড গুলি ছুড়লো। গুলির শব্দ হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশেরাও পাঁচ ছয় রাউন্ড গুলি করে। এই সমস্ত গুলির আওয়াজ হলে পরস্পর কম্পার্টমেন্টে থাকা সাংবাদিকরা ভয়ে ট্রেনের ভেতরে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। এবং আমরা পরিকল্পনা মতো সাংবাদিকদের কম্পার্টমেন্টে এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার করতে থাকি। ট্রেন ঈশ্বরদি প্লাটফর্মে থামলে, ঈশ্বরদি রেলস্টেশনের বাইরে জনসভার মঞ্চ থেকেও মাইকে আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য ট্রেনে গুলি করা হয়েছে বলে প্রচার চালাতে থাকেন। পরের দিন ২৪শে সেপ্টেম্বর শনিবার ট্রেনে বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রতি গুলি করা হয়েছে বলে জাতীয় পত্রপত্রিকায় সংবাদ বের হলে, বগুড়া সরকারী সার্কিট হাউজের ভি ভি আই পি কক্ষে বসে জননেত্রী শেখ হাসিনাসহ তার সকল সফরসঙ্গীরা (যারা প্রকৃত ঘটনা জানে) হাসাহাসি করতে থাকে। এবং হাসাহাসির এক পর্যায়ে গুলির এই ঘটনা নিয়ে হরতাল ডাকার সিদ্ধান্ত হয়।

৫০ হাজার টাকা এ্যাডভান্স

২রা অক্টোবর ১৯৯৪। ধরলা নদী। রংপুরের নামকরা নদী। লোকে বলে সর্বনাশা নদী। পদ্মা-মেঘনার মতোই শক্তিশালী নদী। খরস্রোতা। রংপুর কুড়িগ্রাম থেকে নাগেশ্বর ফুলবাড়িয়া যেতে হলে এই ধরলা নদী পার হয়ে যেতে

হবে। নদী পার হওয়ার ছোট একটি কাঠের ফেরী। দুইটি কাঠের নৌকা জোড়া দিয়ে তৈরি এই ফেরী। ফেরীতে দুই-একটা গাড়ির বেশি জায়গা হয় না।

এই ফেরী পার হলেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নাগেশ্বর ও কুলপাড়িয়ায় জনসভা করতে যাবেন। আমাদের গাড়ি বহরের অনেক গাড়ি ফেরী পার হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা ও তার গাড়ী ফেরীতে উঠানো হলো। ফেরীতে উঠেই বঙ্গবন্ধু কন্যা আঁতকে উঠে বললেন, ওরে বাপরে, একি ফেরী? এত বড় নদীতে কাঠের এই সামান্য ফেরী?

এই সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু শেখ হাসিনার গাড়ির পিছনে মোহাম্মদ নাসিমসহ মাত্র পাঁচ জন সফর সঙ্গী এবং পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের কয়জন পুলিশ ছিল।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ফেরীর দু'জন চালক (মাঝি) কে বললেন, দেখ আবার ডুবে না যায়।

ফেরীর মাঝিরা বলল, না না আপনি ভয় পাবেন না। ফেরী ছোট কাঠের হলেও শক্ত আছে। একমাত্র বন্যা যদি বেশী হয় তবেই ফেরী ডুববে, নইলে ডুববে না।

প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বললেন, তোমরা তো আমাদের জন্য ফাটিয়ে রাখ নাই?

ফেরীর মাঝি বলল, আমরা যদি বন্যা ফাটাইয়া পানি আনতাম তাহলে পারেন না। আরে কইয়া বন্যার একটা কাঠ এমন ভাবে ঢুকিয়ে রাখুন যেন ডুবাতে পারবেন না। আর কইবার দিয়া এমন ভাবে ফেরীর ঘুরাটা করব যে, হঠাৎ করে ঢলা দিয়া ধাক্কাইয়া পানি উঠিয়া ফেরীতে না এলেও ফেরী ডুবাইয়া যাইব। সেটি ব্যাপারই পারব না কি হইতো। কোনটাই আল্লাহ চাহে না, আল্লাহ রাব্বুল আল্লাহ পাক কিছু রাখছে।

প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু বললেন, তাহলে তো ছিল এই ফেরীতে গেলে ফেরীটা ডুবাইয়া দিত।

এরপরই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ওপারে পৌঁছে মাঝিদের সুখ-দুঃখের বিষয় নিয়ে আলোচনায় গেলেন। মাঝিরা পারিবারিক সুখ-দুঃখের সাথে তাদের জীবনের অনেক চাওয়া-পাওয়ার কথা বলল। জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমি ক্ষমতায় গেলে তোমাদের সব দাবি পূরণ করে দেব।

ফেরী ঘাটে বিকালে বঙ্গবন্ধু কন্যা নাগেশ্বর ও কুলপাড়িয়ায় চলে গেলেন। এবং নাগেশ্বর ও কুলপাড়িয়ায় জনসভায় বক্তৃতা শেষে পুনরায় আমাদের গোপাল দিকে এই পথে, যে পথে তিনি গিয়েছিলেন, সেই পথে আসার নির্দেশ দিলেন। যদিও এই পথে আমার কোন কথা ছিল না। কথা ছিল ময়মনসিংহ-এর

ফুল ছিটানো

আজ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। [illegible] সালের [illegible] ডিসেম্বর শুক্রবার। সকালে [illegible] বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার [illegible] বাড়ি থেকে [illegible] ফুল। সকালে [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মিরপুর বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে রওয়ানা হলেন। [illegible] মিনিটে স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করলেন। তারপর গেলেন রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে। সেখানে পুষ্পমাল্য দেওয়ার পর শহীদ বুদ্ধিজীবী সন্তানদের সংগঠন প্রজন্ম '৭১-এর [illegible] শেখ হাসিনা এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিলেন। [illegible] শেখ হাসিনার [illegible] পি. পি. এস. [illegible] শেখ হাসিনা তার [illegible] দিলেন। [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible] আলোচনা সভা। [illegible] সভার প্রধান অতিথি। [illegible] বিরোধী দলীয় নেত্রী [illegible] বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে শেখ [illegible] ফুল [illegible]

নেত্রী, আপনি কোন চিন্তা করবেন না, আপনার উপর ফুল ছিটানো হবে। তখন বাজে সাড়ে তিনটা। [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা [illegible] শিশু, কোথাও বা মেয়েরা। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আগমনে। [illegible] ফুল [illegible] ফুল ছিটানোর [illegible] শুরু করা হলো।

বৃহন্নলা পালা

বাহাউদ্দিন নাসিম শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবর রহমানের ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ, পি, এস। এর আরো তিন চাচাতো ভাই অর্থাৎ শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবর রহমানের আরেক ফুফাতো ভাইয়ের তিন ছেলে (১) নজিব আহমেদ নজিব, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চীফ সিকিউরিটি (২) নকিব আহমেদ বাবু, বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডি, পি, এস। (৩) কাজিম আহমেদ কাজিম। (মাসুদ আহমেদ পাগল হয়ে গেছে তাই কাজিমকে ভর্তি করা হয়েছে বনানীতে অবস্থিত পাগলদের প্রাইভেট ক্লিনিকে) বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রস্থ বাংলাদেশ মিশনের চীফ প্রোটোকল অফিসার। মাদারীপুরের অখ্যাত অজো পাড়াগায়ে এদের বাড়ি। জন্ম কিসের পর। পূর্ব পুরুষ থেকেই এরা দরিদ্র। এদের বাবা, চাচা এবং এরা পুরুষানুক্রমে পরের বাড়িতে জায়গির থেকে অনেক কষ্ট করে দশটুকুই হোক লেখা পড়া করেছে। টাকায় চালচুলো বলে কিছুই নেই। সেখানে হাত দেখানোই কাজ। নিকট আত্মীয় বলতে সর্বনাশকূলো ফুফাতো বোন শেখ হাসিনা। খাবে আর বাস কোথায়? দলবলে এরা এসেই উঠে পড়লো শেখ হাসিনার বাড়ি। শেখ হাসিনার বাড়িতে থাকে, শেখ হাসিনার খাওয়া খায়। শেখ হাসিনার দেওয়া কাপড় পরে। শেখ হাসিনার দেওয়া পয়সায় চলে। আর চাই কি? অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শেখ হাসিনার [illegible] এদের ডজন ডজন ফ্ল্যাট, ডজন ডজন মার্ট, ডজন ডজন জুতা হয়ে গেল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শেখ হাসিনার বদৌলতে অনেক বিত্তশালীও হন।

এদের মধ্যে বাহাউদ্দিন নাসিম মনে করতো এবং চাইতো কেউই শেখ হাসিনাকে কোন কিছু বলতে পারবে না। সে যেই হোক। হোক না সে দলীয় কেন্দ্রীয় নেতা। অথবা সমাজের গণ্যমান্য কেউ। কিংবা কোন বুদ্ধিজীবি সে যেই হোক। কেউই শেখ হাসিনাকে কোন সংবাদ বা কোন খবর কিংবা কোন কথা বলতে পারবে না। তা সে সংবাদ বা কথা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন।

শেখ হাসিনাকে কেউ কিছু বলতে চাইলে আগে তাকে (বাহাউদ্দিন নাসিমকে) বলতে হবে। এবং সে যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শেখ হাসিনাকে বলবে, প্রয়োজন মনে না করলে বলবে না। আবার শেখ হাসিনার যদি কোন নেতাকে, বা কোন মানুষকে, কিংবা যে কাউকে কিছু বলার থাকে তাহলে তাকে (বাহাউদ্দিন নাসিমকে) বলতে হবে। বাহাউদ্দিন নাসিম যদি প্রয়োজন মনে করে তাহলে শেখ হাসিনার সেই কথাটা অন্যকে বলবে, প্রয়োজন মনে না করলে বলবে না। বাহাউদ্দিন নাসিমের এই দুঃসাহস বা স্পর্ধা হয়েছে শেখ হাসিনার কারণেই। বাহাউদ্দিন নাসিমের প্রতি শেখ হাসিনার অন্য কোন দুর্বলতা না

ব্যাংকের দু'টি দুর্বলতা ছিল। তার একটি হল, মতিঝিল আদমজী কোর্টের পূর্ব পাশে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের (ইউ. সি. বি. এল, মতিঝিল শাখা) যে শাখা রয়েছে, এই শাখায় বাহাউদ্দিন নাছিমের নামে শেখ হাসিনার কয়েক কোটি টাকা জমেছে। উল্লেখ্য শিল্পপতি জহির উদ্দিন হত্যার প্রধান আসামী চিটাগাং-এর আত্মস্বীকৃত সাদু এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান/পরিচালক। অপর দুর্বলতাটি বাহাউদ্দিন নাছিম শেখ হাসিনার পিতার কুকুরকে খাইয়ে মেরেছে। এই বাহাউদ্দিন নাছিম শেখ হাসিনার ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোডের চুয়ান্ন নম্বর বাড়িকে মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করে বলত, এই বাড়িওয়ালী তো বেঈমান, বেঈমানি তো করবেই। কুইলা তো খাইবেই। মনে তো রাখবেই না। কুত্তা (কুকুর) পাইলা পুইষা খাইছ, কুত্তা (কুকুর) ভুলব না।

প্রায়ই বাহাউদ্দিন নাছিম এসব বলত। বলতে বলতে একদিন বাহাউদ্দিন নাছিম ঠিকই দু'টি কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসে পালতে শুরু করলো। ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোড-এর শেখ হাসিনার চুয়ান্ন নম্বর বাসায় কুকুরের বাচ্চা দু'টি এখন অনেক বড় হয়েছে। এখন আর ওদের কুকুরের বাচ্চা বলা যায় না। বলতে হবে কুকুর। বাহাউদ্দিন নাছিম এই ধরনের কথা এবং কাজ করবেই বা না কেন? বাহাউদ্দিন নাছিম শেখ হাসিনার বাড়িতেই থাকত। আর ঐ বাড়িতে বাহাউদ্দিন নাছিমের পিতা, ভাইবোন এবং আদর্শ চরিত্রের অধিকারী শেখ হাসিনা মাহেরাগান থেকে কুকুরের মত দূর দূর করে তাদের তাড়িয়ে দিলেন।

স্বামী স্ত্রী রাত ও কাটাননি

১৯৯৬ সালের ২৮শে ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। ২৯ মিন্টো রোডের সরকারী বাসা ত্যাগ করে ধানমন্ডি পাঁচ নম্বর রোডের চুয়ান্ন নম্বর বাড়িতে উঠলেন। ধানমন্ডি ৫ নাম্বার রোডের ৫৪ নাম্বার বাড়িটি প্রথম ও দ্বিতীয় তলা শেখ হাসিনার পরিত্যক্ত স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়ার নামে। আর তৃতীয় তলা শেখ হাসিনার নিজের নামে। শেখ হাসিনার অবহেলিত ও পরিত্যক্ত স্বামী বৈজ্ঞানিক ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এই বাড়িটি করার সময় দ্বিতীয় তলা করার পর টাকা ফুরিয়ে গেলে শেখ হাসিনার কাছে ধার চায়। তখন শেখ হাসিনা তৃতীয় তলা তার নিজের নামে লিখে নিয়ে তারপর ডঃ ওয়াজেদকে টাকা দেন। অবশ্য এই বাড়িতে ডঃ ওয়াজেদ মিয়া আর শেখ হাসিনা একসাথে একটি রাতও কাটাননি। শুধু এই বাড়িতেই কেন, ১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে আসার পর থেকেই ১৯৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত (এর পরের অবস্থা জানা নেই বলে, তথাপি বুঝা যায়, পাঠক যেই দিন পড়বেন, সেই দিন পর্যন্ত ধরে নিতে পারেন) এই ১৬/১৭ বছর এক

সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তার সম্পর্ক তো দূরের কথা, এমনকি দেখা সাক্ষাৎও এখনো ছাড়াছাড়ি। ১৯৮১ সালে ১৭ই মে বাংলাদেশে আসার পর আর কিছু দিন শেখ হাসিনা ও ড. ওয়াজেদ মিয়া মহাখালীস্থ সরকারী কোয়ার্টারে ছিলেন। শেখ হাসিনা মহাখালীর ড. ওয়াজেদ মিয়ার সরকারী কোয়ার্টারে থেকেছেন, তবে দিন ড. ওয়াজেদ মিয়া তাঁর কোয়ার্টারে না থেকে [illegible] থাকছেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে তাঁর পিতার বঙ্গবন্ধু ভবনে উঠে যান। বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে পরে বিরোধী দলীয় নেত্রী ২৯ মিন্টো রোডের সরকারী বাসভবনে। তখন শেখ হাসিনা এবং তার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িটি ভাড়া দেওয়া ছিল। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িটির ভাড়াটিয়াদের এক রকম জোর করে বাড়িতে থেকে খালি করা হয় এবং বর্তমান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই বাড়িতে আসেন। এই বাড়িতে থেকেই সব আন্দোলন সংগ্রাম এবং নির্বাচনের পর বর্তমান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে রাষ্ট্রীয় বাড়ি [illegible], বর্তমানে গণভবনে উঠেন। শেখ হাসিনার এই দীর্ঘ ১৯/২০ বছরের জীবনে ড. ওয়াজেদ মিয়া একটি রাতও শেখ হাসিনার সাথে কাটাননি। একটি এই ১৯/২০ বছরের জীবনে শেখ হাসিনা আর ড. ওয়াজেদ মিয়ার ১৯/২০ বছর দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। তবে ঈদের ঈদের সময়ে মাঝে [illegible] ড. ওয়াজেদ মিয়া এসে হাজির হতেন। কিন্তু তিনি (ড. ওয়াজেদ মিয়া) শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কোন প্রকার আদর আপ্যায়ন পেতেন না। এমন কি সাধারণ সৌজন্যমূলক শেখ হাসিনা ড. ওয়াজেদ মিয়াকে দেখাতেন না।

শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলীয় নেত্রী হিসেবে ২৯ মিন্টো রোডের সরকারী বাসায় থাকতেন, তখন ঈদের দিনে সাধারণ দর্শনার্থীদের সাথে সাধারণ দর্শনার্থীদের মতোই ড. ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসতেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অন্যান্য সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করলেও তার স্বামী ড. ওয়াজেদের সাথে কোন প্রকার কুশলাদি বিনিময় দূরে থাক, ভ্রূক্ষেপই করতেন না। এমন কি তাকে (ড. ওয়াজেদ মিয়াকে) বসতে পর্যন্ত কেউ বলতেন না। ড. ওয়াজেদ মিয়া কিছুক্ষণ অসহায়ভাবে ফ্যালফ্যাল করে শেখ হাসিনার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেন, ঘর থেকে অপরাধীর মতো হাঁটিতে হাঁটিতে গেটের বাহিরে চলে যেতেন। একমাত্র শেখ হাসিনা আর তার খুবই ঘনিষ্ঠ কয়েক জন ছাড়া কেউ জানতো না, বুঝতো না এই ব্যক্তিটি কে।

[illegible]

অনেক পরে অসুস্থ হয়ে সেবাগ্রামবাসী [illegible] শিবির [illegible] মাসাধিক কাল শয্যায় থাকলেও [illegible] শেষ পর্যন্ত একটি [illegible] আর স্বামী তা ওয়াকেন শিবাকে দেখতে পেলেন না।

শেখ হাসিনার দেহে আঘাত

শেখ হাসিনার দেহে অনেক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এই আঘাতের ব্যথায় মাঝে মাঝেই কাতরাতেন তিনি। এমনকি কেঁদে ফেলতেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতেন ময়না (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অনাহুত ঘোষিত এবং ব্যক্তি বিশেষ মতিয়ুর (ময়না) রহমান রেন্টু) এই বিশেষ জায়গাটায় বেশি করে মালিশ করো। শয়তানের বাচ্চাটা (ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) আমাকে (শেখ হাসিনা) ১৯৮০ সালে এই জায়গায় মেরেছে, আজও সেই ব্যথায় আমি কাতরাই।

ময়নার প্রধান কাজ ছিল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার দেহ মালিশ (ম্যাসেজ) করা। প্রায় প্রতিদিন শেখ হাসিনাকে দেহ মালিশ (ম্যাসেজ) করে ঘুম থেকে তোলা এবং ঘুমানোর আগে দেহ মালিশ করে তাকে (শেখ হাসিনাকে) ঘুম পাড়ানোই ছিল ময়নার প্রধান কাজ। এছাড়া ভি. আই. পি কেউ এলে তাকে এন্টারটেইনমেন্ট বা আপ্যায়ন করা, ভি. আই. পি. ব্যক্তির সাথে প্রাথমিক আলাপ আলোচনা করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অবহিত করা। টেলিফোন ধরা ও টেলিফোনকারীকে প্রয়োজনীয় ইনফরমেশন দেওয়া এবং নেত্রীকে তা ইনফর্ম করা। বঙ্গবন্ধু কন্যার মনমতো খাবার দাবারের ব্যবস্থা করা। তার শাড়ি পোশাক আশাক ঠিক করা এবং শেখ হাসিনাকে কাপড় চোপড় পোশাক পরিয়ে পরিপাটি করে বাইরের বিভিন্ন কর্মসূচীতে পাঠানো ইত্যাদি ছিল ময়নার দৈনন্দিন দায়িত্ব। এছাড়া বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে ছিল নেত্রীকে বাইরের প্রকৃত খবরা খবর জানানো।

এসব করা ময়নার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু চাকরি ছিল না। এসব করার জন্য ময়নাকে বেতন করে রাখা হয়নি। উপরন্তু ময়নাই (মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু) জননেত্রী শেখ হাসিনাকে টাকা পয়সা, কাপড় চোপড়, জিনিসপত্র যাবতীয় কিছু সাধ্যানুযায়ী দিত। ভোরে বেলা শেখ হাসিনাকে ঘুম থেকে তুলে নাস্তা খাইয়ে তিনি যতক্ষণ ঘরে থাকতেন ততক্ষণই ময়নাকে কাছে থাকতে হতো। কোন কোন দিন শেখ হাসিনার বাসা থেকে ময়নার নিজের বাসায় ফিরতে রাত ১/২টা ও হতো।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ময়নাকে ধরে কাঁদতে থাকতেন আর বলতে থাকতেন, জান ময়না, শয়তানের বাচ্চা (তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া) আমাকে দিনে তিনবার মারতো। সকাল-দুপুর আর রাতে। এই তিন বেলা শয়তানের বাচ্চা খাওয়ার, আমাকে মারতো। মেরে মেরে আমার সারা শরীর ঝাঁঝরা করে দিতো। হারামির বাচ্চা দুপুরে এসে আমাকে মারবে, এই জন্য একবেলা কম মার খাওয়ার জন্য আমি (শেখ হাসিনা) জয় আর পুতুল দুই সন্তানকে নিয়ে দুপুরে পার্কে কাটিয়ে আসতাম। ঐ ইবলিশটার মারের চোট আমার দেহের কিছু নাই। সারা দেহে শুধু দাগ। বিয়ের পর থেকেই শয়তানের বাচ্চা আমাকে মারা শুরু করেছে।

শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া শেখ হাসিনাকে দৈহিক নির্যাতন করতেন, মারধর করতেন, এ কথা শেখ হাসিনা অসংখ্য বার কেঁদে কেঁদে বলেছেন। শেখ হাসিনার কান্নায় মানুষের চোখেও পানি এসেছে। কিন্তু কোন স্বামী তাকে মারতেন, দৈহিক নির্যাতন করতেন, এই কথা শেখ হাসিনা কখনোই বলেন নি। এ এক অদ্ভুত চরিত্র, কর্ম ও ভাগ্যের অধিকারী শেখ হাসিনা। বিদেশ থেকে একমাত্র কন্যা পুতুল এসে মা শেখ হাসিনাকে ডাকে 'এই যে বহুরূপী' তোমার তো রূপের শেষ নেই। এবার কি রূপ দেখাবে তুমি।

শেখ হাসিনা কোন কথা বললে সাথে সাথে মেয়ে পুতুল আর তাঁর স্বামী সকলের সামনে বলে উঠে, এটা তোমার কত নম্বর রূপ। শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানাকে পুতুল বলে, খালা এটা তোমার বোনের কত নম্বর রূপ? তোমার বোন তো বহুরূপী। রূপের শেষ নাই তার।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাৎক্ষণাৎ চুপ মেরে যান। কোন কথা বলেন না। শেখ হাসিনা মেয়ে পুতুলকে তার (পুতুলের) নিজের বিয়ের প্রস্তাব দিলে, কোন রকম টাল বাহানা না করে বিনা বাক্যে মুহূর্তের মধ্যে সাহীন এক পায়ে দাঁড়িয়ে রাজি হয়ে যায়। মনে হয় যেন কারো হাত থেকে মুক্তি পেতে চায় পুতুল। শেখ হাসিনাও বেঁচেছেন পাত্রের কাছে পুতুলকে বিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে চান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিদেশে বসবাসরত একমাত্র পুত্র জয়কে ফোন করে দেশে এসে দাঁড়িয়ে যেতে বলেন এবং আসার সময় তার (শেখ হাসিনার) জন্য একটা শাড়ি নিয়ে আসতে বললে, পুত্র জয় সরাসরি অস্বীকার করে বলে, "ও সব শাড়িটাড়ি আমি আনতে পারবো না।"

শেখ হাসিনা আবার উপস্থিত সকলকে বলে, দেখ, আমার সন্তান দেখ, আমার জন্য একটা শাড়ি আনতে বললাম। ছেলে আমার অসম্মান না করে দিল।

মা হিসেবে পুত্র কন্যার প্রতি শেখ হাসিনার আচার-আচরণে কোনদিন কোন ত্রুটি চোখে পড়েনি। বরং মনে হয়েছে মা হিসেবে শেখ হাসিনার তুলনা নেই। তারপরও আশ্চর্যের বিষয়! শেখ হাসিনার প্রতি তার পুত্র-কন্যার কেন এরকম আচরণ?

রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দিব না

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলের বিয়ে ঠিক করলেন, ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িতে শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া এসে ক্ষিপ্ত হয়ে শেখ হাসিনাকে বলতে লাগলেন, মেয়ে কি তোমার একার? মেয়ে কি আমার না? তুমি রাজাকারের ছেলের কাছে আমার মেয়েকে বিয়ে ঠিক করেছ! রাইফেল হাতে নিয়ে সে রাজাকারগিরি করেছে, মুক্তিযোদ্ধা মেরেছে, তার ছেলের সাথে আমি কিছুতেই আমার মেয়ে বিয়ে দিব না। তুমি আমার মেয়েকে ঐ রাজাকারের ছেলের সাথে কিছুতেই বিয়ে দিতে পারবে না।

অবশেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আমি মেয়ে বিয়ে দিব। পারলে তুমি ঠেকাও।

ড. ওয়াজেদ বললেন, তাই বলে তুমি রাজাকারের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দিবে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, কিসের আবার রাজাকার আজাকার! আমার আত্মীয় এটাই বড় কথা। সাথে থাকলে আমাদেরই লোক। দেখ নাই ঐ মুক্তিযোদ্ধা মুক্তিযোদ্ধারাই আমার বাপ-মা-ভাইদের কিভাবে মেরেছে! আমি আমার মেয়েকে এখানেই বিয়ে দিব। পারলে তুমি ঠেকাও।

ড. ওয়াজেদ মিয়া বললেন, তোমাদের সাথে তো আমি ঠেকাঠেকিতে পারব না। তবে আমি বলে দিচ্ছি আমার মেয়েকে যদি রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দেও তবে আমি এই বিয়ের সাথে নেই। এই বিয়েতে আমি আসবো না। আমি তোমাকে (বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে) অনুরোধ করছি ঐ রাজাকারের ছেলে ছাড়া যেখানে খুশি সেখানে তুমি মেয়ে বিয়ে দাও, আমি তোমার সাথে থাকবো। কিন্তু রাজাকারের বংশের কাছে মেয়ে বিয়ে দিলে আমি থাকবো না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার স্বামী ড. ওয়াজেদের কথা রাখলেন না। তিনি তার ইচ্ছে মতো রাজাকারের ছেলের সাথেই মেয়ে বিয়ে দিলেন। [illegible] ড. ওয়াজেদ কথা পাকাপাকি, পান চিনি, গায়ে হলুদ এবং বিয়েতে কোথাও আসলেন না। শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সাথে মিনিট ৫/৬-এর জন্য এসে আবার খালেদা জিয়ার সাথেই চলে গেলেন। তিনি কারো সাথে কোন কথা বললেন না। কেউ তাঁর সাথে কোন কথা বললো না।

বিয়ের খুঁটিনাটি থেকে শুরু করে যাবতীয় যা আয়োজন তার সিংহভাগই করতে হয়েছে আমাকেই (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক মনোনীত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। এর উপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার [illegible] [illegible] ভাইয়ের ছেলে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ, পি, এস [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। ডেকোরেটরের বিল, বাবুর্চির বিল, [illegible] [illegible] ইত্যাদি সকল যা প্রয়োজন হয়েছে, [illegible] [illegible] তার সব কিছুই আমাদের কাছ থেকেই নিয়েছে।

[illegible]

বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ে পড়ানোর জন্য কাজীর সামনে একটি মাইক লাগানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হঠাৎ সেই মাইক নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], যার যার [illegible] [illegible], কি [illegible] [illegible] [illegible] সবাই এই জায়গা থেকে চলে যান। নইলে অসুবিধা হবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যার মুখে হঠাৎ এই কথা শুনে উপস্থিত সকলে [illegible] কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যান। এবং অনেকেই খাওয়া-দাওয়া না করে অনুষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে শুরু করেন, আমরা তাড়াতাড়ি [illegible] [illegible] এই কথার অর্থ কি জানতে চাইলে শেখ হাসিনা বলেন, [illegible] বাড়ীতে [illegible] এসেছে, তাদের জন্য আমি এই কথা বলেছি। এরপর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। কিন্তু [illegible] [illegible] [illegible]। অধিকাংশ নিমন্ত্রিত অতিথিই না খেয়ে চলে যান।

বিয়ের সকল অনুষ্ঠান শেষ। সবাইতো চলে গেছে। শুধু বর (জামাই) আর বরের আত্মীয়-স্বজনরা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলকে বরের গাড়িতে তুলে দিয়ে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তারপর জননেত্রী শেখ হাসিনা ময়নাকে বললেন, ময়না আজ আর তুমি আমাকে ছেড়ে যেওনা।

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমাদের একমাত্র সন্তান পীর হাবিবের স্বর্ণজাকে সাথে নিয়ে ধানমন্ডি ৫ নাম্বার রোডে শেখ হাসিনার ৫৪ নাম্বার বাড়িতে চলে এলাম। বাড়িতে এসে বাইরের কাপড় পাল্টে সবাইকে নিয়ে খাটের পাশে বসে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ময়নাকে বললেন, ময়না তোমরা যা করলে, তোমাদের ঋণ জীবনে শোধ করা যাবে না। কোনদিন তোমাদের ভুলা যাবে না। কোনদিন তোমাদের ভুলব না। আমাদের মেয়ে স্বর্ণজাকে দেখিয়ে বললেন ও তো সেটি মেয়েই আমাকে ভালবাসে।

অবশ্য এমন কথা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আজ নতুন বলছেন না। এর আগেও অনেকবার এসব কথা তিনি বলেছেন।

এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা

১৯৯৭ সাল। ১০ই জানুয়ারী। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ধানমন্ডি বত্রিশ নাম্বার বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে জয় মোহন গাড়ির সামনে বেরিয়ে বঙ্গ শেখ হাসিনা নাম বদলের নির্মাণ প্রক্রিয়া ঠিক করে দিতে আসছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তার সঙ্গে তার পাশে বসে আছে তার একজন মাত্র সখী। ড্রাইভার আমাদের গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি চলছে। ড্রাইভার আমাদের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করল আপা কেমন হাসিনা এত বড় ভুল দিলো?

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দিলেন, কে জানে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়ার জন্য এতে কম কোন ক্ষতি নাই। এর কাছে কম লোক পাঠাই নাই। আওয়ামী বেঈমানটা আসে নাই। শয়তানটা পাঠাই দেয় নাই। এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে বিমানবন্দরটাকে আমি মেরামত করিয়েছি। তোমরা তো সব জান, সবই দেখেছ, সবই করেছ। আর কী করেছি আমি। আল্লাহ যে মন থেকে একেবারে চলে যায় তাকে আর কখনই নেওয়া উচিত না। এ দেশের হওয়ার জন্য আমার নামে বেঈমানি করে বেঈমানটা আপনাকে পাপ ভেঙে এদেশের মাটিতে চলে গেছিল। সেইখানে থেকে যেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে যখন আসলো তখনই বেঈমানটাকে নেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু কি যে হয়েছে! কি মনে করে যে আবার নিলাম। শয়তানটা আমার সাথে এত বড় বেঈমানি করবে বুঝতে পারি নাই। বুঝতে পারি নাই। বুঝলে কি আর এই কাজ করি।

নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালের শেষ মুহূর্তে ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বরের বাড়িতে উঠেই, '৯৫ সালের জানুয়ারীর প্রথম থেকেই জোরেশোরে হজ্বে নামাজের আন্দোলন সংগ্রাম, হরতাল, পদযাত্রা ইত্যাদি শুরু করলেন। দুপুর দু'টোয় টঙ্গি থেকে মহাখালী পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হলো। অর্থাৎ টঙ্গি থেকে সবাই পায়ে হেঁটে মহাখালী যাবেন। মহাখালীতে মঞ্চ তৈরি করা আছে, পদযাত্রা শেষে এই মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভাষণ দিবেন। শেখ হাসিনা তার নেতৃবৃন্দ সাথে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মোহাম্মদ নাসিম এর সাথে কেবিনেটের কত নাম সহকারে বিশাল পেট্রোল জীপে করে বাকী সব নেতা কর্মী সবাই পায়ে হেঁটে, টঙ্গি থেকে মহাখালীর দিকে এগোনো শুরু। প্রায় শ'খানেক হাজার লোকের পদযাত্রা। পদযাত্রার মধ্যে নেতারা ৫/৭ হাজার লোকের ঠিক মাঝখানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিপে করে পদযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। পদ-যাত্রার মাঝে মাঝে ছোট্ট পিকআপ ভ্যানে মাইক বেঁধে নানা ধরনের স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। জানুয়ারী মাস, শীতের দেশ। রৌদ্রের খুব একটা প্রতাপ লাগছে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে হবে। হঠাৎ একটি মাইকে বলা হল জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন আসর নামাজ পড়ছেন।

সাথে সাথে সবগুলো মাইক থেকে বলা শুরু হল জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা এখন আসর নামাজ পড়ছেন। পরিবেশ তখন বেশ নিরিবিলি লাগছে।

প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ (বর্তমানে শেখ হাসিনার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী) বললেন, আস্তে আস্তে থামো, এখনও আসর ওয়াক্তই হয় নাই। একটু পরে বল।

এই কথা শুনে সব নেতারা হাসাহাসি শুরু করলেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিশাল পেট্রোল জীপের বহু দূর আগানোর পূর্বে আসর নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আর পদযাত্রার হাজার হাজার পুরুষ লোক জীপ গাড়ি ঘিরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামাজ পড়া দেখতে লাগল। নামাজ শেষ হতে বেশ কিছু সময় নামাজ পড়ার প্রচার শেষ হলো না, তার এক ঘন্টার বেশি সময় ছোট্ট পিকআপ মাইকে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নামাজ পড়ছেন প্রচার করা হল।

আর একদিন মোহাম্মদপুর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে আমেরিকান এ্যাম্বেসি সামনে দিয়ে গুলশান যেয়ে শেষ হবে। পদযাত্রা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ডেকে বললেন, নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পরে যেন মাইকে বলা শুরু করে। ওয়াক্তের আগে যেন বলা শুরু না করে।

[illegible] শেখ হাসিনার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

উত্তরে শেখ হাসিনা বললেন, না এটা আমাদের দলীয় [illegible] না।

[illegible]

[illegible] বললেন, না তোমরা তো সব ভাইয়ের মতো, [illegible] না।

[illegible]

এর তিন দিন পরেই [illegible] থেকে [illegible] পর্যন্ত পদযাত্রা। এই পদযাত্রায়ও ঐ একই মাইক, একই নামাজ, একই পুরুষ মানুষকে দিয়ে দেখা। এই পদযাত্রার শেষ দিনটিতে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ। [illegible] শেখ হাসিনার [illegible] নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ [illegible] শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, নেত্রী আমাকে চিনতে পেরেছেন না?

নেত্রী বললেন কোন্ মিয়া?

জেলা সভাপতি বললেন, [illegible] আওয়ামী লীগের সভাপতি [illegible] মোঃ হানিফকে চেনেননি?

নেত্রী [illegible] বললেন না, [illegible] বেয়াদবী [illegible] [illegible] [illegible] আপনারা প্রস্তুত হন।

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সারা দেশে লাগাতার তিনদিন হরতাল দিয়েছেন। দোকান-পাট খুলবে না, অফিস-আদালত, কলকারখানা, স্কুল কলেজ চলবে না, গাড়ির চাকা ঘুরবে না। আবার তিন দিনের হরতালের ঘোষণা পাওয়ার সঙ্গে শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। হরতালের প্রথম দিনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাড়ির (ধানমন্ডি ৫ নাম্বার রোডের ৫৪ নাম্বার বাড়ি) মাটির নিচের পানির ট্যাংক (রিজার্ভার) থেকে ছাদের উপরের ট্যাংকিতে পানি তোলার মটর নষ্ট হয়ে গেলে হরতালের দ্বিতীয় দিন সকাল আটটার সময় নবাবপুর থেকে সিরাজী নামের এক ঢাকাইয়া মটর মেকানিক নিয়ে আসা হয়। মটর মেকানিক সিরাজী মটর দেখে এটা ঠিক করতে একদিন সময় লাগবে এবং মটরটা খুলে নিয়ে যেতে হবে জানালে তাকে মটর খুলে নিয়ে যেতে অনুমতি দেওয়া হল। মটর মেকানিক সিরাজী আওয়ামী লীগের গোঁড়া সমর্থক। সে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে একটু সালাম দিতে চাইল। বঙ্গবন্ধু কন্যা দু'দিন থেকে মটর নষ্ট হওয়ার কারণে ঠিকমতো গোসল করেননি। তার উপর আজ সারাদিন কিছুই খায়েন নাই। এই পরিস্থিতিতে মেকানিক সিরাজী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সালাম দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিল। আবার মেকানিক সিরাজী কষ্ট করে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছে। এসব চিন্তা ভাবনা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো মটর মেকানিক আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। সে আপনাকে একটু সালাম দিয়ে যেতে চায়। জননেত্রী সালাম নিতে অস্বীকার করলে, জননেত্রীকে বলা হল আপনি সালাম নিলে মেকানিক তাড়াতাড়ি মটর মেরামত করে দিবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, ওর বাড়ি কোথায়?

ঢাকায়।

ঢাকাইয়া কুট্টি?

জি, খাস ঢাকাইয়া।

ঠিক আছে দোতলার ভি আই পি রুমে নিয়ে আসো, আমি হাতমুখ ধুয়ে নেই।

মেকানিক সিরাজী এসে সালাম দিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিজ্ঞেস করলেন আপনার বাড়ি কোথায়?

সিরাজী বলল নবাবপুরে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বসেন।

শিল্পী খুবই কৃতজ্ঞতার সাথে জড়সড়ো হয়ে বসল। নেত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আওয়ামী গান করেন বুঝি।

মেকানিক শিল্পী বলল, পাকিস্তান আমল থেকেই আওয়ামী গান করি।

এ সময় জননেত্রী শেখ হাসিনা একটিভ মেয়র হানিফকে কথায় টেনে এনে বললেন, আমি নারায়ণগঞ্জ হিসেবে হানিফকে মেয়র বানালাম, আর হানিফ মেয়র হয়েই আমার সাথে বেঈমানী করল। আপনারা হানিফকে ছাড়বেন না। আমি একশকোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে হানিফকে মেয়র বানিয়েছি। আর সেই হানিফ আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে খালেদা জিয়ার আঁচলের তলে ঢুকেছে। প্রতিদিন খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করে, খালেদার কথামতো আমার আন্দোলনে আসে না। বেঈমান বিশ্বাসঘাতক আপনারা কেউই হন তাকে উচিত শিক্ষা দিবেন। ইত্যাদি বলতে বলতে এক পর্যায়ে বটীর মেকানিক শিল্পীকেই আগামী নির্বাচনে হানিফের বিরুদ্ধে মেয়র প্রার্থী করে ফেললেন। তারপরও মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে কথা বলা শেষ হল না। প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেল; কিন্তু কথা শেষ হলো না। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আগেই বলা ছিল যে কোন লোকই আমার কাছে এলে কিছুক্ষণ পরেই তোমরা নানা ধরনের কথা বলে তাকে আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাবে। আমার (শেখ হাসিনা) এত সময় নষ্ট করার নাই যে আমি ঘন্টার পর ঘন্টা একজনকে সামনে নিয়ে বসে থাকব। আবার আমি নিজে তো কাউকে বলতে পারি না এখন যান। কাজেই আমার কাছে কেউ এলে তোমরা তাকে নানা কথা বলে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। নেত্রীর এই কথা মনে করে বটীর মেকানিক শিল্পীকে বলা হল, আপনি উঠেন, নেত্রী রাতের খাওয়া খাবেন।

শিল্পী উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা কথা থামালেন না। শিল্পী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বসল। দ্বিতীয় বার আবার শিল্পীকে বলা হল, আপনি উঠেন নেত্রী রাতের খাবার খাবেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যার মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে কথা শেষ হল না। তিনি বলতেই থাকলেন, মেকানিক শিল্পী আবারও বসে পড়লো। বঙ্গবন্ধু কন্যা মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে অনর্গল হয়ে কথা বলছেন। মিনিট দশেক পরে মেকানিক শিল্পীকে তৃতীয় বার বলা হল আপনি উঠেন নেত্রী ভাত খাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন, আমি খাইছি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্ম উৎসব

১৯৯৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকের এক বিকেলে ধানমন্ডি ৩২ নাম্বারে বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চা খেতে খেতে বললেন, এবার আব্বার জন্ম দিনটা জাঁকজমকভাবে পালন করতে হবে। মূল অনুষ্ঠান টুঙ্গি পাড়ায়

হবে। ঢাকা থেকে অনেক লোকজন নিয়ে যেতে হবে। ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে একটি উপকমিটি করতে হবে। আর তোমরা ওকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। মোট কথা আনন্দ উৎসবের মধ্যে দিনটা জাঁকজমক করে পালন করতে হবে।

১লা মার্চ ১৯৯৬, সন্ধ্যা বেলায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর রোডের আওয়ামী ফাউন্ডেশন অফিসে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মিটিং বসল। মিটিংয়ে ওবায়দুল কাদের (বর্তমান যুব ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী) নেতৃত্বে উপকমিটি করে তিন দিন ব্যাপি কর্মসূচী নেওয়া হল। কর্মসূচীর প্রথম দিন ১৭ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় সকাল ৭টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মাজারে পুস্পমাল্য অর্পনের মাধ্যমে দিনের কর্মসূচী শুরু হবে। ঐ দিনের কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে সকাল ৯টায় শিশু কিশোরদেরকে মিষ্টি বিতরণ। মিষ্টি বিতরণ করবেন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। এরপর বিকেল তিনটায় গোপালগঞ্জ হাই স্কুল মাঠে আলোচনা সভা, আলোচনা সভা শেষে বাড়ি ফেরা। কর্মসূচির ২য় দিনে অর্থাৎ ১৮ই মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সন্ধ্যা সাতটায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবং কর্মসূচীর তৃতীয় দিন ১৯শে মার্চ বিকাল তিনটায় বঙ্গবন্ধু এভিনিউ-এ জনসভা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭৬ তম জন্ম দিনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার একান্ত তত্ত্বাবধানে সকল প্রকার প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এবারের টুঙ্গি পাড়া কর্মসূচীতে একটি নতুনত্ব থাকবে। সেই নতুনত্ব হলো ঢাকা থেকে পাঁচশত যুবক টুঙ্গি পাড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই যুবকদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে ইউনিফর্ম আপাদমস্তক নতুন ফুল হাতা সাদা সার্ট। এই সার্টের পকেটে এমব্রয়ডারি করে লেখা থাকবে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর ৭৬ তম জন্ম উৎসব।"

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে আগত অতিথিদের টুঙ্গি পাড়ায় স্বাগত জানানোর জন্য ১৫ই মার্চ ১৯৯৬ টুঙ্গি পাড়ায় চলে এলেন। ১৬ই মার্চ ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে ঢাকা থেকে যুবকরা এল। যদিও পাঁচ শত যুবক ঢাকা থেকে নিয়ে আসার কথা থাকলেও মোটামুটি দুই/তিনশত যুবক ওবায়দুল কাদের নিয়ে এসেছে। সেই সাথে আরো কিছু অতিথি ঢাকা থেকে এসেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগত সকল অতিথিদের স্বাগত জানালেন। ঢাকা থেকে আগতদের গোপালগঞ্জ সরকারী সার্কিট হাউস, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কোর্ট ও কার্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় তাদের থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হল।

পরদিন ১৭ই মার্চ সকাল ৭টার মধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মাজার ও বাড়িতে সকলে এসে হাজির হল। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিসেফ কর্মকর্তা শ্রী কর্মা পাতুল কুলশ্রেষ্ঠ নামী পরে ক্যাম্পের কাছের গ্রাম তিন শত যুবক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল সোয়া সাতটায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে প্রথমেই পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও অতিথিগণ। এরপর শিশু কিশোরদের পুষ্পস্তবক অর্পণ। কিন্তু একমাত্র মিসেস মতিউর রহমান বেবী (ঢাকা)র একমাত্র কন্যা অর্পিতা ছাড়া অন্য কোন শিশু ঢাকা থেকে আসেনি। আর টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে যে সকল শিশু-কিশোর কিট্টি নেওয়ার জন্য এসেছে, তাদের সকলেরই প্রায় নিরন্ন। অনেক আছে পরীক্ষা এবং আবেদনের পাত্রে হয়ে আছে, অনেক সে সব একটি খোঁজা এবং নিরন্ন যে যা নিরন্ন হয়ে যায়। কাজেই নিরন্ন শিশু কিশোরদের পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে না দিয়ে শিশু-কিশোরদের পক্ষ থেকে একমাত্র সাবেক বীরমুক্তি অর্পিতাকেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মাজারে ফুল দিচ্ছে
মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান বেবী কন্যা অর্পিতা।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিওটা সুন্দর হত

এর পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মদিনের অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দুঃস্থ শিশু-কিশোরদের মাঝে খিচুড়ি বিতরণ। খিচুড়ি বিতরণ করবেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। মাথার ওপরে ৩০/৪০ ফুট দড়ির বাঁধনে শেখ হাসিনার জন্য পর্দাসের যে উঁচান (উঁচান মানে মঞ্চের মতো সাহায্যের খাটি তাহাগা)। এই উঁচানেই দাঁড়িয়ে আছে শ' তিনেক শিশু-কিশোর। এই উঁচানের পাশেই শেখ হাসিনার বসবার জন্য চেয়ার টেবিল রাখা হয়েছে। এই মঞ্চের পাশাপাশিই সব খিচুড়ির ডেগ রাখা হয়েছে। এখানে বড়ুয়া ভেতরে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি ভিডিও করা হচ্ছে।

সকাল সাড়ে দশটায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান-এর আদর্শ বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন চোখে নিয়ে আবেগঘন ভাবে দীন দরিদ্র শিশু-কিশোরদের খিচুড়ি বিতরণ করার জন্য এগিয়ে এলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু একি! অনুষ্ঠানে উপস্থিত এসব শিশু-কিশোরদের সকলেরই গা বস্ত্রহীন। মাঝে মাঝে একআধজন শিশু আবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আর এই অনুষ্ঠানেই, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ধ্বজা থেকে আসা শতশত যুবক সবাই নতুন ঝকঝকে শার্ট পরে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই শার্টের পকেটেই এ্যাপ্লিকে করে লেখা আছে "জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭৬তম জন্ম উৎসব।"

এই কি বিচার? এই কি বিবেক বিবেচনা? এই কি ইনসাফ? জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম উৎসবের এই দিনে, জন্ম উৎসবেই আসা দুঃস্থদের প্রায় সকলেই এই দুঃস্থ-বস্ত্রহীন শিশু-কিশোরদের ভাগ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম উৎসব উপলক্ষেও কি এক টুকরা নতুন কাপড় জুটবে না?

বিবেকের কাছে জবাবদিহি চেনো না। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি এক নবীন নিবেদন এই বলে যে, বিনা দিয়ে তো অসংখ্য শিশু উদোম গায়ে নতুন জামা গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন! কি হত দু'একশ জামা এই বস্ত্রহীন শিশুদের জন্য নিয়ে এলে?

প্রথম দেখাতে মুহূর্তেই মনে হল বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট হবেন। এই সকল দেখাতে তখন বললাম এটিকেই ভিডিওটা সুন্দর হত।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খুশি হয়ে বললেন, হাঁ হাঁ!

ভিডিওটা সুন্দর হতো।

এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এক টুকরো খিচুড়ি পেলেই খুশি হবেন যে শিশু-কিশোরদের মাঝে খিচুড়ি বিতরণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭৬ তম জন্ম উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব শেষ করলেন।

শেখ হাসিনাকে মিথ্যা বলা

[illegible]

[illegible]

[illegible]

আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্তের উল্টো

[illegible]

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলা হয়, আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। দলীয় মনোনীত প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়েছে, তাকে শাস্তি দেওয়া অত্যন্ত জরুরী, কেননা দলকে আর্টিক সংক্রান্ত নির্বাচন। যুবলীগ কর্মী এবং বর্তমানে চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে আগামী নির্বাচনের আগেই আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে প্রার্থী হতে পারে। বিস্তারিত বিষয়টির আলোচনার পর শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে দুর্নীতির অভিযোগে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে দলীয় থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরদিন সকালে শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ সালেহের পুত্র থেকে শেখ জামালের ৫৭ নং বাড়ি ২০/২২ কয়েকজন যুবক শেখ কবিরের ধানমণ্ডি ৫ নম্বরের শেখ হাসিনার বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বলল, আপা তুমি চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে মাফ দিয়ে দলে ফেরত নাও।

শেখ হাসিনা বললেন না, তাকে বহিষ্কার করেছি। শেখ কবির বলল, ও আওয়ামী লীগের (পরাজিত করে) চেয়ারম্যান হয়েছে, ওকে মাফ না দিয়ে বহিষ্কার করায় একটা চুরি (শেখ হাসিনা : কত কি?) জনৈক ওকে আইনের আওতায় না দিয়ে চিঠি পাঠাও।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, বুঝ না আমরা তো আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে বহিষ্কার করেছি।

শেখ কবির বলল, হ্যাঁ জেনেছি ওয়ার্কিং কমিটি। আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির কথা তুমি শুনবে না। ওরা আমাদের কি? জেতার কিছুই করেনি তোমার কাছে দিল। কাজ এখন চিঠি দাও। বড় আপা তুমি চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন পাঠাও। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন তাহলে এর জন্য কমিটি আগে বহিষ্কার করি পরে অভিনন্দন প্রত্যাহার করি।

শেখ কবির বলল তেন, আমি তোমাকে বলছি, এখনই চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন জানিয়ে আর তাকে আইনের চিঠি পাঠাইয়া গলায় মালা দেও।

সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, তাইলে তো একটাই জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) কে বলতে হয়, জিল্লুর আমার পরিবারের চিঠি পাঠিয়ে দেবে। একজন পাঠিয়ে দিয়েছে কিনা কে জানে।

[illegible] [illegible] [illegible] [

পারেন তাহলেই ভোটারদের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন। নইলে তাঁদের আর আওয়ামী লীগকে [illegible] দিতে পারবেন না। [illegible] রাস্তা, [illegible] ছড়িয়ে দিতে পারেন, তবেই একমাত্র যদি জনগণ মুখ দেখেন। [illegible] একটা সুযোগ করে দিয়ে, এখন একটিকে [illegible] লাগানো। মনে রাখবেন এমন অবশ্যই হবে এবং নির্বাচিত [illegible]। আওয়ামী লীগ [illegible] না। [illegible] কোন ব্যাপারেই মুখ খুলবেন না। [illegible]

[illegible] দিনাজপুর [illegible]

এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমের [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যার [illegible] বিদায় দিতে বঙ্গবন্ধু [illegible]। [illegible] দিনাজপুরের [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার [illegible] এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিম [illegible] শেখ হাসিনাকে [illegible] দিনাজপুর-বাসীর [illegible]। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible] দিনাজপুরে এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমের [illegible]। বঙ্গবন্ধু কন্যা [illegible] আপনি [illegible]। [illegible]

অতঃপর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুর ছেড়েছেন। [illegible] দিয়ে এলেন। [illegible] না, [illegible] হয়নি। [illegible]

খাতা কলম গোলা বারুদ ও পিস্তল

১৩ ডিসেম্বর ১৯৯৪ সাল। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে ছাত্রদের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছে। মাত্র কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানেই বি. এন. পির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে নিয়ে ছাত্রদের মহা সমাবেশ করেছেন। ছাত্রদলের এই মহা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বক্তৃতায় বলেছেন বিরোধীদলের মোকাবেলা করার জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট। ছাত্রদলের ঐ মহা সমাবেশের পাল্টা মহা সমাবেশ হিসেবেই বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আজকের এই ছাত্রলীগের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছেন। এবং বেগম খালেদা জিয়ার ঐ বক্তৃতার পাল্টা জবাব হিসেবে শেখ হাসিনা আজ বক্তৃতা করবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিকাল ৪টা ১০ মিনিটে মঞ্চে উঠলেন। আজকের এই ছাত্রলীগের মহা সমাবেশের সবচেয়ে একটি বিশেষ এবং উল্লেখযোগ্য দিক হলো কেবল মাত্র ছাত্রলীগের নেতারা এবং একমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোন আওয়ামী লীগ নেতাকে মঞ্চে উঠতে দেওয়া হলো না। মঞ্চের নিচে সামনে দিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের বসার ব্যবস্থা হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মঞ্চে বসলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা মঞ্চের নিচ থেকে মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দিয়ে আবার মঞ্চের নিচে চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তৃতায় ছাত্রদের খাতা কলম নিয়ে পড়ার টেবিলে ফিরে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানালেন এবং মঞ্চে উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে খাতা কলম তুলে দিলেন। খাতা-কলম তুলে দেবার মুহূর্তে ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক আওয়াজ উঠলো, পরবর্তী দিন দেশের প্রায় সবগুলো জাতীয় ভিত্তিক পত্রিকায় খাতা-কলম তুলে দেওয়ার ছবি ছাপা হল এবং তাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ব্যাপারে শেখ হাসিনার আহ্বানকে অভিনন্দন জানানো হল। কিন্তু তার আগে এই ডিসেম্বর মাসের ১০ তারিখ বিকাল ৩টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরী কক্ষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতা অজয় কর, পঙ্কজ, হিমাংশু দেব নাথ, জ্যোতির্ময় সাহা, বিশ্বজিৎ ভৌমিক এবং আমাকে সহ মোট ৯ জনকে ডেকে এনে আসন্ন আন্দোলনে প্রয়োজন হবে বলে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আগামী ২৮শে ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর তোমরা ঢাকা শহরসহ সারা দেশে পরিস্থিতিহীন অবস্থার সৃষ্টি করবে। খালেদা জিয়ার পতন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ৫/১০টা লাশ অবশ্যই ফেলতে হবে। নইলে খালেদা জিয়ার পতন হবে না। এ জন্য যত টাকা লাগবে তোমরা পাবে। টাকার কোন অভাব হবে না। তোমার গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের হিসাব

মজুদ গড়ে তুলবে। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কৌশল রাখবে না। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ রেড করলে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা আমাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এইসব জিনিসপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিরাপদ জায়গায় রাখবে।

আর একটা দায়িত্ব তোমরা সিরিয়াসলি পালন করবে। সেটা হলো, এই যে কাটিন গার্ডেন রোড এবং ইডেন কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে যে কোয়ার্টারগুলো আছে, সেখানে সব সচিব-উপসচিবদের, আমি (শেখ হাসিনা) হরতাল দিলেও এই সচিব উপ-সচিবরা পায়ে হেঁটে ঠিকই সচিবালয়ে যায়। এরপর যখন আমি হরতাল দেব, তোমরা এদের বাসার কাছে ওঁত পেতে থাকবে, সেক্রেটারিরা (সচিবরা) হেঁটে হেঁটে সেক্রেটারিয়েট যেতে থাকবে পথি মধ্যে তোমরা এদের কাপড় চোপড় খুলে ন্যাংটো করে ফেলবে।

ছাত্রলীগ নেতারা বলল, আমাদের দুই গ্রুপে ভাগ করে দেন। এক গ্রুপ গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের দায়িত্বে থাকি। আর অন্য গ্রুপ সচিবদের উলঙ্গ করার দায়িত্বে থাকুক।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন আলমকে সচিবদের ন্যাংটো করার দায়িত্ব দিলেন।

এরপর অনেক হরতাল যায়। কিন্তু সচিবদের ন্যাংটো করা হয় না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার পক্ষ থেকে সচিবদের কাপড় খুলে উলঙ্গ করার দায়িত্ব প্রাপ্ত আলমকে বারবার তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও যখন সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না, তখন তিনি (শেখ হাসিনা) ঢালাওভাবে যাকে কাছে পান তাকেই সচিবদের ন্যাংটো করার দায়িত্ব দিতে থাকেন। কিন্তু তারপরেও সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভয়ানক রেগে গেলেন। এবং সচিবদের উলঙ্গ করার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত আলমকে নগদ বিশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এই বিশ হাজার টাকা এখন নিয়ে যাও। যদি আরো ত্রিশ হাজার টাকা সচিবদের ন্যাংটা করতে পার দিব। এবার পরের হরতালেই ন্যাংটো করতে হবে। নইলে পুরা টাকা ফেরত দিতে হবে।

ঠিকই পরের হরতালেই আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের সামনে একজনকে উলঙ্গ করে ফেলল, ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই উলঙ্গ করার সফলতার সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুশিতে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য আলমকে ডেকে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু আলম তৎক্ষণে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। তার পরের দিন দেশের সকল সংবাদপত্রে বিরাট শিরোনামে ছবিসহ খবর ছাপা হল। জানা যায়, এই উলঙ্গ বা নির্যাতনের শিকার হওয়া ব্যক্তি একজন সচিব (সেক্রেটারি) নন। তিনি বাংলাদেশের একজন অতি সাধারণ নাগরিক। গোবেচারা পাবলিক।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা

কোন আন্দোলন, কোন সংগ্রামেই কাজ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একতরফা ভাবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারী নতুন পার্লামেন্টের নেত্রী হচ্ছেন এবং ২য় বারের মতো সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন।

প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন, বি. এন. পির পুনরায় সরকার গঠন, এবং খালেদা জিয়ার পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিছুতেই যখন ঠেকানো যাচ্ছে না তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারী ১৯৯৬ সন্ধ্যায় শেখ রেহানার লন্ডনের [illegible] বাড়িতে কর্নেল তারেক সিদ্দিকী (শেখ রেহানার ভাসুর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই সর্বপ্রথম তারেক সিদ্দিকীকে কর্নেল থেকে ব্রিগেডিয়ার পদোন্নতি দেন এবং তার নিজস্ব সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করেন।) এর সাথে গোপনে আলোচনা করেন। এবং তারেক সিদ্দিকীর মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রমকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনা বাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে সামরিক অভ্যুত্থান করে বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নিজের তরফ থেকে এবং তার দল আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে এ ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে সার্বিক নিঃশর্ত সমর্থন ও সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার পূর্ণ আশ্বাস দেন। ১৯৮২ সালে বি. এন. পি সরকার উৎখাত করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদকে যেইভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে ১৯৯৬-এর মধ্য জানুয়ারীতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম বীর বিক্রমকে ক্ষমতা দখল করার জন্য সাহায্য সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু এবার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রস্তাবে সায় না দিয়ে উপরন্তু বলে পাঠালেন, আমি পেশাদার সৈনিক। পেশাদার সৈনিককে পেশাদার সৈনিকই থাকা উচিত। এছাড়া দেশে বর্তমানে যা চলছে তা রাজনৈতিক সংকট। রাজনীতিবিদদেরই এই রাজনৈতিক সংকট রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা ও নিরসন করতে হবে। সেনাবাহিনী এই সংকটে জড়িত হয়ে নতুন সংকট সৃষ্টি করবে না।

এরপরে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একেবারে হতাশ হয়ে এই দেশে আর থাকা যাবে না বলে মন্তব্য করেন।

পুলিশের জামা চাই, মিলিটারীর জামা চাই

আজ ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। সকাল ৯টা। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর-এ তাঁর নিজ বাসভবনের দ্বিতীয় তলায় ভি, আই, পি ড্রইং রুমে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, কারামুক্তদের শহীদ ওসমান (বর্তমানে আওয়ামী লীগ এম, পি) স্বপন ভদ্র, পঙ্কজ, নিজামুল মাহা, দিপঙ্কর, অসিম, মাহফুজ সাদেক সহ মোট এগারো (১১) জনকে নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ খুবই জরুরী এবং খুবই গোপন বৈঠকে বসেছেন। আসছে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একতরফাভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নেমেছেন। জীবন-মরণ লড়াই। আজ বিকেলে ঐতিহাসিক পল্টনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সমাবেশ এবং এই সমাবেশ থেকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার পদত্যাগ অভিমুখে মিছিল হবে। এই সমাবেশ ও মিছিলকে নিয়েই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত জরুরী, অত্যন্ত গোপনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও কর্মসূচী দেওয়ার জন্যই এই বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে খুবই চিন্তিত ও মলিন দেখাচ্ছে। কেউ কোন কথা বলছে না। তিনিও কোন কথা বলছেন না। সবাই চুপ করে বসে আছে। তবে মনে হল, বুকে পরাজিত বাসনারা বাসা আর তার বৈশিষ্ট্যতা মনে আছে। হঠাৎ আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ আমার একটি ভাইও বেঁচে নেই। যদি একটি ভাইও বেঁচে থাকত তাহলে, আমি যে নির্দেশ দিতাম, যে কর্মসূচী দিতাম তা অবশ্যই পালন হত। তোমরা কি আমার ভাই হতে পার না? আমি তো তোমাদের ভাই-ই মনে করি। তোমাদের মাঝেই আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইদের খুঁজে পেতে চাই। কিন্তু তোমরা কি আমাকে বোন মনে কর? যদি তোমরা আমাকে বোন মনে কর, আর যদি সত্যি সত্যিই তোমরা আমার হারিয়ে যাওয়া ভাই হও। তাহলে এই শপথ নিবে, কঠিন কর্মসূচি পালন করার জন্য প্রস্তুত হও।

সবাইকেই আমার সাথে শপথ নেও, বলেই উপস্থিত সকলকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শপথ করালেন এবং উপস্থিত সকলেই শপথ নিল। শেখ হাসিনা শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন— "আমরা শপথ নিচ্ছি যে, যে কোন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করব। এবং আমরা আরো শপথ করছি যে, আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার যে কোন ধরনের নির্দেশ তা যত কঠিনই হোক না কেন জীবন দিয়ে পালন করবো।"

বলেই যখন শেষ হলো, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আমরা আজ দশ (১০)টি পুলিশের লাশ চাই। ৫ (পাঁচ)টি বিডিআরের লাশ চাই।

পুলিশের লাশ চাওয়া বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নতুন কিছু নয়। অতীতে বহুবার তিনি পুলিশের লাশ চেয়েছেন। কিন্তু আজকের মতো এত আনুষ্ঠানিকভাবে এতো নাটকীয়তা করে অতীতে কখনও তিনি পুলিশের লাশ চাননি। অতীতে তিনি (শেখ হাসিনা) মাঝে মধ্যেই বলতেন, পুলিশের লাশ চাই। পুলিশের লাশ চাই। কিন্তু কাউকে নির্দিষ্ট করে বলতেন না। খুব কড়া করেও বলতেন না। শুধুই বিড়বিড় করে কথাগুলো বলতে থাকতেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিড়বিড় করে পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই বলতে থাকলেও কেউ তা শুনত না তা নয়। উপস্থিত সকলেই তা শুনত। কিন্তু কেউই তা গুরুত্ব দিত না এবং পালন করত না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা 'পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই' কথাগুলো হাওয়ার উপর ছেড়ে দিতেন। আর উপস্থিত সকলেই তার (শেখ হাসিনার) সাথে হাওয়াতেই কথাগুলো মিলিয়ে যেতে দিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মন থেকেই এমন কিছু ঘটানোর জন্যই কথাগুলো বলতেন। অথচ কেউই শেখ হাসিনার কথা পালন করত না। পুলিশের লাশ ফেলত না। আর সেই জন্যই আজ ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ এত আনুষ্ঠানিকতা আর এত আবেগময় পরিবেশে শপথের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১০টা পুলিশের আর ৫টা বিডিআরের (লেফটেনেন্টদের) লাশ চাইলেন। একটা ব্রিফকেইস হাতে করে প্রবেশ করলো শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই (আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের ছেলে) আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ (বর্তমান জাতীয় সংসদের সরকারী দলের চিফ হুইপ)। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ব্রিফকেইস খুলে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার নোট ১০টা বান্ডিল অর্থাৎ ৫ লাখ টাকা তাকে দিয়ে বললেন, এই নাও, যাও কর্মসূচী বাস্তবায়িত কর।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৫ নাম্বারের বাসা থেকে রওয়ানা হয়ে বিকেল ৩-৩০মিনিটে পল্টনের সমাবেশের মঞ্চে উঠলেন। সমাবেশে হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়েছে। কিছু ছোট কম নেতার বক্তৃতা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বক্তৃতা দিতে উঠলেন। বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বললেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বাসভবনে মিছিল নিয়ে যাব। আপনারা সকলেই মিছিলে অংশ নিবেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা যেই একথা বললেন আর অমনিই চতুর্দিক থেকে বোমা পটকা, গুলি শুরু হল। মুহূর্তের মধ্যে সমবেত জনতা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কে কোথায় গেল তার হদিস পাওয়া গেল না। সমাবেশ স্থল ফাঁকা শূন্য হয়ে গেল। বক্তব্য নেতারা পড়ি কি মরি করে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে পালাতে

লাগল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে অতি কষ্টে মঞ্চ থেকে নামিয়ে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে নিয়ে যাওয়া হল। পালানোর প্রতিযোগিতায় কেউবা কেউ কারো চেয়ে কম গেলেন না। এমন কি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মঞ্চের সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেরী হচ্ছিল এই অবস্থায় পিছন পথে যাওয়া এক নেতা (বর্তমানে মন্ত্রী) তাকে (শেখ হাসিনাকে) ধাক্কা মেরে নিচে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়।

সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পদত্যাগ অভিমুখে মিছিল কর্মসূচী ব্যর্থ হয়। পরে গোলাগুলির কারণে পুলিশ সোনারগাঁ রোড, পান্থপথ, গ্রীনরোড ইত্যাদি থেকে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিলে, সন্ত্রাসীগণ রোডে যানজটে আটকে পড়া বি, আর, টি, সির দুইটি দোতলা বাস, তিনটি ট্রাক, তিনটি পিকআপ গাড়ি, পাঁচটি প্রাইভেট কার, চারটি বেবী ট্যাক্সি (স্কুটার) ইত্যাদিতে এবং ধানমন্ডি মসজিদের সামনে অবস্থিত পেট্রোল পাম্পে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে বঙ্গবন্ধু ভবনের স্টাফ (কর্মচারী) দিয়ে আগুন লাগিয়ে প্রতিশোধ হিসেবে জ্বালিয়ে দেওয়া হল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ধানমন্ডি মসজিদের সামনে নিজ হাতে একটি স্কুটারে (বেবী ট্যাক্সি) আগুন লাগিয়ে দিলেন।

বেঈমানটা আমাদেরই

যেমন খালেদা জিয়ার দল বি, এন, পি ১৫ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের দিন ভোট কেন্দ্রে ভোটার উপস্থিত করতে না পারায় একদিন পর্যন্ত বি, এন, পির পক্ষে বহু রাজনৈতিক মহল, প্রশাসন ও অন্যান্যরা এখন প্রকাশ্যেই বি, এন, পির বিরোধীতা শুরু করে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ১৯৯৬। দুপুর প্রায় ৩টা। ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার ৫৪ নম্বরের বাড়ির উপরের তলার ৮৬৮৭৭৯ টেলিফোনটি বেজে উঠে। ফোনটি রিসিভ করে হ্যালো বলতেই, ফোনের অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল হ্যালো, আমি হানিফ, হানিফ।

কোন্ হানিফ?

আমি নগরের সভাপতি হানিফ, ঢাকার মেয়র।

আস্সালামু আলাইকুম হানিফ ভাই, আপনি?

হ্যাঁ আমি।

আপনি কে?

আমি ......।

ও ভাল থাকো ভাইয়া। ঠিক আছে। আমি একটু নেত্রীর সাথে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম। কথাবার্তা বলতে পারি নাই, তাই এখন একটু বলতে চাই। নেত্রীকে একটু দেওয়া যায়?

জী থাকেন, দেখছি নেত্রী কোথায়।

বঙ্গবন্ধু কন্যা তখন বেসিনে হাত ধুচ্ছিলেন। বলা হল আপা মেয়র ফোন করেছে।

নেত্রী হাত মুছতে মুছতে ফোনের দিকে হেঁটে আসতে আসতে বললেন, মহিউদ্দিন ভাই তো (চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র)!

না, ঢাকার মেয়র।

অমনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা থমকে গিয়ে অবাক মনেই বলে উঠলেন, (লেংটিমানটা)! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। গভীর মনে কিছু একটা ভাবলেন। মনে হয় ফোন ধরবেন কি ধরবেন না চিন্তা করলেন। তারপর ধীর পায়ে এগিয়ে এলেন। ফোনটা ধরলেন, হ্যালো। না না এখানে না, এখানে না। বত্রিশে আসেন (বত্রিশ মানে ধানমন্ডি বত্রিশ নাম্বারে বঙ্গবন্ধু ভবনে) পবিত্র জায়গায় আসেন। পবিত্র জায়গায় বসেই আলোচনা করি।

হ্যাঁ এক্ষুনি আসেন, হ্যাঁ, আপনি না আসা পর্যন্ত আমি আছি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা টেলিফোনটি রেখে দিয়ে বললেন, চল চল বত্রিশে যাই। লেংটিমানটা আসতেছে। চল বত্রিশে যাই।

সবাই মিলে ধানমন্ডি বত্রিশে বঙ্গবন্ধু ভবনে যাওয়া হল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু ভবনের গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে পায়চারী করতে লাগলেন আর ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিনিট দিনেক পরেই বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা লাগানো জীপ গাড়িতে করে ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র হানিফ ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের সামনে এসে পৌঁছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এগিয়ে গিয়ে নিজ হাতে মেয়র হানিফের জীপের দরজা খুললেন, আর বলতে লাগলেন, এই যে আমাদের নতুন এল, জি, আর, ডি মিনিস্টার। এল, জি, আর, ডি মিনিস্ট্রি ছাড়া কি ঢাকার মেয়র চলতে পারে? এল, জি, আর, ডি মিনিস্ট্রি তো আপনার। আপনিই তো এল, জি, আর, ডি মিনিস্টার। এই কথা বলতে বলতেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মেয়র হানিফকে জীপ গাড়ি থেকে নামিয়ে এনে, উপস্থিত সকলের সামনে মেয়র হানিফকে দেখিয়ে এই যে আমাদের নতুন এল, জি, আর, ডি মিনিস্টার বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মুখে এই কথা শুনে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ লুটিয়ে অবনত মস্তকে হাত কচলে বললেন, নেত্রী যা বলেন, নেত্রী যা বলেন।

নায়ক, মন্ত্রী ও জনতার মঞ্চ

তারপর মোহাম্মদ হানিফকে বঙ্গবন্ধু ভবনের অফিস কক্ষে এনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এই মিষ্টি আনো, মিষ্টি আনো, হানিফ ভাইকে মিষ্টি খাওয়াও।

মিষ্টি খেতে খেতে বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বঙ্গবন্ধু ছিলেন মহানায়ক, আর আপনি হলেন নায়ক। নায়ক না হলে কি চলে? সারা দেশ, সারা জাতি এখন তাকিয়ে আছে নায়কের দিকে। মানে আপনার দিকে। সবাই তাকিয়ে আছে আপনার দিকে। আমি এই পর্যন্ত এসে গিয়েছি, এখন আপনি ফিনিশিং দেন। এখন আপনার পালা। আপনি নায়ক, আপনার হাতেই সব। আমার হাতে আর কিছু নেই। আমার যা ছিল সব আমি করেছি। আপনি যেমন আপনিই নায়ক, এখন আপনি ফিনিশিং শেষ করবেন। আপনি ছাড়া ফিনিশিং হবে না। আপনার হাতেই ফিনিশিং হবে বলেই খেলা এখনও বাকি আছে।

আপনারাই তো বঙ্গবন্ধুকে শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু বানিয়েছেন। আপনারা যদি সেদিন আমার পিতাকে আশ্রয় না দিতেন, সাহায্য সহযোগিতা না করতেন তাহলে কি আমার পিতা শেখ মুজিব থেকে জাতির পিতা হতে পারতেন? এই আপনারা ঢাকার মানুষেরা বানিয়েছেন। আজ আমি তার মেয়ে, আমাকে যদি আপনি সাহায্য না করেন আমি কি করে বড় হবো? আমার ভাইয়েরা কেউ বেঁচে নেই। আপনিই আমার ভাই। আমি আপনার বোন। আমাকে আপনি সহযোগিতা করুন। আমি কখনোই আপনার কথা ভুলব না। আপনাকে ভুলা চলবে না।

ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বললেন, হ্যাঁ নেত্রী, আমাকে এক মাস সময় দেন, আমি খালেদা জিয়াকে ফেলে দিব।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না, না, একমাস সময় দেওয়া যাবে না। আপনি পনের দিনের মধ্যেই ফেলে দেন।

এই বৈঠকেই ঠিক হল প্রেসক্লাবের সামনে স্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে এখান থেকেই যতক্ষণ বেগম খালেদা জিয়ার পতন না হয়, দিন রাত ২৪ ঘন্টা স্থায়ী ভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার। পরবর্তী সময়ে নাট্যশিল্পী ও টিভির সংবাদ পাঠক রামেন্দু মজুমদার ও নাট্যশিল্পী পীযূষ বন্দোপাধ্যায় এই মঞ্চের নাম দেন জনতার মঞ্চ।

প্রেসক্লাবের সামনের এবং সচিবালয়ের উত্তরের তোপখানা রোডের পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত অর্থাৎ পল্টনের মোড় থেকে হাইকোর্ট পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাস্তার মাঝখানে বিশাল মঞ্চ তৈরী করে প্রতিদিন চলতে থাকলো গান বাজনা, বক্তৃতা, আবৃত্তি ইত্যাদি। এক পর্যায়ে এই মঞ্চে এসে যোগ দিল সচিবালয়ের কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী। এই সবই চলতে থাকল ঢাকার মেয়র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ভাষায় নায়ক ও আওয়ামী লীগের এল, জি, আর, ডি মন্ত্রী মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে।

আজ পিকনিক

এদিকে আন্তর্জাতিক সারা দেশসমূহের চাপে বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে বেগম খালেদা জিয়া তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দেওয়ার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করার জন্য ১৫ই ফেব্রুয়ারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাবিহীন নির্বাচনে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একদিনের জন্য ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডাকলেন। পঁচিশে (২৫) মার্চ '৯৬ সকাল দশটায় একদিনের জন্য বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সংবিধান সংশোধনের লক্ষ্যে ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ-অধিবেশন বসল। এই ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নতুন নির্বাচন দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন করার কাজ করেছে। সকাল দশটায় বেগম খালেদা জিয়া সংসদ অধিবেশনে যোগদেন। গভীর রাতে শেষ হওয়া পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া সংসদ অধিবেশনেই ছিলেন।

তারপর দিন ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। সকাল পৌঁনে সাতটায় ধানমন্ডি ৫ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের জন্য রওয়ানা হলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা (লেখকসহ আগে সহকারী সাব মোহন দাস-এর সাথে চোখাচোখি হওয়া) তার গাড়ি চালকের নির্দেশ দেওয়ার পর জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাওয়ার সময় ধানমন্ডি থেকে বসে দেখলেন, গোলাপি (খালেদা জিয়া) এখনও সংসদে বসে রয়েছে। সেটি (খালেদা জিয়া) সংসদে এমন কোন কাজ কি যে তুই এখনো সংসদে বসে রইলি?

সঙ্গের সাথী একজন বলল, রূপ দেখাতে বসে রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, গতকাল সকাল থেকে সারা দিন সারা রাত সংসদে বসে রূপ দেখিয়ে ও কি গোলাপির (খালেদা জিয়া) শখান ভরে নাই যে, আজ সকাল পর্যন্তও রূপ দেখাতে গোলাপি সংসদে বসে রয়েছে। সংসদে গোলাপির এতক্ষণ কি কাম! সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের সংশোধনী আনতে আবার ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে নাকি যে গোলাপি এখনো সংসদে বসে রয়েছে!

জাতীয় স্মৃতিসৌধে গিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ গোলাপি (প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া) যে এখনও আসে নাই, আজ আমিই প্রথম আসা লোক। স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক দেওয়ার পর ঢাকার দিকে না এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সাভার থেকে কালিয়াকৈর গাজীপুরের রাস্তা ধরে যেতে থাকলেন। সফর বাড়ীর কাছাকাছি যেয়ে বিরাট বড় এলাকা জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় ঢুকলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। বেশ কিছু গাছের মাঝে ছোট একটি বাংলো টাইপের ঘর। এই ঘরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসলেন এবং বললেন, এই গাড়ী থেকে বিরানি নামাও, আজ পিকনিক। আজ সারাদিন এখানেই কাটাব। আজ পিকনিক।

পুরাতন ঢাকার নাজী আলাউদ্দিন রোডের হাজীর বিরানির দোকানে বিরানির অর্ডার পর আগেই দেওয়া ছিল। সকাল থেকে পুলিশের ... মাইক্রোবাসে করে বিরানী, রুটি, ডাল ইত্যাদি নিয়ে আসা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে মাইক্রোবাস থেকে তা নামানো হল। খাওয়া হল। প্রচুর হাসাহাসি হল। খোদাপি (খালেদা জিয়া) এখনো পার্লামেন্টে বসে রয়েছে। আজকাল-খাবারদার খোদাপি পার্লামেন্টে বসে বসে কল খেলিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের মুখোমুখি বৈঠক

বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে, সপ্তম সংসদ একদিনের অধিবেশনে মিলিত হয়ে, সংবিধান সংশোধন করে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের বিধান করে, সপ্তম সংসদ বিলুপ্ত বা বাতিল ঘোষণা করা। এবং আগামী ১২ই জুন ১৯৯৬ ইংরেজিতে সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর তারিখ ঘোষণা করল। এবং সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে প্রধান করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হল।

সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান (এরশাদ আমলের) অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল নুরুদ্দিন খান (বর্তমানে শেখ হাসিনার মন্ত্রী) এবং অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল সালাম (বর্তমানে আওয়ামী লীগ এম পি ও রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান) এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম- এর সাথে আলোচনার প্রস্তাব পাঠান। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ঐ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে নাট্যশিল্পী খুরশিদা মাহমুদ লাকী (বর্তমানে আমেরিকা নিবাসী) ও তার স্বামী অবসরপ্রাপ্ত মেজর নাসির সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিমের সাথে শেখ হাসিনার বৈঠকের আয়োজন করে। নাট্যশিল্পী লাকী ও তার স্বামী মেজর (অবঃ) নাসির বনানীর ছুলমুর ভিলা, ১১৭ বনানী ব্লক-ই রোড ৪-এর বাসভবনে নির্ধারিত ও অন্য জনদের অজান্তে বাসায় শেখ হাসিনা এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের মুখোমুখি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগামী ১২ই জুনের নির্বাচনে সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম এবং তার সৈনিকদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জবাবে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম শেখ হাসিনাকে সার্বিক সাহায্য সহযোগীতার পূর্ণ আশ্বাস দিয়ে বলেন, আপনি (শেখ হাসিনা) চাইলে এখন থেকে সেনাবাহিনী আপনার নির্দেশেই চলবে।

এর জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, এটা যদি সত্যি হয় তবে ভবিষ্যতে আমিও আপনার নির্দেশেই চলব।

এই বৈঠকের পর থেকে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাহবু বের মোতাবেক শান্তির নীতি বিক্রম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পরামর্শ ও নির্দেশেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে থাকেন।

হিন্দুরা নৌকায় ভোট দেয়

১৯৯৬-এর ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল প্রার্থী মনোনয়ন দিল। আওয়ামী লীগও মনোনয়ন দিল। গোপালগঞ্জের তিনটি আসন এবং বাগের হাটের দুইটি আসনের মোট ভোটারের প্রায় শতকরা পঁচাশি ভাগ ভোটার হিন্দু সম্প্রদায় হওয়ায় স্বাভাবিক কারণেই এই পাঁচটি আসনে আওয়ামী লীগ এর নৌকামার্কা প্রার্থী ছাড়া অন্য কোন দলের অন্য কোন মার্কার প্রার্থীর নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নেই। এবং কোনকালেই বিজয়ী হয়নি এবং হবেও না। (১) মোকসেদপুর ও কাশিয়ানী, (২) গোপালগঞ্জ ও কাশিয়ানী (৩) টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া (৪) মোল্লার হাট ও ফকিরের হাট (৫) চিতলমারী ও বাকোপ এই ৫টি (পাঁচ) আসনে যত দিন পর্যন্ত পঁচাশি শতাংশ হিন্দু সম্প্রদায় থাকবে ততদিন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রার্থী নৌকা মার্কায় একচেটিয়া ভাবে বিজয়ী হতে থাকবে। এই পাঁচটি আসনের প্রার্থীদের আলাদা কোন কষ্ট করতে হয় না। যে কোন প্রকারেই হোক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কা নির্দিষ্ট দিলেই সে যে কেউই হোক ৯০% ভোটে বিজয়ী হবে। এই ৫ টি আসনকে বলা হয় হিন্দুর আসন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দয়া করে যাকে এই অঞ্চলের আসন টিকেট দিবেন, তিনিই এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি বা জাতীয় সংসদ সদস্য। অর্থাৎ এম, পি। এই অঞ্চলের গোপালগঞ্জ আর অঞ্চলে একজন প্রবীণ বৃদ্ধ হিন্দু লোককে কেন আওয়ামী লীগকে ভোট দেন জানতে চাইলে, ঐ প্রবীণ বৃদ্ধ হিন্দু লোকটি বলেন, আমরা আওয়ামী লীগ টিগ বুঝি না। আওয়ামী লীগকে ভোটও দেই না। আমরা ভোট দেই নৌকায়। অর্থাৎ নৌকা মার্কায় ভোট দেই।

নৌকা মার্কায় কেন ভোট দেন জানতে চাইলে, তিনি বলেন বাবু, নৌকায় ভোট দিব না? নৌকা যে দেবীর বাহন। মা দুর্গা দেবী এই বাহনে (নৌকা) চেড়েই স্বর্গ থেকে মর্ত্যে এসেছিলেন, অসুর (পাপিষ্ঠ) কে দমন করার জন্য। আর আমরা যদি মা দুর্গার বাহন নৌকায় ভোট না দেই, তাইলে দেবীর বাহনের অমর্যাদা হবে। মা দুর্গা অভিসম্পাত দিবে। এই জন্য দেখেন না, ভোটের সময় আমরা সকলেই গিয়া, মা দুর্গা দেবীকে খুশি করার জন্য মা দুর্গা, মা দুর্গা বলে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়া আসি। একজনও বাদ পড়ি না। সকলে গিয়া নৌকা মার্কায় ভোট না দিলে মা দুর্গা অসন্তুষ্ট হবে। আমাদের অমঙ্গল হবে। তাই যত কাজ কাম থাকুক, যত ঝামেলাই থাকুক, কোন রকমে শুধু ভোট কেন্দ্রে যেতে পারলেই হলো। আমরা সকলেই গিয়া নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আসবো।

এই অঞ্চলের ৫টি আসনের ৪টি আসনে বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা স্বয়ং। অন্য ১টি আসনে শেখ হাসিনার ফুফাতো ভাই শেখ সেলিম। এবং মোকসেদপুর-কাশিয়ানীর অপর আসনটিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মনোনয়ন দিয়েছেন। নিজের বোনকেই যেন লড়তে দিয়েছেন।

মতিয়ুর রহমান রেন্টুকে কথা দিয়েছেন তার পিতাকে, আর তার পিতাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তোমাকেই আমি (শেখ হাসিনা) মোকসেদপুর কাশিয়ানীর এম. পি বানাব। মতিয়ুর রহমান রেন্টুর স্ত্রী মাহমুদাকেও বহুবার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলেছেন, তোমরা আমাদের জন্য যা করেছো এবং যা করছো, তার ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না। তোমাদের কথা কোন দিন ভুলা যাবে না। তবে রেন্টুকে (মতিয়ুর রহমান রেন্টু) আমি মোকসেদপুর কাশিয়ানীর এম. পি বানাব।

কিন্তু না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কথা রাখলেন না। কথা রাখলেন না। কথা দিয়েও তিনি (বঙ্গবন্ধু কন্যা) কথা রক্ষা করলেন না। এমনো করে জনগণের মনোক্ষোভ করলেন। ওয়াদা ভঙ্গ করলেন। যদিও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বক্তৃতায় অনর্গলভাবে কোন কিছুর উল্লেখ বলেছেন, ওয়াদা ভঙ্গকারীকে আল্লাহ পছন্দ করে না। শুধু মতিয়ুর রহমান রেন্টু কেন? বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মনোনয়ন দিলেন না, সাবেক ছাত্র নেতা, ত্যাগী এবং যুব নেতা ইসমত কাদির গামা, আব্দুল হান্নান, মুকুল বোস এদের কাউকেই তিনি মোকসেদপুর কাশিয়ানী থেকে মনোনয়ন দিলেন না। তিনি মনোনয়ন দিলেন এমন একজনকে যার বিরুদ্ধে সশস্ত্র রাজাকারীর অভিযোগ আছে। অভিযোগ আছে, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফারুক ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনীর যোগসাজশে সশস্ত্র রাজাকার হয়েছিল। তাদের বাড়িতে রাজাকারদের ক্যাম্প বানিয়েছিল। এবং ঐ অঞ্চলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দিয়ে অনেক বাড়ী ঘর জ্বালিয়েছিল। তিনি (লেঃ কর্নেল ফারুক) প্রয়াত মুসলীম লীগ নেতা আলাম খানের পুত্র সম্পর্কে ভাতিজা। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি মুক্তিবাহিনীর ভয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়ে যান। পরবর্তী কোন এক সময়ে সম্ভবত '৭৫/'৭৬ সালে যশোর থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। ২০/২৫ বছর সেনাবাহিনীতে চাকরী করে কেবলমাত্র এরশাদের সাথে খাতির করে লাভজনক পোস্টিং নিয়ে প্রচুর টাকা পয়সা কামান। মতিয়ুর রহমান রেন্টু, ইসমত কাদির গামা, আব্দুল হান্নান, মুকুল বোস এরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা। এই মুক্তিযোদ্ধা ও ত্যাগী নেতাদের বাদ দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মোকসেদপুর - কাশিয়ানী থেকে মনোনয়ন দিলেন '৭১-এর রাজাকার এল.পি.আর-এ যাওয়া

এবং কর্নেল ফারুক শাহেদ। কিন্তু সেনা সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক অস্থায় অন-পদে উপাধিত হয়ে থেকে লেঃ কর্নেল ফারুক খান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এক কোটি টাকা দেন। এবং এই দান এক কোটি টাকার বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জ কাশিয়ানী আসনটি এম পি আর-এ আসা লেঃ কর্নেল ফারুক খানের কাছে বিক্রি করেন।

হিন্দুরাই আমার বলভরসা

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রেসিডেন্ট জাতীয় নির্বাচনে মনোনয়ন ঘোষণা করলেন, প্রেসিডেন্ট নিজে মোট ৪টি আসন থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দেন। গোপালগঞ্জের ১টি, বাগেরহাটের ২টি এবং ঢাকার তেজগাঁও থেকে ১টি। এই মোট ৪টি আসন থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিজে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দেন। কিন্তু ঘোষণা দেওয়ার পরের দিনই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঢাকার তেজগাঁও আসন থেকে তার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করে নিলে, ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের নেতৃত্বে কয়েকজন নেতা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করে বলেন, আপনি গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাটের (টুঙ্গিপাড়া মধুমতি নদীর এপারওপার) ৩টি আসন থেকে দাঁড়াচ্ছেন অথচ ঢাকার একটি আসন থেকেও নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন না। ৩টি আসন থেকে তো আপনি দাঁড়াতে পারেনই। খালেদা জিয়া ৫টি আসন থেকে দাঁড়িয়েছে; আপনিও ৫টি আসন থেকে দাঁড়ান। আপনি ঢাকার নেত্রী, আপনি অন্তত ঢাকার ২টি আসন থেকে নির্বাচন করুন।

জবাবে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাটে তো ৭০% (সত্তর শতাংশ) হিন্দু আছে; ঢাকায় কত পার্সেন্ট হিন্দু আছে? হিন্দুরা ছাড়া মুসলমানেরা আমাকে ভোট দেয় না। মুসলমানেরা বেঈমান ও অকৃতজ্ঞ। হিন্দুরা ঈমানদার এবং কৃতজ্ঞ। আমি হিন্দুদের উপর ভরসা করতে পারি, বিশ্বাস রাখতে পারি। কিন্তু মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় না। ভরসা করা যায় না। এই জন্যই তো আমি সত্তর শতাংশ হিন্দুদের এলাকা গোপালগঞ্জ আর বাগেরহাট থেকে ৩টি (তিন) আসনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু ঢাকা থেকে ১টি(এক) আসনেও দাঁড়াইনি। যা ও তেজগাঁ থেকে দাঁড়িয়েছিলাম খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম, তেজগাঁও তেমন হিন্দু নাই, তাই প্রত্যাহার করে নিয়েছি। ঢাকার মেয়র হানিফ বললেন, এটা আপনার ভুল ধারণা। মুসলমানেরা ভোট না দিলে আপনার অন্যান্য প্রার্থীরা জিতে কিভাবে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, মূলতঃ হিন্দুদের ব্যাপক ভোটটা পুরাটা পায়, বাকী প্রার্থীরা জনগণ কিভাবে লোকজন দিয়ে ভোটের ঘাটতি পুষিয়ে কোন রকমে জিতিয়া আসে। হিন্দুরা না থাকলে আমি, আমার দল ১টি(এক) আসনেও জিততে

পারবেন না। হিন্দুরা যাতে নিরাপদে নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারে এই জন্যই তো আমি এই আন্দোলন সংগ্রাম করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আদায় করেছি। হিন্দুরাই আমার বল। হিন্দুরাই আমার ভরসা।

নির্বাচনী প্রচারের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। সারা দেশ পোস্টার, ফেস্টুন, তোরণ, ব্যানারে এবং দেয়াল লিখনে ছেয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু খালি জায়গা নেই। প্রতিদিন-প্রতিরাতে চলছে মিটিং আর মিছিল।

সেনা নায়কের বিদ্রোহ নিয়ে চক্রান্ত

১৯৯৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে কণ্ঠশিল্পী সুকন্ঠ সাহার পত্রের মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, ২৫ মার্চ '৯৬ সালে পার্লামেন্ট ২৪ ঘণ্টার বেশি বিরতিহীন অধিবেশনে সংবিধান এর যে সংশোধনী পাশ করেছে তাতে রাষ্ট্রপতির হাতে সেনাবাহিনীর সকল কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর সকল কর্তৃত্ব বি. এন. পির বর্তমান রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে দেওয়া হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কাছে এবং সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের কাছে সেনাবাহিনীর কোন কর্তৃত্বই নেই। এই সংবাদ শোনার পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ও, এই জন্যই খালেদা জিয়া দিন-রাত পার্লামেন্টে বসেছিল। খালেদা জিয়া ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে সংসদ অধিবেশনকে ধরে রেখে এই দুর্নীতিই করেছে। আমি তো আগে বুঝিনি, আগে চিন্তা করিনি।

এরপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা উত্তেজিত হয়ে বললেন, কিসের সংবিধান? কিসের সংশোধনী? আমি যা বলব জেনারেল নাসিমকে তাই করতে হবে। জেনারেল নাসিম আমাকে কথা দিয়েছে, আমি যা বলবো, আমি যে নির্দেশ দিব নাসিম সেই অনুযায়ী সেনাবাহিনী চালাবে। বাবা (সুকন্ঠ সাহার বাবা) তুমি যাও, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে বলো আমি যেভাবে বলবো, যা বলবো সে যেন সেভাবেই তা করে। বাকি সব দায়দায়িত্ব আমার, আমিই বুঝবো। সংবিধান অনুযায়ী সেনাবাহিনীর পুরো কর্তৃত্ব ও দায়দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের। কিন্তু সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম তার বিপরীত প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে সেনাবাহিনী পরিচালনা করতে লাগলেন। দ্বৈত নির্দেশনার কারণে ক্রমেই সেনাবাহিনীতে সংকট সৃষ্টি হলো। রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস সেনা কর্মকর্তাদের কোন নির্দেশ দিলে, সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে তার বিপরীত নির্দেশ দিতে লাগলেন। এমনকি রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাস কোন সেনা কর্মকর্তাকে বদলীর নির্দেশ দিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্দেশে জেনারেল নাসিম পাল্টা

তদানীন্তন নির্দেশ বিঘ্ন সৃষ্টি করলেন। সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরে সংকট আরো ঘনীভূত হয়ে সংঘাতের দিকে যেতে লাগলো। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৮ই মে '৯৬ বগুড়া সেনানিবাসের (ক্যান্টনমেন্ট) জি ও সি মেজর জেনারেল গোলাম হেলাল মোরশেদ খান বি বি পি এস জি এবং বি, ডি আর এর ডি-ডাইরেক্টর জেনারেল ব্রিগেডিয়ার মিরণ হামিদুর রহমানকে অকালীন (বাধ্যতামূলক) অবসর দান করেন। [এই অবসর দেওয়া উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এর আত্মীয়] পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ৪ জন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে অবসর দেওয়ার নির্দেশ দিলে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম (শেখ হাসিনার নির্দেশমত) মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মতিন, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূঁইয়া, ব্রিগেডিয়ার আবুল কাসেম ও কর্ণেল আব্দুল সালাম এই ৪ জন উর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তাকে অবসরের নির্দেশ দেন। ফলে সংঘাত চরম আকার ধারণ করে সশস্ত্র বাহিনী আওয়ামী লীগের হাতে চলে গেলো। সাংবিধানিক ভাবে সেনাবাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে অবসর দানের সিদ্ধান্ত নিলে, ১৯শে মে '৯৬ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমকে তার (নাসিমের) সমর্থনে সারা দেশ থেকে ঢাকায় সেনাবাহিনী মার্চ করানোর (নিয়ে আসার) নির্দেশ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার এই নির্দেশ পাওয়ার পর সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম ১৯শে মে দিবাগত রাত ২টার পর (ঘড়ির কাটা অনুযায়ী ২০শে মে রাত ২টা) ঢাকার বাইরের সমস্ত সেনা ইউনিটকে তার সমর্থনে ঢাকায় মার্চ (চলে আসার) করার নির্দেশ দেন।

এর কয়েক ঘন্টা পরে ২০শে মে সকাল ৮টায় প্রেসিডেন্ট বিশ্বাস আবারো দেশের জনগণ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে অবহিত না করে ভূঁইয়ার কমান্ডারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করেন। অন্যদিকে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমের নির্দেশ পেয়ে কুমিল্লা, বগুড়া, যশোর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনী ঢাকার দিকে রওয়ানা হয়। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিম এর নির্দেশে এবং সমর্থনে ঢাকার বাহির থেকে আসা সৈনিকদের মূল নেতৃত্ব দেন ময়মনসিংহ ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মিজানুর রহমান এবং বগুড়া ডিভিশন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার শফি মেহবুব। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে বরখাস্ত করে সি জি এস (চিফ অব জেনারেল স্টাফ) মেজর জেনারেল মাহবুবুর রহমানকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল পদোন্নতি দিয়ে নতুন

সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম তার প্রত্যাহার আদেশ এবং নতুন সেনাবাহিনী প্রধান পদে জেনারেল মাহবুবুর রহমান-এর নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করে বিদ্রোহী সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে কাজ করতে থাকেন এবং পরবর্তী নির্দেশের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে বার বার যোগাযোগের ব্যর্থ চেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

ওদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এ.পি.এ শেখ পরিবারের রাজনৈতিক পারিবারিক ছাত্র ইকবালের এ্যাপো হোসেন তার কক্সবাজার পৌঁছে কক্সবাজারের অপার সাফিটি (মাহমুদুর রহমান এবং আরও অনেকে) হাতিয়ে তুলে আলোচনার পরে হাসিনার নামাজের চেয়ে বেশী দেখছেন। আর যা বাড়াবাড়ি তাতে আগে থেকে একটু বাড়তি হোমিওপ্যাথি খাচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা অবশ্য আগে কখনো হোমিওপ্যাথি খেতেন না। '৮১ সালে দিল্লী থেকে দেশে ফিরে আসার পর থেকে হিসেবে ১৬ বছর দিল্লী থেকে ফিরে আসার পর থেকেই মাথা ব্যথা করতো, ঘুম হতো না। নানা চিন্তা সব সময় মাথায় ঘুরপাক খেতো। মাথা ব্যথা করতো, টেনশনে ঘুম হতো না। বিশেষ করে প্রতিরাতে ঘুমাতে গেলে মাথা জেগে থাকতো। সারারাত জেগে থাকা ছিল সব চেয়ে বড় অসুবিধা। ডাঃ এস. এ. মালেক (বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা) অনেক হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইয়েছেন। ডাঃ এস. এ. মালেকের কাছ থেকে শত শত শিশি হোমিওপ্যাথি ঔষধ খেয়েও কোন কাজ হচ্ছিল না। অনেকেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বুঝিয়েছেন না। ডাঃ মালেক এই সমস্ত ঔষধের জন্য কোন পয়সা নিতেন না, যদি পয়সা নিতেন তাহলে নিশ্চিত বলা যেত পয়সা নেয়ার জন্যই ডাঃ মালেক অযথা কেবলই ঐ সব ঔষধ খাওয়াচ্ছেন। ডাঃ মালেকের হোমিওপ্যাথি ঔষধের সাথে হয়তো তুলসী পাতার রস, মেথিচূর্ণ। কিন্তু কোন কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। অবশেষে একদিন ডাঃ এস. এ. মালেক এক সাইকো থেরাপী হোমিওপ্যাথিক নিয়ে এলেন এবং বঙ্গবন্ধু কন্যাকে বললেন, নেত্রী ২ ফোঁটা করে দিনে ৩ বার এই ঔষধ খাবেন। দেখবেন মাথা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, দুশ্চিন্তা চলে যাবে, টেনশন থাকবে না, মাথা ব্যথা চলে যাবে রাতে ভাল ঘুম হবে।

একদিন বললেন, ঘুম হয় ভালো, এটা তো হোমিওপ্যাথিক, আর, এটি খেলে মানুষ নেশা করে। মালেক ভাই, এটা কোথায় কি আছে?

ডাঃ এস. এ. মালেক বললেন, নাম হোমিওপ্যাথিক ক্যানাবিস। নেত্রী, এই ঔষধ আমাদের দেশেই ছিল। আমরা সব প্রেসক্রাইব করেছি। এটা খুবই কার্যকরী এবং ভাল ঔষধ। এখানে আইনে শুধু শুধু এই ঔষধটা বাজারে (নিষিদ্ধ) করেছে। নেত্রী আপনি খেয়ে দেখেন, যদি আপনার অসুবিধা দূর না হয়, তবে আমাকে বলবেন।

এটা ৯২ সালের প্রথম দিকের কথা। এরপর থেকেই ৫ রোজে করে দিনে ৩বার, অথচ অফিস ডিউটি হতো, কলকাতা থাকে, সবুজ হলে সেদিন ৫/৬ চামচ করে দিনে ৩/৪বার এমনকি রোগের লিক্ষারের সঙ্গে মিশিয়ে ফলে... মধ্যে দিয়ে গলা ঠিক রাখার জন্য বহুক্ষণ অব্যাহত পদ্ধতি। শুধু পড়ুয়া হলে প্রয়োজনে মাসে-মধ্যে কখনো কখনো ফেনোবার্বিটোন খেতে লাগলেন।

সবুজ সংগ্রহ পরবর্তী কথা এবং ছবিটা ডা. এর সঙ্গে ফেনোবার্বিটোন শুরু করিয়ে শুরু করেন। পরে আমরাও নিয়মিত প্রেসক্রিপশন সহ আরও জোরে বন্ধ করুন কাজে এবং নিজের খুশিতে খাওয়া বন্ধ করেন দেখি।

এইভাবে বছর দুই/ তিন মেয়েটি নিয়মিত হারিয়ে ফেনোবার্বিটোন খেতেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আর ফেনোবার্বিটোন ছাড়তে পারছেন না। যখনই তিনি ফেনোবার্বিটোন ছেড়েছেন তখনই পুরোনো সেই রোগ ব্যাধি অর্থাৎ, গলা খুসখুস, শরীরের কম্প গলা জেগে থাকা, ঘুম না হওয়া ইত্যাদি আবার দেখা দেয়।

তাই ডা. এম. এ. ওয়াজেদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে নিয়মিত চেকআপের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন আর সেখান থেকে আসছেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সন্তানপ্রসব সম্পর্কে জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হলো, আপা সন্তান কবে কি?

সেটা শুনেই মুচকি হেসে বললেন, কেউ কারো নাই; যার যার আল্লাহ সহায়।

তারপর বললেন, দিনে আমাকে লাগিয়ে যা হয় হোক। আর সেটাই ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা করে। পরবর্তী সময়ে দাঁড়াতে হবে অবশ্যই। সেটাই আর অনেক সতর্ক থাকতে হবে। সব সময় সাবধান হবে। যারা বলে গেল বা ছেড়ে গেল তাদের ফিরে আসবে না। এখান থেকে বাইরে পরিস্থিতি খারাপ। তাই আর একটু বেশি সেনসিটিভ হতে হবে। মেজর ২১টার সময় ক্যান্টনমেন্ট-এর খবরাখবর এল এলো। এর সঙ্গে ঢাকার পরিস্থিতির দুর্ভাগ্য অবনতি ঘটার সংবাদ এলো। মেজর জিয়াউর রহমান বিদ্রোহ এবং মেজর খালেদ মোশাররফের এই সংবাদে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বিদ্রোহের এটা খুবই ক্ষতি হলো। তবে সাভার ও গাজীপুর ক্যান্টনমেন্টে যে বাঙালি সৈন্য বিদ্রোহের পক্ষে এটা খুব ভাল এই কারণে যে, জেনারেল ওসমানীর নির্দেশে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর এবং সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদের প্রতিরোধ করার জন্য সকল সদস্যদের নিয়ে বিদ্রোহী মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান এর নির্দেশে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সৈনিকদের আরিচা ঘাট অবধি নিয়ে একটি ফেরি বন্ধ করে দেয় ও নদী পার হওয়ার অপেক্ষায় থাকা সৌভাগ্যক্রমে ঘাটের এবং নগরবাড়ি ঘাটের সৈনিকদের নদী পার হওয়ার চেষ্টা করলে ডুবিয়ে দেওয়া হবে বলে ওয়্যারলেসের মাধ্যমে হুঁশিয়ার করে দেয়। এদিকে ময়মনসিংহ থেকে আগত সৈনিকদের টঙ্গী ব্রিজে গাজীপুরের সৈনিকেরা আটকিয়ে দেয়। কুমিল্লার ময়নামতি, সিলেট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা খুব ভাল না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা টেলিফোনে সব সময় খবর রাখছেন। ঢাকা থেকে খবর এলো ঢাকায় কারফিউ জারি করেছে। কিন্তু কার পক্ষ থেকে? অর্থাৎ ক্ষমতায় কে বসেছে? জেনারেল জিয়া? না মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ? এটা কিছুতেই নিশ্চিত হওয়া গেল না। এই পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পূর্বের কর্মসূচি বাতিল করে দেন। এবং টেলিফোন পাচ্ছেন সেই চিন্তায় ও চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেউ বললেন টেলিফোনে, কেউ বললেন পত্রযোগে, কেউ বললেন টেলিগ্রামে।

ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্য এম. পি. শীর্ষ স্থানীয় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে থাকতে পশ্চিমবঙ্গে চিঠি দেন। তিনি অর্থনৈতিক দেশের প্রতিনিধি, বর্তমানে শেখ হাসিনার এক নম্বর মানুষ, বিমান

বঙ্গ ইতিমধ্যে যোগাযোগ করেছেন শেখ হাসিনাসহ, জনকণ্ঠ ডিওএইচ আর্মি অফিস নিয়ে তুমুল। ডিওএইচ আর্মি অফিসের টি, ডি, বড় জনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, মেজর নাসিরুদ্দিন, ডিওএইচ আওয়ামী লীগ সভাপতি বর্তমান যুব মন্ত্রী নাছিম, কেন্দ্রীয় নেত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, কেন্দ্রীয় নেতা ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন প্রমুখের সাথে টেলিফোনে কথা বলেছেন। দেশের এই সংকট মুহূর্তে করণীয় কি সে বিষয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেখানেও নিশ্চুপ। টেলিফোন দেয়া ছাড়া এই সংকটময় মুহূর্তে তার যেন কোন কাজ নেই। শুধু আকারে একটা কোন কথা শেখ হাসিনাকে বলা হয়েছে। জনা আওয়ামী কর্মীর কথা শুনেই তিনি নিশ্চুপ, নির্বিকার। অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন জিজ্ঞেস করলেন, নেত্রী আমাদের করণীয় কি?

নেত্রী উত্তর দেয়ার আগেই [illegible] কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা [illegible] আওয়ামী বললো, আমাদের এখন উচিত জেনারেল নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করা।

অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন জানতে চাইলেন, কি জন্য জেনারেল নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করা উচিত?

এই জন্য মিছিল বের করা উচিত, জেনারেল নাসিম বি, এন, পি'র রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের প্রতিপক্ষ হয়ে বি. এন, পি'র প্রতিপক্ষ।

জেনারেল নাসিমকে সেনাবাহিনী প্রধান পদে রাখতে পারলে সেনাবাহিনীতে তেমন এক শক্তি থাকবে। আর জেনারেল নাসিমের পক্ষে থাকলে, বি. এন, পি'র রাষ্ট্রপতি রহমান বিশ্বাসের সেনাবাহিনীর উপর প্রভাব কমে যাবে, ফলে আগামী ১২ জুনের নির্বাচনে এর প্রভাব পড়বে। ঠিক আছে, নাসিমের পক্ষে মিছিল বের করবো, বললেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible]। ডিওএইচএস মেজর নাসিরুদ্দিন, সভাপতি নাছিম মিছিল বের করতে অনুমতি প্রার্থনা করলেন, তাদের মিছিল বের করার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলা হলো, বললেন, এখন জেনারেল আসল কাজ, মিছিলের স্লোগান কি হবে?

সভা থেকে আবার কেন্দ্রীয় যুবলীগ নেতা [illegible] আওয়ামী বললো, যে কোন কিছুর বিনিময়েই মিছিল করতেই হবে। নইলে ১২ই জুনের নির্বাচনে আমরা ক্ষমতায় যেতে পারবো না। জেনারেল নাসিম যদি নাও টিকে, নাসিমের যদি পতনও হয় তবুও মিছিল বের করা দরকার। নির্বাচনে, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য। আপনারা মিছিল বের করেন। মিছিলের স্লোগান দিবেন, জেনারেল নাসিম জিন্দাবাদ, রহমান বিশ্বাস নিপাত যাক। এই পর্যায়ে নাসিরুদ্দিন আর নাছিম বঙ্গভবন থেকে [illegible] একটা মিছিল বের করে আর্মি অফিসের আশপাশে ঘুরলো। টেলিভিশনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের ভাষণ শুরু হলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা

হাসিনা পরে বলেন, আমাদেরকে বলবেন কোথায়? হাবিবুর রহমান কোথায়? খালেদা জিয়া ২৫ সদস্য সংসদে বসে থেকে এমনভাবে সংবিধান সংশোধন করেছে যে, ক্ষমতা থাকলে অনেক হাতেই রয়ে গেছে। আমরা তার কিছুই বুঝিনি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আবার সেক্টরে চলে গেলেন। সেখান থেকে আওয়ামী লীগের নেতা আওয়ামী ফোন করে তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি যাও আওয়ামী লীগ অফিসে এবং আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের বাসায়। সেখানে বল বঙ্গবন্ধু কন্যা সভানেত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশ দিয়েছেন, মিছিল বের করতে এবং টিভিতে ঘোষণা দিতে জেনারেল নাসিম বিশ্বাসঘাতক। রহমান বিশ্বাস নিপাত যাক।

হঠাৎ সেক্টরের টেলিফোন থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন এ-ই-এ-ই-এই।

তারপর চুপ আর কিছুই বলেননি। অর্থাৎ সেটা সেক্টরের টেলিফোন চুপ একক্ষণ কথাগুলি ধরা যাচ্ছিল না। টেলিভিশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের বক্তৃতা শেষ হলো এবং আবার সেক্টরে চলে গেলেন। সেক্টরে গিয়ে নজর ও পাশাপাশি নাসিম বঙ্গবন্ধু কন্যাকে সার্কিট হাউস থেকে অন্যত্র পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিলে তিনি বলেন, আমি কোথায় যাব? আর দেখো শেষ কি হয়। সবাই শেখ হাসিনা পুরো রাত জেগে টেলিভিশন দেখে শুয়ে পড়লেন।

রাত হতে মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, জেনারেল নাসিম এ লড়াইয়ে পরাজিত।

সকাল বেলা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, নাসিম পরাজিত হয়েছে ভাল হয়েছে। ওকে (নাসিমকে) আমি ক্ষমতালোভী মনে করতাম ক্ষমতা নিতে চেয়েছিলাম ও এখন তাই দেখিয়েছে। পরাজিত হয়েছে ঠিক হয়েছে।

সকাল ৯টার ফ্লাইটে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় ফিরলেন। সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম বীর বিক্রম বরখাস্ত ও গ্রেফতার হলেন। এরপর থেকে আর কোনদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জেনারেল নাসিমের নাম ভিন্নভিন্নভাবে উচ্চারণ করলেন না।

আবার ক্ষমতায় আগমন

১২ই জুন ১৯৯৬। নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। নর-নারী নির্বিশেষে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসতে হাসতে ভোট কেন্দ্রে গেল, হাসতে হাসতে নিজেদের ভোট দিল। আবার হাসতে হাসতেই ঘরে

দিয়ে এলো। সন্ধ্যার পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা শুরু হলো। প্রথম দিকে দেখা যায় আওয়ামী লীগ এগিয়ে যাচ্ছে। রাত ১০টার পর আবার দেখা যায় বি, এন, পি বেশ এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রথম দিকের ঘোষিত নির্বাচনী ফলাফলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাসহ উপস্থিত সকলেই বেশ পুলকিত হয়ে থাকেন। কিন্তু রাত বাড়ার সাথে সাথে ঘোষিত ফলাফলে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েন।

রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার উপর আস্থা রাখতে পারে এই কথা বলে তার বাসায় উপস্থিত সকলকে চলে যেতে বলেন। বাইরের সকলে চলে যাওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের এর বাসার পরিবেশ নীরব হয়ে যায়। রাত ১টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবু হেনা তার একজনকে সাথে নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাসায় আসেন এবং প্রায় এক ঘণ্টা একান্ত গোপন বৈঠক শেষে চলে যান।

ঐক্যমতের সরকার

নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা গেল অন্যান্য দলের চেয়ে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বেশি সিট পেয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা হিসেব করে দেখলেন বি, এন, পি, জাতীয় পার্টি, জামাত এবং জাসদ (রবের) আ, স, ম, রব যদি একত্রিত হয়ে যায় তাহলে আওয়ামী লীগের চাইতে ১টি সিট বেশি হয়ে যায়। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের ১টি সিট কম হয়। সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পরিবর্তে বি, এন, পি জাতীয় পার্টি, আর জাসদের আ, স, ম, রব এই জোট বা সম্মিলিত দলগুলো সরকার গঠন করতে পারে এবং সংসদের সংরক্ষিত ৩০টি মহিলা সিট অনায়াসে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই হিসেব-নিকেশের পর শুধু বলতে থাকেন, আবু হেনা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার) আমার সাথে ছলনা করলো? প্রতারণা করলো? কথা রাখলো না, কথা মতো কাজ করলো না।

এর পর—১৬ই জুন সন্ধ্যা বেলায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জাসদ নেতা এবং জাসদের একমাত্র নির্বাচিত সংসদ সদস্য আ, স, ম, রবকে যে কোন প্রকারে হোক সাথে কৌশলে তার (শেখ হাসিনার) বাসায় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। বিশ্বস্ত সূত্রমতে '৯৬ সালের পার্লামেন্টের পূর্বশর্ত হিসেবে বিরোধী দলীয় নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য আ, স, ম, রবকে এই সংসদে কিছু করতে হলে তিনি এমন একটি সংসদের জন্য চূড়ান্ত পরিকল্পনা অপেক্ষা করছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আহবান জানিয়েছেন বলার সাথে সাথে আ, স, ম, রব এখনি বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ২৬ নম্বর বাড়িতে ছুটে চলে আসেন। এর জবাবে ডি, জি, আই, পি বলেন আ, স, ম, রব এখন বি, এন, পি কে

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বসতে দিলেন, মিষ্টি খাওয়ালেন। তারপর বললেন, রব ভাই আপনারাই দেশ স্বাধীন করেছেন। যুদ্ধ করেছেন, প্রাণ দিয়েছেন। আপনারাই তো আমার পিতাকে দেশ স্বাধীনের জন্যে বঙ্গবন্ধু বানিয়েছিলেন। পতাকা দিয়ে পরিচিতি দিয়েছেন, এজন্যে মুজিব ব্যক্তিগতভাবে আপনার অবদানই হয়েছে সব চাইতে বেশি।

আ, স, ম, রব বললেন, আপনি তো তখন রাজনীতিতে ছিলেন না তাই হয়তো আপনি জানেন না, আমরা কখনই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করতে চাইনি। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে তো কখনই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করিনি। বঙ্গবন্ধুর চারপাশে যারা ছিল এবং আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, তারাই জনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আসলে বঙ্গবন্ধুই আমাদের প্রকৃত নেতা ছিলেন। আর আমরাই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত লোক ছিলাম।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, হ্যাঁ রব ভাই, আপনারাই বঙ্গবন্ধুর প্রকৃত লোক। তাই তো আমি আপনাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করতে চাই। আমরা সকলে মিলে সরকার গঠন করে দেশ চালাতে চাই।

আ, স, ম, রব বললেন, দলের দিক থেকে তো অনেক আগেই আমি আপনার (শেখ হাসিনা) নেতৃত্বে দেশ পরিচালনায় সমর্থন দিয়ে আছি এবং গোপনে তো কেবল আপনার ডাকের অপেক্ষায়ই ছিলাম।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি আপনার বিশ্বাসের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবো না।

আ, স, ম, রব বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনাকে বিশ্বাস করার ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই। আপনি বঙ্গবন্ধু কন্যা; আপনাকে কি অবিশ্বাস করা যায়?

উপস্থিত নাজিম আহমেদ, মশিউর রহমান, কবির আহমেদ বাবু, জাকির আহমেদ (এরা সবাই শেখ হাসিনার সাথের ঘনিষ্ঠ [illegible] ছেলে), মনমোহন দাস, মৃণাল কান্তি দাস, প্রমুখ, সেদিকের দিকে তাকিয়ে আ, স, ম, রব বললেন, আমি নেত্রীর সাথে একটু একা কথা বলতে চাই।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, উপস্থিত সকলকে বললেন, তোমরা একটু বাইরে যাও।

সবাই বাইরে চলে আসলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আর জাসদ নেতা আ, স, ম, রব ভিতরে একান্তে কথা বলছেন। মিনিট পাঁচেক পরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কলম এবং একটি কাগজ চাইলেন। ১টি কলম এবং ১টি কাগজ ভেতরে দেওয়া হলো। বাইরে থেকে বুঝা গেল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এবং জাসদ নেতা আ, স, ম, রব নিজেদের মধ্যে একটি লিখিত চুক্তিনামা করলেন। মিনিট ১৫ পরে আ, স, ম, রব চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খোকা

[illegible] ম, হ, [illegible] করতে পারেন, [illegible] এগিয়ে পারবেন।

[illegible] একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে গেল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে [illegible] বি. এন. পি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলাম, [illegible] এবং [illegible] আওয়ামী লীগ [illegible] গঠন করতে পারে। [illegible] সংসদ [illegible] ১টি (এক) [illegible] সিট [illegible] হবে। [illegible] সিট [illegible] এম. পি. [illegible] হবে। [illegible] বি. এন. পি. জাতীয় পার্টি [illegible] ১১টি (এগারো) আওয়ামী লীগের [illegible] ১টি (এক) [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই [illegible] দিকে [illegible]

এই [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা [illegible] শেখ হাসিনার [illegible] হ, ম, স, [illegible]

রওশন এরশাদের পা ধরা

১৯শে জুন ১৯৯৬। [illegible] জাতীয় পার্টির [illegible] এরশাদের স্ত্রী রওশন এরশাদ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার [illegible] মাথায় [illegible] করলেন। এই সময় বি. বি. সি [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible] রওশন এরশাদ [illegible] আপা (শেখ হাসিনা) আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ, আপনি জাতীয় পার্টি থেকে [illegible] মহিলা [illegible] না।

শেখ হাসিনা বললেন, এটা আপনাদের ব্যাপার, আপনারা যাকে দিবেন আমি তাকেই মহিলা এমপি বানাব।

রওশন এরশাদ বললেন, আপা, আপনি আমার বোন, আপনিও মহিলা, আপনারও স্বামী আছে। আপনি বোন হিসেবে আমার প্রতি দয়া করুন। সবই আপনার হাতে। আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করুন। ঐ চুক্তির একটি শর্ত ছিল [illegible]কে দয়া করে আপনি মহিলা এম, পি বানাবেন না। প্রয়োজনে আপনি জাতীয় পার্টি থেকে একটিও মহিলা এম, পি দিবেন না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না না আমি জাতীয় পার্টিকে ৩টি এবং আপনাকে ১টি মহিলা এম, পি দিব।

রওশন এরশাদ বললেন, তাহলে আর পার্টি থেকে, [illegible]কে এম, পি করবেন না।

শেখ হাসিনা বললেন, সেসব তো এটা আপনাদের ব্যাপার।

রওশন এরশাদ চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আপা, আপনি আমার বোন, আপনি দয়া করে আমাকে এই অসহায় অবস্থায় ফেলবেন না। আপনি দয়া করে আমার স্বামীকে উদ্ধার করুন।

শেখ হাসিনা বললেন, আরে কি করছেন, কি করছেন। ঠিক আছে, পা ছাড়ুন, পা ছাড়ুন আমি দেখব।

রওশন এরশাদ বললেন, আপা আপনি কথা দেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক আছে আমি [illegible]কে এম, পি বানাব না।

অতঃপর রওশন এরশাদ ভি, ভি, আই, পি রুমের পশ্চিম পার্শ্বের দরজা দিয়ে বেরিয়ে [illegible] যেতে না যেতেই ভি, আই, পি, রুমের উত্তর দিকের দরজা দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বেরিয়ে ড্রইং রুমে এসে নাচতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, কাউকে ছাড়ুম না। [illegible]। কাউকে ছাড়ুম না। [illegible]কে এম,পি বানামুই।

[illegible]দের চিঠি

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ('৯১) এর পূর্ব প্রভাবশালী নায়ক গোলাম আযম ও তার দল জামায়াতে ইসলামীর সাথে গভীর রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। এবং নিজেদের প্রয়োজনে শেখ হাসিনার বিয়াই (শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুলের শ্বশুর) মুশাররফ হোসেনের উত্তরার বাড়িতে জামায়াতের প্রধান নায়ক গোলাম আযম এবং মতিউর রহমান নিজামীর সাথে গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

ঐ বৈঠকে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত হয় যে, ১২ই জুন '৯৬-এর নির্বাচনে জামায়াতের কর্মী ও সমর্থকরা বি, এন পি প্রার্থীকে ভোট দিবে না। এবং যে সমস্ত

আমাদের সমাজে দুর্বল সেই নরম জায়গায় আওয়ামী লীগ নারীকে দেখি সেভাবে চেষ্টা করবে। বিনিময়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আমাদেরকে একটি মহিলা আসন দিলেন।

রাত তখন ১০টা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ডাইনিং টেবিলে খাবার খেতে খেতে আমাদের নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ ও নিজামীদের সাথে বৈঠকের ও রাজাকার কথা পুনরায় উল্লেখ করে বললেন, এবারও বলেছিলাম সেবকওয়ালীদের একটি মহিলা এম. পি দিন। তখন ভেবে ছিলাম অন্তত দেড়টি পর্যন্ত দিতে পারেন। কিন্তু আমরা পেয়েছি মাত্র ১টি আসন, কোনো ওয়ালীদের একের ১টির বেশি মহিলা এম পি দিব না।

এই কথা শুনে শেখ হাসিনার চাচী, শেখ নাসেরের স্ত্রী, শেখ হেলাল এম পি'র মা বললেন, এমন দিলেও আর, না দিলেও আর, কাজতো হয়েই গেছে।

অর্থাৎ আমাদেরকে একটা মহিলা এমপি দিলেও চলে, না দিলেও চলে। নির্বাচনী কাজ তো তিনিই সবাই দিয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, ভবিষ্যতের খাতের সুযোগ আমার জন্য একটা মহিলা এম পি সেবকওয়ালীদের নেই। মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (মেহের) বললো, আপা এটা আপনি কি বলেন? মানুষের মন ভেঙে দিবেন না। মানুষের বিশ্বাস নষ্ট করবেন না। আপনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের নেত্রী, মানুষ আপনাকে স্বাধীনতার প্রতীক মনে করে। আপনি যদি আমাদেরকে মহিলা এম. পি দেন তবে থাকেন দিন আর আপনার প্রতি আস্থা থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানুষ বিক্ষুব্ধ হবে। আপনার ক্ষতি হবে। আপনি এটা করবেন না।

এরপর মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু এবং মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (মেহের) একযোগে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিয়ে বললো, আপা আপনি কথা দেন আমাদেরকে একটাও মহিলা এম. পি দিবেন না।

শেখ হাসিনা বললেন, আমাকে ভাবতে দাও। রাত তখন ১টা।

পরদিন সকাল ৭টায় মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (মেহের) প্রথমেই গেল ইন্দিরা রোডে শেখ হাসিনার চাচী শেখ হেলাল এম. পি'র মা'র বাসায়। দু'জনে মিলে শেখ হাসিনার চাচির পা জড়িয়ে ধরে বললো, চাচী আপনিই কেবল পারেন আমাদেরকে মহিলা এম. পি দেওয়া থেকে আপাকে (শেখ হাসিনা) বিরত রাখতে।

চাচী বললেন, তোমাদের আপাকেই তো আমি বললাম দিলেও পার, না দিলেও পার।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে বলল, না চাচী, আপনি শুধু বলবেন আমাদেরকে মহিলা এম. পি দিও না।

তাঁদেরকে এক প্রকার জোর করেই বঙ্গভবন ১ নম্বর থেকে শেখ মুজিবের বাড়ি নিয়ে যাওয়া হলো। এবং পুনরায় স্বামী-স্ত্রী মিলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে তানজিমকে মহিলা এম, পি না দেওয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করলে নাকি বললেন, এসব কান্নাকাটি করছো তানজিম আমাকেতো মহিলা এম, পি না দিলে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু না তুমি তানজিমকে মহিলা এম, পি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, ঠিক আছে তোমরা যখন দিতে চাও না, না দিলাম।

হানিফ এল জি আর ডি মন্ত্রী

আগামী ২৩শে জুন ১৯৯৬। বঙ্গ ভবনে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিবেন। সবাই খুব ব্যস্ত। যারা মন্ত্রী হবেন বলে আশা করছেন তারা সকলেই খুবই টেনশনে আছেন। অনবরত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাসায় আসা-যাওয়া করছেন। মনে মনে ভাবছেন আমি তো মন্ত্রী হবই। আমাকে মন্ত্রী পদ থেকে বাদ দেবে কিভাবে? অবশ্য বলা তো যায় না, যে কে আবার মন্ত্রী পদ থেকে বাদ পড়বে আমার নাম আবার ঐ বাদ যাওয়া তালিকায় নেই তো? না, না এ কি ভাবে হয়! আমাকে মন্ত্রী না বানিয়ে পারবে না। আমি মন্ত্রীত্ব পাবই। তবে কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পাব এটা ভাবনার বিষয়। ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে থেকে ধানমন্ডির লোক বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনদের কাছে ধর্না দেওয়া, জোর তদবির করা চলছে। এদের মধ্যে একজনই শুধু তদবির করছেন না, ধর্না দিচ্ছেন না। কারণ তিনিতো একেবারেই নিশ্চিত তিনি মন্ত্রী হচ্ছেনই। শুধু মন্ত্রীত্বই নিশ্চিত নয়, মন্ত্রণালয়ও নিশ্চিত। এবং সেই মন্ত্রণালয়টি হলো এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রণালয়। এই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি হলেন ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ। মেয়র মোহাম্মদ হানিফ এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রী তো হবেই আছেন, এটা তিনি একেবারেই নিশ্চিত। এখন শুধু শপথ নেওয়াটা বাকি। আগামী ২৩শে জুন শপথ অনুষ্ঠানের জন্য অপেক্ষা। কারণ মেয়র মোহাম্মদ হানিফের এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীত্বের এই নিশ্চয়তা আছে, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী '৯৬ ধানমন্ডি ৩২-এ বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগের ভাবী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তো মেয়র হানিফকে এল, জি, আর, ডি, মন্ত্রী বানিয়েই রেখেছেন এবং মেয়র হানিফকে এল, জি, আর, ডি মন্ত্রী হিসেবে অনানুষ্ঠানিক ঘোষণাও বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৭ই ফেব্রুয়ারী '৯৬ দিয়েছেন। তাইতো মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বেশ নিশ্চিন্ত ও ফুর্তিতেই আছেন।

সবার মুখ কালো

আজ ২৩শে জুন ১৯৯৬ সাল। সন্ধ্যা ৭টায় বঙ্গভবনের দরবার হলে রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শপথ নেবেন।

ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের শেখ হাসিনার ৫৪নং বাড়িতে শুধু মাত্র শেখ হাসিনা ছাড়া বাকি সবার মুখ কালো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পিতার ফুফাতো ভাইদের ছেলেরা নজিব আহমেদ নজিব, নাসিম আহমেদ বাবু, কবির আহমেদ এদের সবার মুখ কালো। যেন কালো, যেন অমাবস্যার কালো এদের মুখে ভর করেছে। এদের মায়ের চাচাতো ভাই বাহাউদ্দিন নাসিম যে কেন জোরে হওয়ায় আগেই শেখ হাসিনার বাসা ছেড়ে চলে গেছে। বাড়ির চাকর-বাকর, পিয়ন, বাড়ির ড্রাইভার, বাবুর্চি, এমন কি যারা দীর্ঘ ১৬/১৭ বছর শেখ হাসিনার সাথে থাকতে থাকতে শেখ হাসিনার আত্মীয়ের মতো হয়ে গেছে, শেখ হাসিনার পরিবারেরই সদস্য হয়ে গেছে, তাদের মুখেও জল, তাদের মুখেও জীবন মলিন। তীব্র কালো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কিছুক্ষণ পর পর শুধু বলছেন, সবাই এমন ভাব করছে, যেন আমি মরে গেছি। অথচ সন্ধ্যার পরেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন। অথচ আজ বাড়িতেই নেমে এসেছে তীব্র শোকের ছায়া। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বারবার বলছেন, হ্যাঁ আমি কি মরে গেছি যে, সবাই শোক শুরু করেছে?

শেখ হাসিনার আত্মীয়দের দুঃখভারাক্রান্ত এই শোকের কারণ কি ছিলেন অনেকে তখন বুঝেন না, উনি তো (শেখ হাসিনা) প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেলেন, উনার আপন তো একরকমই থাকলেন। আমাদের কি হবে? এখন তো উনি আমাদের খোঁজও নেবেন না। আমরা যে এতো সহজে এতো কাছে আসতাম, তা আর পারবো না। বাবা, খুব না না প্রধানমন্ত্রী হয়ে ডুবে যাবেন কোনো খোঁজ রাখবেন না কেবল নিজেরাই ম্লান হয়ে যাবেন।

ওরা সবাই বসলো, প্রত্যেক মুখের ভাব যে, কি রকম রেখেছেন, বুঝলেন।

সন্ধ্যা সাতটায় বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে প্রবেশ করা হলো। আওয়ামী লীগের সমস্ত এম. পি.রা এসেছেন। বিদেশি অতিথিরা এসেছেন। তিন বাহিনী প্রধান এসেছেন। প্রশাসনের কর্মকর্তাগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সবাই এসেছেন।

নতুন পায়জামা-পাঞ্জাবি আর মুজিব কোট পরে এসেছেন [illegible] ওয়াজেদ মিয়া। তিনি সাধারণত মুজিব কোট পরেন না। কিন্তু তিনি তো [illegible] নিজেও তিনি আর [illegible] ছিলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সাথে ১৭ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে (হাসিনাকে) স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাতেই তিনি আজ মুজিব কোট পরে এসেছেন। তিনি অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। [illegible] এই নববধূ নিয়ে [illegible] শেখ হাসিনার আজকের অনুষ্ঠানের মর্যাদা না হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আমার সাথে বেঈমানী!

অনুষ্ঠানের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা শপথ নিলেন এবং বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর মন্ত্রী সভার নাম ঘোষণা করবেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যাগ থেকে তার মন্ত্রী পরিষদের লিস্ট বের করলেন। ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফ আস্তে আস্তে চেয়ার থেকে উঠলেন। প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার মন্ত্রী পরিষদের নাম পড়তে একটু সময় লাগছে। ঢাকার মেয়র হানিফ এমনভাবে আছেন যে তিনি না চেয়ারে বসে আছেন, না দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মনে করছেন, চেয়ারে বসে কি লাভ এখনই তো উঠতে হবে মন্ত্রী পরিষদের প্রথম নামটাই তার। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াচ্ছেন না এই জন্য যে দৃষ্টিকটু মনে হতে পারে। তাই তিনি আধা বসা, আধা দাঁড়ানো অবস্থায় আছেন।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মন্ত্রী পরিষদের নাম পড়তে লাগলেন। প্রথম নামটি মেয়র হানিফের না, দ্বিতীয়টি না, তৃতীয়টি না, চতুর্থ না, পঞ্চম না, ষষ্ঠ না, সপ্তম না, অষ্টম না ....না, না, না, না এর পর মেয়র মোহাম্মদ হানিফ আমার আমার শ্রোতা-দর্শকের ভরা দরবার অর্থাৎ চেয়ারের দু' সারির মাঝখান দিয়ে দ্রুত বঙ্গভবন ত্যাগ করে বেরিয়ে যেতে থাকলে একজন তাকে পিছন থেকে হানিফ ভাই বলে আঁকড়ে ধরলে তিনি তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে, আমার সাথে বেঈমানি! আমার সাথে বেঈমানি! বলতে বলতে বঙ্গভবন ত্যাগ করে চলে যান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাসায় ফিরে সাংবাদিকদের খাবার খেতে খেতে বললেন, আজ আমার দুইটি আনন্দ। প্রধানমন্ত্রী হতে পারার আনন্দ আর হানিফের বেঈমানির প্রতিশোধ নিতে পারার আনন্দ।

পরবর্তী পর্যায়ে মেয়র মোহাম্মদ হানিফ বারডেমে (বারডেম-এ) হাসপাতালে ভর্তি হয়ে সাংবাদিক ডেকে বললেন, আমাকে সম্মান না দেখিয়ে অপমান করতে পারেন না।

তারপর দাবী করলেন সিটি গভর্নমেন্টের। এর পর মেট্রোপলিটন অথোরিটির। কিন্তু না, মেয়র হানিফের কিছুই পাওয়া হলো না। মন্ত্রীত্ব না। সিটি গভর্নমেন্ট না। মেট্রোপলিটন অথোরিটিও না।

বেসামাল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাসায় ফিরে এসে তার জন্য নতুন সরকারী বাসা পছন্দ করার জন্য কর্মকর্তাদের বললেন। শুরু হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য বাসা পছন্দ করা। প্রথমেই দেখা হলো রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন সুগন্ধা। তার পর দেখা হলো এরশাদ আমলে

[illegible] গণভবনের [illegible]
[illegible] কোটি টাকা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার [illegible]
[illegible] (শেখ মুজিবের) [illegible]
[illegible] প্রধানমন্ত্রী শেখ [illegible]
[illegible]

[illegible] জুলাই, ১৯৯৬ [illegible] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই গণভবনে এসে উঠলেন। গণভবনে এসে তিনি [illegible] ঘুরে দেখলেন। [illegible] দেখলেন, [illegible] দেখলেন, [illegible] দেখলেন, [illegible] দেখলেন। [illegible] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা [illegible] পরদিন ৪ঠা জুলাই, [illegible] ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা [illegible] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা [illegible] নতুন শাড়ী [illegible] তার (প্রধানমন্ত্রীর) কার্যালয়ে চলে এলেন। [illegible] ৩ নম্বর রুমে ঢুকলেন, [illegible] এই ৩ নম্বর কনফারেন্স রুমে ঢুকেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা [illegible] ক...র ম...ই [illegible] জ...স...ব [illegible]...বি...। [illegible] এই টেবিলটি সরিয়ে ফেলুন।

কাজী বললেন, [illegible] টেবিল [illegible]।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, [illegible] এই টেবিলটি সরিয়ে ফেলুন।

[illegible] প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা [illegible] চলে যান।

গণভবনের [illegible] একটি বিশাল রুম। এই বিশাল রুমে [illegible] একটি বিশাল টেবিল রয়েছে; এবং এই বিশাল টেবিলের চার দিকে [illegible] চেয়ার রয়েছে। এই [illegible] রুমটি [illegible]। এটি [illegible] একটি কনফারেন্স রুম।

দুই বোনের ভাগাভাগি

[illegible]

শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা ধানমন্ডির বাড়ির সামনে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন

শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারী

১৯৯৬ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি নাগাদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানার স্বামী শফিক সিদ্দিকী, শেখ হাসিনার বড় এদেশের নিশান পেট্রোল জীপ গাড়িতে এবং সবুজ রঙের ফ্রন্ট-সাইডে দুটি টয়োটা গাড়িতে করে রওনা দিল, একজন ব্যবসায়ী ও একজন রাজনীতিক পার্টনারকে সঙ্গে নিয়ে এবং প্রতি সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন গণভবনে ও ধানমন্ডি ইউনিবাসে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতেন। মিটিং-এ যাবার আগে শফিক সিদ্দিকী তাঁর সাইফুল আজহারের কাছ থেকে ঢাকার মতিঝিলের শেয়ার মার্কেটের বিস্তারিত ইনফরমেশন নিতেন। শফিক সিদ্দিকী প্রথমেই জানতে চাইতেন শেয়ার মার্কেট কেমন উঠছে? বন্ধু সাইফুল আজহারী বলতেন ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের জন্য বিলম্বিতে এ সময়ে বেশ উঁচু দেখাবে।

তখন শফিক সিদ্দিকী বলতেন, ওকে, তাহলে শেয়ার মার্কেট খুব ভাল থাকবে, শেয়ার মার্কেট ফেলো, শেয়ার কিনবেন, আমাদের গাড়ু-বাছুর, আমরা শেয়ার কিনবো। শেয়ার কিনতেই হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় গণভবনে ও ধানমন্ডি ইউনিবাসে প্রতি সপ্তাহে টপ কর্মীদের সাথে মিটিং-এর আগে বন্ধু সাইফুল আজহারীকে শফিক সিদ্দিকীর একই প্রশ্ন, শেয়ার মার্কেটে আজকে কত দাম উঠেছে?

বন্ধু সাইফুল আজহারীর উত্তর, অনেক লোক এসেছে, মতিঝিলের রাস্তা জ্যাম হয়ে গেছে।

শফিক সিদ্দিকীর একই কথা, সবাইকে শেয়ার কিনতে বলেছেন। শেয়ার কেনা খুবই লাভজনক ব্যবসা। কিনতেই হবে। এভাবে দিন যেতে লাগলো, এক পর্যায়ে, প্রতিদিন সাতসকালে শেয়ার মার্কেটের প্রকৃত অবস্থা জেনে গণভবনে এসে তা তাৎক্ষণিক জানা বন্ধু সাইফুল আজহারীকে শফিক সিদ্দিকী দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। বন্ধু সাইফুল আজহারী প্রতি সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন গণভবনে গিয়ে শফিক সিদ্দিকীকে শেয়ার মার্কেটের প্রকৃত অবস্থা জানাতে লাগলো। আর শফিক সিদ্দিকী তা জানার পর রাজনীতিক, ব্যবসায়ী এবং বাঙালি ব্যবসায়ীদের সাথে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং করতে থাকতেন।

অভিষ্ট, শেয়ার কিনতেই হবে। শেয়ার বিক্রি করাটা কোন ব্যাপার না। কেনাটাই আসল ব্যাপার। আজ যেকোনভাবে শেয়ার কিনতে পারলে, আগামী কাল না আগামীকালই তা চড়া দামে বিক্রি হয়ে যাবে। শেয়ার কেনা নিয়ে প্রায় সবার মধ্যেই হই হই রই রই পড়ে গেছে। বাজারে প্রচুর ক্রেতা আছে। কিন্তু শেয়ার বিক্রেতা নেই। ক্রেতারা শেয়ার কেনার জন্য রাত-দিন ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদিন বন্ধু সাইফুল আজহারী শফিক সিদ্দিকীকে জানালো, শেয়ার মার্কেটে আজ সবচাইতে বেশি ক্রেতা এসেছে। ইত্তেফাকের মোড়, হাটখোলা, মতিঝিল সিনেমা হল থেকে শুরু করে পুরো মতিঝিল, শাপলা চত্বর, সব জায়গা লোকজনে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। এই সকল এলাকায় যানবাহন বন্ধ হয়েছে। শুধু ক্রেতা

[illegible]

[illegible]

ওরা হয়ে গেল মুক্তিযোদ্ধা

'৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকীর সাথে মিলে যে সকল মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধ শুরু করেছিল, সেই সকল মুক্তিযোদ্ধা ১১ আগস্ট ১৯৯৬ ঢাকার পুরানা পল্টনে এক বৈঠকে বসে। আলোচিত বৈঠক হলো। বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসায় তাকে এবং তাঁর সরকারকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় এই নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলে। গুলশাখালি এবং নাসিরাবাড়ি অঞ্চলের এখানে মুক্তিযোদ্ধা বৈদ্যনাথ রুদ্র তাঁর বক্তৃতায় বেশ জোরালো যুক্তি আবেগ প্রবণ হয়ে বললেন আমরা, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। দেশ স্বাধীন করেছি। কিন্তু দাবি নাই। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধে পঙ্গুত্ব বরণ করেছি। কিন্তু দাবি নাই। অবশেষে এক বিধবা যুবতীকে বিয়ে করেছি। আমাদের ঘরে একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। আমি এখন এক বিধবা যুবতীর স্বামী এবং এক ছেলের পিতা। আমি আর অন্য-অন্য কোন কিছুরই দাবীদার হতে চাই না। আপনারা এমন কিছু করবেন যাতে আমার বিধবা স্ত্রী আবার এর পরে বিধবা না হয়। আমার ছেলে পিতৃহারা এতিম না হয়।

সকাল সাতটায় বৈঠক শেষ হলে যে যার বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়। নাসিরাবাড়ি থানা থেকে আসা বৈদ্যনাথ রুদ্র, কালিদাস বিশ্বাস এবং একটি নাইটকোচে চড়ে তোলা অনেক সাথী নাসিরাবাড়ির দিকে রওয়ানা হয়ে যান। পরদিন সকাল ৭টায় (সাত) সময় আমার কাছে মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মাহমুদ জানিয়ে ফোন করেন। ফোনে আমাকে বলা হয় বৈদ্যনাথ রুদ্র সহ ওরা ছয় (৬) জন মুক্তিযোদ্ধা মারা গেছে।

সংবাদটি শুনে মনে হলো আমার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ কোন কথা বের হলো না। যার সাথে মাত্র এখন থেকে ১০/১২ ঘণ্টা আগে বৈঠকে বসে দেখা হলো, কথা হলো তারা মারা গেছে? এটা কি অবাস্তব কথা। কিভাবে একটি নাইটকোচ নিয়ে রওয়ানা, কি ঘটেছে? কিভাবে মারা গেল?

মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মাহমুদ জানিয়ে ফোন করে জানালেন, পথে রাতের বাসে পুরানো পল্টনে উঠেছিল তারা গাড়ি থেকে বিভিন্ন এলাকায় নাসিরাবাড়ি যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় এই ছয় জন মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এরা পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে নিল।

শোক-দুঃখে মনটা বিষণ্ণ ভারাক্রান্ত হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছোটো গণভবনে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শোক সংবাদটি জানালাম। তিনি আবেগপ্রবণ হয়ে বললেন। পরে তার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে চলে গেলেন।

মনে মনে একটা ভাবনা ছিল; প্রধানমন্ত্রী যদি তাঁর পক্ষ থেকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য কাউকে নিহত ঐ জন মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের কাছে পাঠান। তাই দুপুরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ফিরে এলে পুনরায় তাঁকে ঐ জন মুক্তিযোদ্ধার নিহত হওয়ার কথা বললাম।

জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তাতে কি হয়েছে? প্রতিদিনই তো কত লোক মারা যাচ্ছে। এর কয়েকদিনের পর বিকেল ৩টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাবার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু পরিষদ-এর আয়োজিত সভায় যোগদানের জন্য ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট চলে গেলেন। এবং সেখানে তিনি আমার পিতা, আমার মা, আমার ভাই বলে কাঁদতে লাগলেন।

অন্যের পিতাকে যদি নিজের পিতার মতো মনে না হয়, অন্যের মাতাকে যদি নিজের মাতার মতো মনে না হয়, অন্যের সন্তানকে যদি নিজের সন্তানের মতো মনে না হয়, অন্যের শোক দুঃখকে যদি নিজের শোক দুঃখ মনে না হয়, তাহলে, এমন নেত্রীপতি, প্রধানমন্ত্রী দিয়ে দেশের কোন লাভ হবে? মানুষের কোন লাভ হবে? নিজের বাবা-মা ভাইদের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কান্না দেখে শুধু মনে হয় হে আল্লাহ, তুমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কি এতোই দিলহীন করেছো! এতোই পাষাণ করেছো? যার জন্যে নিজের মতো অন্যের দুঃখে বিন্দুমাত্র অনুভূতি হয় না! হে আল্লাহ, তুমি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মানুষের জন্য দরদপূর্ণ একটা অন্তর দাও। মানুষকে ভালবাসার মানসিকতা দাও। মানুষের প্রতি অনুভূতি দাও। অন্যদের দুঃখ-দুর্দশাকে নিজের মত অনুভব করার তৌফিক দাও। আমিন।

ডঃ ডিগ্রী পাওয়া

৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭। যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টর অব ল ডিগ্রী প্রদান করে। এই ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের আগে, '৯৬ সালের শেষ প্রান্তে, অর্থাৎ ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েস্টলিং বাংলাদেশে এসেছিলেন। জন ওয়েস্টলিং ৪/৫ (চার/পাঁচ) দিন বাংলাদেশে ছিলেন। বাংলাদেশে অবস্থানকালে জন ওয়েস্টলিং ৩ দিন ছিলেন ঢাকায় এবং ১দিন ছিলেন গোপালগঞ্জে। ঢাকায় অবস্থানকালে জন ওয়েস্টলিং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনেই থাকতেন। গণভবন থেকেই জন ওয়েস্টলিংকে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখানো হতো। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, সোহরাওয়ার্দী উদ্যান, সংসদ ভবন, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি জায়গাসমূহ দেখানো হলো। এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে জন ওয়েস্টলিংকে বুঝানো হলো। অতঃপর সবশেষে টুঙ্গিপাড়ায়ও নেওয়া হলো। টুঙ্গিপাড়ায় শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজার দেখানো

হলো। গোপালগঞ্জ সার্কিট হাউজে রাত্রি যাপন করার পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে এসে বঙ্গবন্ধু ভাতুসহের সমস্ত ছবি এবং নির্দেশনাগুলো দুর্বৃত্ত ভালভাবে [illegible] জন ওয়েস্টলিংকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো। শুধু বুঝিয়েই দেওয়া হলো না, একেবারে তোতা পাখির ন্যায় মুখস্থ করে দেওয়া হলো। জন ওয়েস্টলিংকে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে মুখস্থ করে দেওয়ার দায়িত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক বিষয়ক উপদেষ্টা [illegible]। বুঝিয়ে দেন ৩৬ জন ওয়েস্টলিংকে সব কিছু বুঝিয়ে মুখস্থ করে দেওয়ার পরে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "ডক্টর অব ল" প্রদানের বিষয়টিও চূড়ান্ত করে দিলেন।

বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েস্টলিং নাম এবং খ্যাতি মিলিয়ে অনেক উচ্চাভিলাষ নিয়ে বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারই বসালেন এটা দেখে বাড়ু জন ওয়েস্টলিংকে মুক্তেন নাই। ফলে জন ওয়েস্টলিং নাম দিলেন ধানমন্ডি ৩২নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধু বিশুদ্ধিকরণ (বাড়ুফল)। চুক্তিপত্রটি বঙ্গবন্ধুর খানের বাড়ি আর বিশাল দুর্গের ন্যায় পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের বাড়ি। তাই এই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "ডক্টর অব ল" ডিগ্রি প্রদান করার মুহূর্তে বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জন ওয়েস্টলিং যে মানপত্র পাঠ করেন, তার এক জায়গায় লিখেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আপনাকে আপনার পিতার বিশাল দুর্গের মতো ঐতিহ্য বাড়ুফলকে রক্ষা করে রাখলেন আপনার নিবাসে, আপনার দেশবাসীকে নতুন চেতনায় জাগিয়ে। বিশাল দুর্গের মতো ঐতিহ্য বাড়ি ও তার উত্তরাধিকারের কথা অতীতে [illegible] ....ইত্যাদি ইত্যাদি।

জন ওয়েস্টলিং তার মানপত্রে যে বিশাল দুর্গের মতো ঐতিহ্য বাড়ির উল্লেখ করেছেন সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতার বাড়ি না, সেটা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারই বানিয়েছে। একমাত্র গণভবনই বিশাল দুর্গের মতো। তাছাড়া শেখ মুজিবের বত্রিশের বিশাল দুর্গের মতো কোন বাড়ি কোথাও নেই।

প্রথম আমেরিকা সফর

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা এই প্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। আত্মীয়স্বজনের এক বিশাল বহর নিয়ে সফরের আগেই গণভবন থেকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের ভি. ভি. আই. পি লাউঞ্জে পৌঁছলেন। এবং আত্মীয়স্বজনের কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে নীরবে চা ও নানান পদের নাস্তা খেতে লাগলেন, হাসি তামাশা করতে থাকলেন। মন্ত্রী পরিষদ সদস্যগণ, তিন বাহিনী প্রধান সহকারী উচ্চ পদস্থ সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা

এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিমান বলাকা ভি. ভি. আই. পি টাইগারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদায় দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। এদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ. পি. এস. বাহাউদ্দিন নাসিম নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করার জন্য, বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষকে, প্রধানমন্ত্রীকে বহন করার জন্য বিমানটিকে প্যাসেঞ্জার টাইগারের মাধ্যমে) দিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল। বাহাউদ্দিন নাসিম বললো, আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটি অতি সাধারণ যে, তিনি ভি. ভি. আই. পি টাইগারের পরিবর্তে সাধারণ যাত্রীদের (প্যাসেঞ্জার) টাইগার্ড (কাউন্টি) দিয়ে বিমানে উঠে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

কাজেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে এ. পি. এস. নাসিম বিমানকে প্যাসেঞ্জার টাইগারে দিয়ে যাওয়ার হুকুম দিল। যথারীতি বিমান কর্তৃপক্ষ বিমানের পাইলটকে এ নির্দেশ দিলে, পাইলট প্যাসেঞ্জার টাইগারে বিমান নিয়ে এলো। একটু পরে এলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিফ সিকিউরিটি অফিসার আহমেদ নজিব। নজিবের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর বিমান প্যাসেঞ্জার টাইগারে নেওয়া হয়েছে এই কথা জানামাত্র নজিব বললেন, প্রধানমন্ত্রী ভি. ভি. আই. পি. টাইগার দিয়ে বিমানে উঠবেন, বিমান ভি. ভি. আই. পি টাইগারে ফেরত আনা হোক।

যথারীতি বিমানকে ভি. ভি. আই. পি টাইগারে ফেরত আনা হলো। কিছুক্ষণ পরে প্রধানমন্ত্রীর এ. পি. এস বাহাউদ্দিন নাসিম এসে দেখল তাদের ভাই নজিব বিমান ভি. ভি. আই. পি টাইগারে ফেরত এনেছে। তখন নাসিম বিমান কর্তৃপক্ষকে বললো, আমি প্রধানমন্ত্রীর এ. পি. এস, আমি প্রধানমন্ত্রীর মনোভাব বুঝি, আমি প্রধানমন্ত্রীর মেজাজ টের পাই। আপনারা কি আমার চাইতে বেশি বুঝেন?

সমস্ত সাংবাদিকদের আমি প্যাসেঞ্জার টাইগারে পাঠিয়েছি। আমি যা বলি সেইভাবে কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রীর বিমান প্যাসেঞ্জার টাইগারে যাবে। বিমান কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশে পাইলট আবার বিমান প্যাসেঞ্জার টাইগারে নিয়ে এলো। প্রধানমন্ত্রীর এ. পি. এস নাসিমের চাচাতো ভাই প্রধানমন্ত্রীর চিফ সিকিউরিটি অফিসার আহমেদ নজিব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদায় দেওয়ার জন্য এসে, বিমান আবার প্যাসেঞ্জার টাইগারে সরানো হয়েছে শুনেই প্রধানমন্ত্রীর কুকুর ধাক্কা দিয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কার নির্দেশে বিমান সরানো হয়েছে জিজ্ঞেস করলে নাসিম বললো, আমার নির্দেশে বিমান সরানো হয়েছে। আমি বিমান প্যাসেঞ্জার টাইগারে নিয়েছি।

নকিব বললো, তুই বিমান মালিকের কে?

আমি চিফ সিকিউরিটি, আমার নির্দেশে বিমান চলবে।

নাসিম বললো, আমার নির্দেশে বিমান চলবে।

নকিব বললো, বেশ বেশি কথা বলিস না বারণ হইয়া যাইবি।

নাসিম বললো, আমি কি তোমার মতো ভাদুক নাকি যে, আমাকে ভয় দেখাও।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাবার দুই ফুফাতো ভাইয়ের দুই ছেলে এ, পি, এস সাহাবুদ্দিন নাসিম এবং চিফ সিকিউরিটি নকিব আহমেদ নকিবের মধ্যকার ঝগড়ার মুখে বিমান কর্তৃপক্ষ অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। এভাবে মিনিট দশ পনেরেক চলে গেল। ওদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিমানে উঠার জন্য ভি, আই, পি রেস্ট রুম থেকে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন এবং বললেন, কি ব্যাপার আমাকে এখনো বিমানে তুলছে না কেন?

দুই চাচাতো ভাই নকিব নাসিমের ঝগড়া চালাচালির মধ্যে, দুই চাচাতো ভাইয়ের চাইতেও অনেক অনেক বেশি ক্ষমতা ধর ব্যক্তি, বলতে গেলে ক্ষমতার শীর্ষের তিন/চার (৩/৪) নম্বর ব্যক্তি, যিনি সাধারণত নকিব-নাসিমদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন না, কিন্তু যাদের দেখলে নকিব-নাসিম ভয়ে এবং কৌশলগত কারণে সেঁটিয়ে পড়ে, পাগলের মতো টাকা পয়সার দিকে ছোটা ছাড়া আর অন্য কোন কাজ নেই যার, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই (শেখ নাসেরের বড় ছেলে) শেখ হেলাল এম,পি এসে উপস্থিত হলো। নকিব, নাসিম ভয় এবং কৌশলগত কারণে সেঁটিয়ে গেল। শেখ হেলাল এম, পি বললো, প্রধানমন্ত্রী দাঁড়িয়ে আছেন আর এখনো বিমানের ব্যবস্থা হয় নাই? বলে, ভি, আই, পিতে বিমান লাগান।

কর্তৃপক্ষ ভি,আই, পি টারমার্কে বিমান নেওয়ার মৌখিক নির্দেশ দিয়ে ভি, আই, পি রুম থেকে ওইটার্মার্কে যান এবং বিমান নেওয়া এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিতে এবার বিমানের পাইলট ভি ভি, আই, পি এবং ওয়েস্টার্ন টারমার্কের মাঝখানে বিমান রেখে দিয়ে কর্তৃপক্ষকে বললো, আমাকে লিখিত দিতে হবে। লিখিত ছাড়া বিমানের চাকা একবারও ঘুরাবো না।

এবার বিমান কর্তৃপক্ষ আরো বিপাকে পড়লো। কর্তৃপক্ষ লিখিত দেওয়ার পর পাইলট ভি, আই, পি টারমার্কে বিমান নিয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক বিদেশ যাত্রা শুরু করলেন। যদিও এই সমস্ত কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যাত্রা শুরু করতে ঘণ্টা দেড়েক দেরী হলো। এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কার উপর অসন্তোষ প্রকাশ করলেন তা বুঝা গেল না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিদায় জানাতে আসা সকল মন্ত্রী, তিন বাহিনী প্রধান, উচ্চ পদস্থ সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ বাধ্য হয়েই এই বিলম্বের সময় ভেকারায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। পরের দিন দেশের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ছাপায় প্রধানমন্ত্রীর যাত্রা শুরু করতে বিলম্বের সংবাদ পরিবেশন করলো। কিন্তু কেন যাত্রা বিলম্ব হলো, তা কোন পত্রিকাতেই জানা গেল না। প্রকাশ করা হলো না। শুধু বিলম্ব হলো এটাই প্রকাশ করা হলো। শুধু তাই নয়, প্রকাশিত এই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক, কলাম লেখক, আতাউস সামাদ সাহেব "প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা কি বিঘ্নিত" শিরোনামে সাংবাদিক ভাবে সাংবাদিক মন্তব্য লিখলেন। আতাউস সামাদ সাহেব বিমানের অভ্যন্তরে গ্রেনেডের খবর পাওয়ার আগে কত কিছু পেলেন। কত কিছু লিখলেন। বিমান বন্দরের অনেক কথা প্রকাশ হলো। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যাত্রা বিলম্বের প্রকৃত কারণ আজো মানুষের জানার এলো না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকা সফর করে যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ল ডিগ্রির সাথে তাঁর একমাত্র ছোট বোন শেখ রেহানাকে বঙ্গবন্ধু ট্রাস্টে (পৈতৃক সূত্রে) অর্ধেক ভাগ দেওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থার শর্তে সাথে নিয়ে এলেন। জগ-প্রতিক্রিয়া নিয়ে দুই বোনের সম্পর্ক অবসান ঘটিয়ে শেখ রেহানা ক্যাশিয়ারের দায়িত্ব নিয়ে বাংলাদেশে আবার ফিরে এলেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পারিবারিক তহবিলে যা কিছু জমা হবে তার সব কিছুই শেখ রেহানার হাত দিয়ে যেতে হবে। এই শর্তে শেখ রেহানা দেশে ফিরে এলেন।

যুদ্ধ বিমান ক্রয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্যাশিয়ার বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা তার স্বামী শফিক সিদ্দিকীকে সাথে নিয়ে এক বিকেলে প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন গণভবনে এসে প্রধানমন্ত্রীকে রাশিয়ার মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান (যুদ্ধ বিমান) ক্রয় করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, এই যুদ্ধ বিমান ক্রয় করলে উচ্চ পর্যায়ের কমিশন (তারা কমিশনের নির্দিষ্ট) চুক্তি করবে এবং আমরা অর্থনৈতিক ভাবে লাভবান হবো। বিমান বাহিনী প্রধান আপত্তি করলেন, অবশ্যই নেত্রী (প্রধানমন্ত্রী) এই আপত্তি মানলেন না। দেশের কোটি কোটি মানুষ বেকার, যুদ্ধ বিমান ক্রয় না করে, যে টাকা দিয়ে যুদ্ধ বিমান ক্রয় করবেন, সেই টাকা বেকারদের কর্মসংস্থানে ব্যবহার করুন।

শেখ রেহানা ও তার স্বামী শফিক সিদ্দিকীর চেহারায় ক্রোধের চেহারা প্রকাশ পাওয়ায় ভাব ফুটে উঠলো। তখন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, বিমান তো বাড়িয়ে কিনবো।

মতিন সাইফুল্লাহ আনসারী বললো, সবই বাকিতে কিনেছে, এই টাকা তো এদেশবাসীকেই শোধ করতে হবে। মোদী (প্রধানমন্ত্রী) একটি কথা শোনেন রাখবেন, যদি বেকারদের কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করতে পারেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন, তাহলে এদেশের মানুষ শুধু আপনাকে-ই না, আপনার নাতি পুতিদেরও মাথায় করে রাখবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমার সাথে কি একটু একাকী কথা বলা যাবে? না তোমার লোকজন সবার মধ্যে হাঁ-হাত দিয়েই থাকবে?

মতিন সাইফুল্লাহ আনসারী বাহিরে চলে এলো।

কথা হলো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানা ও তার স্বামী শফিক সিদ্দিকী বাংলাদেশের মতো একটি নিরস্ত্র দরিদ্র দেশের কর্ণধার হয়ে কেন যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন? ভারতের সাথে যুদ্ধ করার জন্য? মনস্তাত্ত্বিক (সাইকোঅ্যানালাইসিস) ভাবে শেখ হাসিনা শেখ রেহানা অথবা কি কখনই ভারতের সাথে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে? নিশ্চয়ই না। শেখ পরিবার কখনই ভারতের সাথে যুদ্ধের কথা চিন্তা করতে পারে না। বরং শেখ হাসিনা, শেখ রেহানারা সদা সর্বদা ভারতকে তাদের অভিভাবক ও পরিবারের অভিভাবকই মনে করেন। তারা মনে মনেই ভারতের রাজনীতিবিদদের বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুকে পিতৃতুল্যই মনে করেন। ভারতের সাথে যুদ্ধ করবেন না। তারপরও যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন, রহস্যটা কি? তাহলে কি হাসিনা-রেহানা পত্রিকা জানেন না যে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে প্রায় সবচাইতে গরীব দেশ? এদেশের মানুষের তিন বেলাই আহার জোটে না? বস্ত্র নেই, শিক্ষা নেই, বাসস্থান নেই, এসব কি তারা জানেন না? নিশ্চয়ই জানেন। সব সবই জানেন। আমার এটাও নিশ্চিত যে, মন প্রাণ থেকে শেখ হাসিনা-রেহানারা তাদের অভিভাবক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কখনই যুদ্ধ বিমান ক্রয় করবেন না। তাহলে তারা যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেন কেন? একটি কথা মনে রাখতে হবে, দেশের প্রতিরক্ষা খাত হচ্ছে এমন একটা খাত, যে খাতের ব্যয় (ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে) সম্পর্কে মহান জাতীয় সংসদেও কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। জাতীয় নিরাপত্তাজনিত কারণেই প্রতিরক্ষা খাত সম্পর্কে কোথাও কোন প্রশ্ন তোলা যাবে না। শুধু আমাদের দেশেই না। অন্যান্য দেশেও একই নিয়ম। সেই জন্যই ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বোফোর্স কেলেঙ্কারিতে স্পষ্ট জড়িত থাকা সত্ত্বেও ভারতের পার্লামেন্টে এই নিয়ে কোন হৈ-হুল্লোড় হয়নি। এই প্রতিরক্ষা খাত থেকেই বর্তমান বিশ্ব সবচাইতে বেশি দুর্নীতি হচ্ছে। প্রতিরক্ষা খাতের যেহেতু কোন জবাবদিহিতা নেই। যেহেতু এই

থাকেই দুর্নীতি করা বা কমিশন নেওয়া অতীব সহজ। এতদ সত্ত্বে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে না, তথাপি শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা গং সর্বাধুনিক যুদ্ধ অকার্যকর পুরানো বেলারুশের মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান ক্রয় করে কাড়ি কাড়ি টাকা ইচ্ছা-মত কামিয়েছেন। শুধু কমিশন পাওয়ার জন্যই এই অত্যাধুনিক যুগে অত্যাধুনিক কার্যকর জঙ্গি বিমানের পরিবর্তে, অকার্যকর সেকেলে পুরোনো মাল ভাঙা লোহার বিমান ক্রয় করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার আশীর্বাদে শেখ রেহানা এই রকম এক একটি ডিল-এ কাজ করে হলেও শত শত কোটি টাকা পেয়ে থাকেন।

কাদের সিদ্দিকী বনাম শেখ হাসিনা

দেশের বাইরে থেকে একমাত্র যিনি অসাধারণ কৃতিত্ব নিয়ে বিশাল এক মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন, বৃহত্তর টাঙ্গাইল জেলা, বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা এবং বৃহত্তর পাবনা জেলার অধিকাংশ অঞ্চল যিনি নিজের দখলে ও নিয়ন্ত্রণে রেখে সৃষ্টি করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্ত অঞ্চল। দেশ ত্যাগ করে ভারতে না গিয়ে বৃহত্তর টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চল জুড়ে গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশ। এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন মুক্ত অঞ্চলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কখনোই ঢুকতে পারেনি। পাকিস্তানী খান সেনারা যখনই মুক্তাঞ্চলে প্রবেশের চেষ্টা করেছে, তখনই প্রচণ্ড মার খেয়ে ফেরত এসেছে। এই মুক্তাঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি গড়ে তোলা হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের বেসামরিক প্রশাসন। এখানে যুদ্ধের সময় বেসামরিক প্রশাসক (আনোয়ার চৌধুরী) ছিলেন। নিয়োগ দেওয়া হতো থানা কর্মচারী (সেকেন্ড অফিসার, দফাদার, এসিস্ট্যান্ট, এস আই) ও কর্মকর্তাদের। গড়ে তোলা হয়েছিল বিচার বিভাগ। সাংস্কৃতিক বিভাগ। শুধু বাংলাদেশেরই না, সারা বিশ্বের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এমন নজির খুঁজে পাওয়া যাবে না। মুক্তিযুদ্ধের বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন উদাহরণ সৃষ্টি করেছিলেন যিনি, তিনি হচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের কিংবদন্তি নায়ক বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে সবাই তাকে বাঘা সিদ্দিকী বলে ডাকতো। তাঁর নাম শুনলে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর জেনারেলদের পর্যন্ত আতঙ্কে বুক কেঁপে যেত।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করলে একমাত্র বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকীই ঐ হত্যার প্রতিবাদ করে। শেখ মুজিব হত্যার পর কাদের সিদ্দিকী নিজেকে শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্র দাবী করে, '৭১-এর মতো পুনরায় যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধ ছিল কাদের সিদ্দিকীর জীবনে এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে সবচাইতে

বড় রাজনৈতিক ভুল। এই যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকীর সঙ্গে জনগণের অংশ গ্রহণ তো দূরের কথা, সাধারণের সমর্থনও ছিল না। '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডকে জনগণ সমর্থন করেছিল কিনা যদিও এটা তর্কসাপেক্ষ বিষয়, তথাপি এটা নিশ্চিত বলা যায় ঐ হত্যাকাণ্ড জনগণ নীরবে গ্রহণ করেছিল। সেই জন্যই শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদে কাদের সিদ্দিকীর ১ম বার যুদ্ধ জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদ যুদ্ধে জনগণ শামিল তো হয়নি, এবং যে হাজার তিনেক যোদ্ধা কাদের সিদ্দিকীর সাথে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, জনগণ তাদের বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনীর কাছে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল। ঐ যুদ্ধ তাতে দাঁড়িয়ে ছিল শেখ মুজিব হত্যা পরবর্তী বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশের আপামর জনগণের বিরুদ্ধে।

ফলে '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকী বিজয়ী হলেও, '৭৫-এর শেখ মুজিব হত্যার প্রতিবাদ যুদ্ধে কাদের সিদ্দিকী এবং তার বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাদের সিদ্দিকী নির্বাসনে ভারতে চলে গেলে শেখ মুজিব কন্যা শেখ হাসিনা তাকে ধর্মের ভাই ডাকেন। সেই থেকেই তাদের ধর্মের ভাই বোনের সম্পর্ক এতোই গভীর ছিল যে, কাদের সিদ্দিকী মাংস খেতেন না বিধায় শেখ হাসিনা ইলেকট্রিক হিটার এবং মাছ কিনে কাদের সিদ্দিকী যে হোটেলে থাকতেন সেখানে গিয়ে নিজে রান্না করে কাদের সিদ্দিকীকে খাওয়াতেন। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যেই বলতেন একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ছাড়া পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। এবং কাদের সিদ্দিকীই তার পিতা শেখ মুজিবের একমাত্র উত্তরসূরী। শেখ হাসিনা বলতেন সারা জীবন কাদের সিদ্দিকীর কি-প্রকারণীর আর অবদান কাদের সিদ্দিকীর ঋণ তিনি শোধ করতে পারবেন না।

১৯৮১ সালের ১৭ই মে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার প্রাক্কালে কলকাতা দমদম বিমান বন্দরে বলেন, দেশে ফিরে তাঁর একমাত্র কাজ হবে বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরী তাঁর ধর্মের ভাই কাদের সিদ্দিকী ও তাঁর যোদ্ধাদেরকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করা। কিন্তু দেশে ফিরে এসে শেখ হাসিনা তাঁর ধর্মের ভাই শেখ মুজিবের উত্তরসূরী কাদের সিদ্দিকীকে ফিরিয়ে আনার কার্যকর কোন ব্যবস্থা না নিলে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর সহধর্মিণী নাসরিন সিদ্দিকী "বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন সংগ্রাম পরিষদ" নামে একটি নতুন সংগঠন করে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা ও লবিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ঝটিকা সফর করে কাদের সিদ্দিকীকে দেশে ফিরিয়ে আনার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করলে, শেখ হাসিনা এটাকে ভাল দৃষ্টিতে না দেখে ষড়যন্ত্র হিসেবে মনে করেন এবং নাসরিন সিদ্দিকী ও ঐ সংগঠনকে কুদৃষ্টিতে দেখতে থাকেন। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ভেতরে ভেতরে তা

সংগঠন আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর ঐ সংগঠনের সাথে সম্পর্ক না রাখার এবং বিরোধিতা করার নির্দেশ দেন।

১৯৯০ সালে তীব্র গণআন্দোলনে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ-এর পতন হলে, ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্রের দাবীদার শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম বাংলাদেশে ফিরে আসার সুযোগ নিয়ে ও প্রস্তুতি নেন। এবং যথারীতি শেখ হাসিনার সাথে টেলিফোনে কাদের সিদ্দিকী তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে আলোচনা করলে শেখ হাসিনা সরাসরি কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করেন। এরপরও কাদের সিদ্দিকী স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে দৃঢ় থাকলে শেখ হাসিনা তাঁর দল আওয়ামী লীগকে কাদের সিদ্দিকীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কর্মসূচী ভন্ডুল (সাবোটাজ) করার নির্দেশ দেন।

১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীর উত্তম স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করলে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে সংবর্ধনা দিলেও শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের কোন নেতা-কর্মী ঐ সংবর্ধনায় যোগদান করেননি এবং এখান থেকেই শেখ মুজিবের চতুর্থ পুত্রের দাবীদার, শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, কাদের সিদ্দিকীর সাথে শেখ হাসিনার প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। এরপর থেকে শেখ হাসিনা তার ধর্মের ভাই কাদের সিদ্দিকীকে এক মুহূর্তও সহ্য করতে পারছেন না। শেখ হাসিনা প্রকাশ্যেই বলছেন আমি আছি বলেই কাদের সিদ্দিকী আছে। আমি না থাকলে কাদের সিদ্দিকীও থাকবে না। কাদের সিদ্দিকীর অবস্থা হবে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির পুত্র সঞ্জয় গান্ধীর স্ত্রী মেনকা গান্ধীর মতো। যতক্ষণ ইন্দিরা গান্ধী ছিল, মেনকা গান্ধীও ততক্ষণ ছিল। এখন ইন্দিরা গান্ধীও নাই, আর মেনকা গান্ধীরও খবর নাই। আমি না থাকলে কাদের সিদ্দিকীরও ঐ অবস্থা হবে। কোন খবর থাকবে না।

আর কাদের সিদ্দিকীও মাশাআল্লাহ্ কখনই শেখ হাসিনাকে নেত্রী বলে মানলেন না। স্বীকার করলেন না। কাদের সিদ্দিকীর ঐ একই কথা, শেখ হাসিনা আমার বোন আমি শেখ হাসিনার ধর্মের ভাই, আমিই শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্তরসূরী। নানাবিধ কারণে বিশেষত কৌশলগত কারণেই শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগে রাখেন, আওয়ামী লীগের এম, পি বানান। কাদের সিদ্দিকীও একই কারণে আওয়ামী লীগে থাকেন আওয়ামী লীগের এম, পি হন। শেখ হাসিনা ভাবেন হঠাৎ কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগ থেকে বের করে দিলে আওয়ামী লীগের কিছু ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া কাদের সিদ্দিকীও প্রকাশ্যে সরাসরি উঠে পড়ে তাঁর (শেখ হাসিনার) নেতৃত্বের বিরোধিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে। তার চেয়ে নিজের নিয়ন্ত্রিত দল আওয়ামী লীগে রেখেই কাদের সিদ্দিকীকে পটিয়ে নিতে হবে। কাদের সিদ্দিকীকে পটিয়ে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই শেখ হাসিনা কাদের সিদ্দিকীকে আওয়ামী লীগে রেখেছেন। কাদের সিদ্দিকীও

আপাতত নিজেকে আওয়ামী লীগে অবস্থান করার কৌশলগত অবস্থান নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষোভ প্রকাশ ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে পুলিশ পাঠানোর পরিকল্পনা করলে মটর সাইকেল আরোহী এর বিরোধিতা করে বলেন, সামান্যতম কৃতজ্ঞতা বোধ থাকলে আপনি এটা করতে পারেন না। ভুলে যাবেন না, আপনার পিতা-মাতা-ভাইদের যেভাবে যখন সিঁড়িতে লাশ ফেলে রেখেছিল, তখন সারা পৃথিবীতে একমাত্র কাদের সিদ্দিকী ছাড়া অন্য আর কেউ এর প্রতিবাদ করেনি। আর আজ আপনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার বাড়িতে পুলিশ পাঠালে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতার কাজ। আপনি এর মত অকৃতজ্ঞের কাজ করতে পারেন না।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, ওর (কাদের সিদ্দিকীর) ভাইরা সন্ত্রাসী। ওর ভাইদের ধরার জন্য ওর বাড়িতে পুলিশ যাবে।

মটর সাইকেল আরোহী বললো, কাদের সিদ্দিকীর ভাই মুরাদ সিদ্দিকী ও আজাদ সিদ্দিকী সন্ত্রাসীই হোক আর যাই হোক, তারা আপনার আমলে কোন নতুন করেনি, কোন অপরাধ করেনি।

অতীত দুর্দিনে যখন আপনার পিতা-মাতা-নিহত হয়েছিলেন, কাদের সিদ্দিকী, লতিফ সিদ্দিকী দেশের বাইরে নির্বাসনে ছিলেন, শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের নাম নেওয়ার কোন লোক ছিল না তখন নিরাপত্তা হীন পরিবেশে মুরাদ সিদ্দিকী ও আজাদ সিদ্দিকী এই দুই ভাই টাঙ্গাইলের মাটিতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নাম নেওয়ার জন্য যুবকদের সংগঠিত করতে থাকতে এবং শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ বিরোধী প্রশাসনের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হতে এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীদের খাতায় নাম চলে যায়। এবং বহু মামলা তাদের বিরুদ্ধে হয়। যেহেতু প্রশাসন দুর্নীতিপরায়ণ তাই কঠোর ব্যবস্থা না নিয়ে প্রশাসন এদের সাথে আপোষরফাতে চলে যায়। তাছাড়া আজাদ-মুরাদ এখন আর কোন ধরনের অপরাধের সাথে যুক্ত নয়। এসব কোন কিছুই আপনার অজানা নয়। আপনি সবই ভালভাবে জানেন। আপনার শাসন আমলে ওরা কোন ধরনের বেআইনী কাজের সাথে জড়িত থাকলে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়ার কঠোর হুঁশিয়ারী দিয়ে তাদের সতর্ক করে দেন।

প্রধানমন্ত্রী বললেন, না, কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতেই পুলিশ পাঠিয়ে ওদের ধরতে হবে।

মটর সাইকেল আরোহী বললো, শুধুমাত্র ক্ষোভ ঝাড়ার জন্য যদি কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে পুলিশ পাঠান, তাহলে পৃথিবীতে কৃতজ্ঞতা বলে কিছু থাকবে না।

ঠিক আছে তুমি বাধা দিতে পার না, অনুরূপ এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টেলিফোন ছেড়ে দিলেন এবং তিনিই কাদের সিদ্দিকীর বাড়িতে পুলিশ পাঠালেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের রাষ্ট্রপতি হওয়া

২৩শে জুন '৯৬, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেওয়ার পরে থেকেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ওঁর সঙ্গে একজনকে নতুন রাষ্ট্রপতি করা নিয়ে বেশ চিন্তাতে পড়ে গেলেন। কারণ যে লোকটিকেই তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করেন সেই লোকই ফিরে গেলেন। কোন কোন লোক আবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়ার থেকে মুক্তি চান। এই অবস্থায় মশিহুর রহমান সেন্টু ও বিশেষ সহকারী হাবিবুর রহমান সেন্টু (ঢাকা) জেলার সাবেক প্রধান নির্বাচনী ১৯৯৬ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এই বলে পরামর্শ দেন যে, কেউই যখন রাষ্ট্রপতি হতে ইচ্ছুক নন, তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকেই নতুন রাষ্ট্রপতি করুন। কারণ মানুষের কাছে সাহাবুদ্দিন আহমেদ-এর একটি ভাবমূর্তি আছে, গ্রহণযোগ্যতাও আছে। তাকে রাষ্ট্রপতি করলে আপনার (শেখ হাসিনার) ভাবমূর্তি আরো বৃদ্ধি পাবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না, সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতি করা যাবে না। কারণ আমি (শেখ হাসিনা) যখন '৯১ সালের নির্বাচনের পর বলেছিলাম নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে, তখন সাহাবুদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে আমাকে বিদ্রূপ করে মুখ ভিজিয়ে বলেছিল নির্বাচন সম্পূর্ণ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছে। এইটা কোন বিচারপতির কথা? এইটাকে রাষ্ট্রপতি করবো না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রথমে বিচারপতি হাবিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলেন। বিচারপতি হাবিবুর রহমান বললেন, নেত্রী আপনি আমাকে ক্ষমা করে আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সেক্রেটারী বসিয়েছেন। এখন যদি আমি আবার রাষ্ট্রের কোন এক্সিকিউটিভ (নির্বাহী) পদে যাই তো আমার সম্পর্কে লোকজনের আমার কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকবে না। কোন মূল্য থাকবে না। আমাকে ক্ষমা করে রাষ্ট্রপতি না বানিয়ে আপনার আওয়ামী লীগের একটা সুযোগ দেন, যাতে আমি সব সময় আপনার পাশে থাকতে পারি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এরপর প্রেসিডেন্ট পদে সালাহউদ্দিন ইউসুফকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে সালাহউদ্দিন ইউসুফ বললেন, নেত্রী, আমার মাফ চাই না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, কেন যে রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতির কোন ক্ষমতা নেই, শুধু বসে বসে সরকারি খরচে আরাম আয়েশ করবেন।

এই কথা শুনে সালাহউদ্দিন ইউসুফ সোজা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার পা জড়িয়ে ধরে বললেন, নেত্রী আমার এলাকার জনগণের জন্য কিছু কাজ করার সুযোগ দেন।

এই সুযোগে মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না) সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে পুনরায় চাপ দিতে থাকে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা একসময় প্রেসিডিয়াম সদস্য বর্তমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব করলে আব্দুস সামাদ আজাদ বলেন, নেত্রী আমাকে মাফ করুন, দয়া করে আমাকে দল থেকে বাহির করবেন না। আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে মিনিস্টার (পররাষ্ট্রমন্ত্রী) ছিলাম। আপনার কাজ করার সুযোগ দেন। আমি দেখিয়ে দেব বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীদের কত যোগ্যতা ছিল।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রাষ্ট্রপতি করার জন্য কাউকেই খুঁজে পাচ্ছেন না। অর্থাৎ কেউই রাষ্ট্রপতি হতে চান নিজের নাক ছেড়ে পালিয়ে যান। এমনি সময়ে এসে উপস্থিত হলেন ৯১ সালের আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী বর্তমানে ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর এর আওয়ামী লীগ এম.পি হাজী মকবুল হোসেন। হাজী মকবুল হোসেন এম.পি বললো নেত্রী আমি ৯১ সালে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ছিলাম। আপনিই (শেখ হাসিনা) আমাকে রাষ্ট্রপতি প্রার্থী করেছিলেন। এখন কেউই রাষ্ট্রপতি হতে চাচ্ছেন না, তখন আমাকেই রাষ্ট্রপতি করে। নইলে মন্ত্রী করেন। কিছু একটা করেন।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, না, আপনাকে কিছুই করা হবে না। মনে নেই, '৯১-এ আমার বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। আমার সম্পর্কে নানা কথা প্রকাশ করেছিলেন। আপনাকে কিছুই করা হবে না। এম.পি করেছি এটাই যথেষ্ট।

এই পরিস্থিতিতে ২১শে জুন ১৯৯৬ মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বুঝালেন রাষ্ট্রপতির তো কোন কাজ আরাম আয়েশ করা আর ফিতা কেটে উদ্বোধন ছাড়া অন্য কোন কাজ নেই। রাষ্ট্রপতির হাতে কোন নির্বাহী ক্ষমতা নেই। মন্ত্রী পরিষদ সরকারের রাষ্ট্রপতি হলো সাজানো পুতুল। যেভাবে আপনি নাচাবেন সেইভাবেই রাষ্ট্রপতিকে নাচতে হবে। এই সুযোগ আপনি হাত ছাড়া করবেন কেন? সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি বানিয়ে আপনাকেই কোন ক্ষতি দেখবেন না? বরং দেওয়ার সুযোগ হাত থেকে গেলে কিন্তু আর ফায়দা নিতে পারবেন না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন বলেন, ঠিক আছে সাহাবুদ্দিনকেই রাষ্ট্রপতি করি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ২৩শে জুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়ে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে এক বার্তা দিয়ে তাকে নতুন রাষ্ট্রপতি হওয়ার আহ্বান করেন এবং রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাসের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদকে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন।

বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা

১৯ সালের নভেম্বর মাসের ১ম সপ্তাহের এক বিকেলে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনের নীচতলার পূর্ব দিকের রুমে ব্রিফিং করে প্রধানমন্ত্রী এসে তাঁর নির্ধারিত আসন গ্রহণ করলেন। শেখ রেহানা এবং তার স্বামী শফিক সিদ্দিকী, চাচাতো বোন দুদু, মিনা এরা সবাই পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরী দেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পরামর্শ দেয়।

অর্থাৎ ১৯৯১ সালে ক্ষমতায় এসে বেগম খালেদা জিয়া এবং তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরী নাকি সাবেক শহীদ সদস্য ২৪৫ জনকে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে সাব-ইন্সপেক্টর পদে চাকরী দিয়েছে। আর এই অভিযোগে বেগম জিয়া ও মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির মামলা দায়ের করতে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্বুদ্ধ করতে তারা শলাপরামর্শ করতে থাকলে, মতিয়ুর রহমান রেন্টু ও বিরুদ্ধে মতামত দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তার আত্মীয়দের বুঝিয়ে বলেন যে, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে না খুঁচিয়ে বরং উঁহাদের মাথায় হাত বুলিয়ে চেষ্টা করে দেখেন, দেশের উন্নতি করতে পারেন কিনা। যদি একসাথে কোন কাজে দেশ গঠন করতে পারেন, তাহলে দেশবাসী শুধু আপনাকেই না, আপনার বাবা শেখ মুজিবকেও সারাজীবন স্মরণ করবে। বি. এন. পি ও বেগম খালেদা জিয়াকে ভেঙ্গে দিয়ে আপনি দেশ গড়তে পারবেন না। তেমনি আপনাকে এবং আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে কেউ দেশ গড়তে পারবে না। আপনি এবং খালেদা জিয়া এই দুই শক্তির ঐক্য ছাড়া কিছুতেই দেশের মঙ্গল করা যাবে না, দেশের উন্নয়ন করা যাবে না। বিদেশ, বিদেশী শত্রুরা শত্রুতা বাড়িয়ে দেয়। বেগম জিয়া আপনার আগের প্রধানমন্ত্রী, তাকে (বেগম জিয়াকে) বড় বোন হিসেবে বুকে টেনে নিয়ে, দেশের উন্নয়নের চেষ্টা করেন। তাতে আপনারই লাভ হবে অনেক বেশি। তা না করলে আপনার (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার) ক্ষতি হবে, দেশের ক্ষতি হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, তুমি জান না, খালেদা জিয়া জামাত আর যুদ্ধাপরাধী লোকদের পুলিশে চাকরি দিয়েছে।

মতিয়ুর রহমান রেন্টু বললেন, এটা স্বাভাবিক কথা। আমরা শুনেছি টাকা নিয়ে ওরা পুলিশে চাকরী দিয়েছে। তারপর যদি ধরে নেই চাকরী পাওয়া সকলেই ছাত্রদল, যুবদলের লোক, তবুও তারা বাংলাদেশেরই মানুষ। বেগম জিয়া ২৪৫ জনকে চাকরী দিয়েছে। সেই পথ ধরে আপনি (শেখ হাসিনা)

ভক্তদেরকে মুখ দিয়ে ৭,০০০ (সাত হাজার) জনকে চাকরী দেন। কিন্তু মামলা করলেন না। মামলায় কোন কাজ হবে না। মামলা করলে বরং আপনি ছোট হয়ে যাবেন।

সব ক্ষমতাই তোমাদের হাতে, তোমাদের আপনই। এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপরে তার শয়ন কক্ষে চলে গেলেন। এরপর প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানা, তাঁর স্বামী শফিক সিদ্দিকী এবং তাদের ছেলে ও জামাতা মোহাম্মদ মশিউর রহমান সেন্টু, কিভাবে মশিউর রহমান সেন্টুকে চাকরী দিয়েছেন বললেন।

তবে ডিবি পুলিশের এই চাকরী কেলেঙ্কারি ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি অপরাধের দায়ে দুর্নীতি দমন ব্যুরো ১৯৯৬ সালের ২১শে ডিসেম্বর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করে।

শেখ মুজিবের ছোট মেয়ে শেখ রেহানার স্বামী শফিক সিদ্দিকী এবং শেখ হাসিনা, রেহানার মেয়েকে কোলে নিয়ে খুকু ও শিশু।

গঙ্গা ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং গোলামীর চুক্তি

ভারতের পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু '৯৬ সালের শেষের দিকে বাংলাদেশ সফরে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বাংলাদেশে এসেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন গণভবনে চলে এলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে কয়জন ভারতীয় অভিভাবক আছেন, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তাদের মধ্যে অন্যতম। শুধু অন্যতমই না, শেখ হাসিনা পরিবারের ভারতীয় অভিভাবকদের মধ্যে জ্যোতি বসু সবার শীর্ষে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রেহেনা সপরিবারে যখন ভারতে ছিলেন তখন ভারতীয় মুরুব্বী বা অভিভাবকদের মধ্যে জ্যোতি বসুর সান্নিধ্য ও স্নেহ পেয়েছেন সবচাইতে বেশী। জ্যোতি বসু পিতৃতুল্য স্নেহ মমতা ও সান্নিধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছেন শেখ হাসিনা ও রেহানাকে। ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে ফিরে আসার পর শেখ হাসিনা যত বার ভারতে গিয়েছেন (প্রতি বছর ৩/৪ বার তো গেছেনই), মূলত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সাথে শলাপরামর্শ করেই ফিরেছেন। জ্যোতি বসুদের বহু সাধনার ফসল আজ শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। ভারতের পশ্চিম বাংলা রাজ্যের সেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু আজ এসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনে। গণভবনের গেটে ঢুকতেই আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে থাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দৌড়ে এসে জ্যোতি বসুর পায়ে পড়ে কদমবুসী দিলেন। দীর্ঘদিন পর পিতা ঘরে এলে নাবালিকা কন্যা যেই রকম খুশী হয়ে পিতার পায়ে পড়ে, ঠিক সেই ভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ্যোতি বাবুর পায়ে পড়লেন। তারপর গণভবনের ভেতরে আদর করে নিয়ে বসালেন এবং আগে থেকে তৈরী করে রাখা নানা রকমের খাবার, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই পরিবেশন করে জ্যোতি বাবুকে খাওয়ালেন। জ্যোতি বাবু খেতে খেতে পারিবারিক, রাজনৈতিক এবং ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলতে থাকলেন। এক পর্যায়ে জ্যোতি বাবু বললেন, দেখ মা, গঙ্গার পানির কিছু পাবে না। আমিই পাই না, তুমি কিভাবে পাবে?

আমি প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড় এর সাথে আলোচনা করে দেখেছি, তুমি গঙ্গা চুক্তি করে ফেল। তাতে করে তুমি জল না পেলেও, তোমার বিরোধীরা গঙ্গার জল, গঙ্গার জল বলে রাজনৈতিক ইস্যু আর তৈরী করতে পারবে না। এই সুবিধাটা তুমি পেয়ে যাবে। ৩০/৪০ (ত্রিশ চল্লিশ) বছরের একটা চুক্তি করে ফেল। তুমি আবার প্রথমেই ৩০/৪০ বছর-এর কথা বলতে যেয়ো না। তুমি বলবে ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদের গঙ্গাচুক্তি করতে চাই। তোমার বিরোধীরা এই ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদ নিয়ে চিল্লা চিল্লি করতে থাকবে, পরে আমি ৩০/৪০

(বিশ/তিরিশ) বছর মেয়াদ-এর চুক্তি করে দেব। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর সাথে আমার এই ব্যাপারে কথা হয়েছে। তুমি এভাবেই কাজ চালিয়ে যাও। আর একটা কথা যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের সাথে তুমি সহসা একটা চুক্তি করে ফেলবে। ওদের পুলিশ (বাঙালী-মুক্ত) ওদের থাকবে, ওদের কর্মচারী ওদের থাকবে। ওখানে কখনো কিছু তুমি (সরকার) করতে চাইলে উপজাতীয়দের অনুমতি নিয়ে করবে। এটা আমি কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের কথা দিয়েছি। খুব শিগ্র সময় তুমি পার্বত্য উপজাতীয়দের সাথে এই চুক্তি সম্পাদন করবে। এই চুক্তির নাম হবে শান্তি চুক্তি।

এতে তোমারও লাভ হবে। তুমি প্রচার করবে পাহাড়িদের যুদ্ধ লড়াই বন্ধ করতে শান্তি চুক্তি করেছ। সারা দুনিয়ায় তোমার পক্ষে শান্তি প্রতিষ্ঠা হইবে। তোমার প্রশংসা হবে। বলা যায় না তুমি নোবেল পুরস্কারও পেয়ে যেতে পার।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সুবোধ বালিকার মতো শুধু জ্বি আচ্ছা, জ্বি আচ্ছা, বলতে লাগলেন।

জ্যোতি বসু বললেন, আর একটা লাভ তোমার হবে। বল তো কি লাভ? ওরা খুশি হবে।

ওরা খুশি হলে কি হবে? পার্বত্য চট্টগ্রামের পার্লামেন্টের তিন (৩) টি আসনই তুমি পাবে। যেমন গোপালগঞ্জের তিন (৩) আসন পাও।

আর [illegible] তিনবিঘা (দেশটি) দেওয়া এখন তো তোমার পিতার সাথেই আমাদের কথা হয়েছিল। তুমি এখন তোমার সুবিধামত সময়ে আমাদের (ভারতকে) এগুলো দিয়ে দাও। বেশি দেরি করো না কিন্তু। আমি বেশি বয়সের মানুষ কিছুদিন পর ভুল হয়ে যেতে পারে, বুঝলে?

পশ্চিম বাংলা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কাজ শেষে চলে গেলেন। তারপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেব গৌড়া বাংলাদেশ সফর করে গেলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিল্লি সফরে গেলেন এবং পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বাবুর বানানো ৩০ বছর মেয়াদ-এর গ্যারান্টিহীন পানিচুক্তি করে এলেন। এরপরই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ফুফাতো ভাই ও জাতীয় সংসদের তৎকালীন চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহকে প্রধান করে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি করলেন। এবং জ্যোতিবাবুর নীল নক্সা অনুযায়ী স্বাক্ষরবিহীন, সকল কর্মচারী বিহীন এবং সকল কর্তৃত্ববিহীন পাহাড়ী উপজাতি শান্তি চুক্তি করলেন।

এই শান্তি চুক্তি অনুযায়ী (১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন অঞ্চল ঠিক করতে পারবে না। এবং ঐ অঞ্চলের শাসনভার আঞ্চলিক উপজাতীয়রাই সমাধান করবে ও গঠন করবে।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থানীয় কোন কর্মচারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কর্মচারী হবে না। উপজাতীয়রাই উপজাতীয়দের মধ্য থেকে ঐ সকল কর্মচারীদের নিয়োগ দিবে, পদোন্নতি দেবে এবং বরখাস্ত করবে।

(৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের জলাশয়, ভূমি, বন ইত্যাদি যা কিছু আছে, উপজাতীয়রা যদি অনুমতি না দেয় তাহলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অধিগ্রহণ বা গ্রহণ করতে পারবে না।

ডঃ মহিউদ্দিন মন্ত্রী

১৯৯৮ সালের রমজান মাস। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারী বাসভবন গণভবনে দেশের নামকরা ব্যক্তি, সরকারী কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, বিদেশী কূটনীতিকদের সম্মানে ইফতার পার্টি। গণভবনের ভেতরের বিশাল মাঠে বিশাল প্যান্ডেল, বিশাল আয়োজন। অধিকাংশ অতিথি এসে গেছেন। এমন সময় ডঃ কামাল হোসেন তার দুই মেয়েকে সাথে নিয়ে পশ্চিম দিক থেকে প্যান্ডেলের দিকে এগিয়ে আসছেন। প্যান্ডেলের পূর্ব দিকের গেট থেকে বের হয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা দেখা মাত্র চিৎকার করে ডঃ কামাল হোসেনের দিকে হাত উঁচিয়ে বলে উঠলেন, ঐ যে, ঐ যে, সব চোরা আসছে, সব চোরা আসছে। এই, এই সব চোরাকে ঘাড় ধরে বের কর। সব চোরা যেন আসতে না পারে, না আসতে পারে। ওদেরকে ঘাড় ধরো।

এরপর রাষ্ট্রপতির সচিব ডঃ কামাল হোসেনকে প্যান্ডেলের পশ্চিম পাশের এক কোণে একটা টেবিলে নিয়ে বসালেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘুরে ঘুরে ইফতার পার্টিতে আগত অতিথিদের খোঁজ খবর নিচ্ছেন, কুশলাদি বিনিময় করছেন। কিন্তু ডঃ কামাল হোসেনের দিকে গেলেন না। প্যান্ডেলের এক টেবিলে অন্যান্য অতিথিদের সাথে মাথা নিচু করে বসে আছেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন এই দিকে এলেন ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর সাথে সাথে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এবং এমনভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সালাম দিলেন যে, এটা সালাম, না পায়ে হাত দিয়ে কদমবুসি আশপাশের খুব কাছের লোক ছাড়া অন্য কেউই তা বুঝতেই পারলো না।

ইফতার পার্টির অনুষ্ঠান শেষে বঙ্গবন্ধুর পীর ভবন ৫ (পাঁচ) নাম্বার ড্রইংরুমে বসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইফতার পার্টিতে আসা ২/৪ জন আমন্ত্রিত অতিথিদের সাথে আলাপ করতে যেয়ে বললেন, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী বানাতে হবে। মতিন সাইফুল্লাহ আকোবী বললো, মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী বানাবেন কি জন্য?

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আমার ক্ষমতায় আসার পেছনে মহিউদ্দিন খান আলমগীরের অনেক অবদান আছে।

মতিন সাইফুল্লাহ আকোবী বললো, ডঃ মহিউদ্দিন খান আলমগীর রাজদ্রোহী। সে ছিলো বিএনপি সরকারের একজন কর্মকর্তা, তারপরও মহিউদ্দিন খান আলমগীর সরকারের সাথে বিদ্রোহ করেছে। তাকে মন্ত্রী বানালে তা সরকারের সাথে বিদ্রোহের পুরস্কার হিসেবে পরিগণিত হবে। এবং এটা সরকারের সাথে বিদ্রোহের পুরস্কারের উদাহরণ হয়ে থাকবে। আপনার সরকারেও অনেক সরকারী কর্মকর্তা আছে যারা আপনাকে পছন্দ করে না। সরকারের সাথে বিদ্রোহের পুরস্কারের এই উদাহরণ হয়ে থাকলে, সুযোগ পেলেই তারাও আপনার সরকারের সাথে বিদ্রোহ করবে। মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে মন্ত্রী করার আগে এই বিষয়টা খেয়াল রাখতে হবে। আপনি যদি সত্যিই মনে করেন আপনার ক্ষমতায় আসার পিছনে মহিউদ্দিন খান আলমগীরের অবদান আছে এবং আপনি তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। তাহলে আগে তাকে চাকরী থেকে অবসর দিয়ে উপদেষ্টা বানান। সরাসরি মন্ত্রী না করে বরং উপদেষ্টা বানিয়ে দেন। পরবর্তী পর্যায়ে পোর্টফোলিও দেখে তারপর উনাকে মন্ত্রী করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বললেন, আচ্ছা সেন্টু তুমি কি আমার সহপাঠী হয়ে কাজ করতে এসেছো নাকি আমাকে জ্ঞান দেবার জন্য?

না, নেত্রী আমি আপনাকে বাধা দিতে বলছি না।

তাহলে তুমি এতো কথা বলছো কেন?

আপনি বললেন তাই বললাম।

এখানে তো আরো অনেকেই আছে, কই কেউ তো তোমার মতো বাধা দিচ্ছে না? তুমি এত কথা বলছো কেন?

আগে থেকেই বলে এসেছি, পুরোনো অভ্যাস তাই বলি।

আগে বলছো, তখন আমি শেখ হাসিনা ছিলাম। এখন আমি প্রধানমন্ত্রী।

যতদিন আমি আপনার সাথে আছি, ভালো-মন্দ বলে যাব, শোনা না শোনা, করা না করা আপনার ব্যাপার।

এখনো প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা তো শেষ নাই। দেখেন। এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা করে গেছেন। [illegible] প্রতি[illegible]র মন্ত্রী হলেন।

(ক) প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারি বাসভবন গণভবনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের [illegible] [illegible] [illegible] ও তার কন্যা [illegible]।
(খ) গণভবনের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কন্যা [illegible]।

(গ) গণভবনে [illegible] [illegible] [illegible], বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

অবাঞ্ছিত ঘোষণা

মজিবুর রহমান সেন্টু ও মিসেস মজিবুর রহমান সেন্টু (মহুয়া) অবাঞ্ছিত হলো। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মজিবুর রহমান সেন্টু ও মিসেস মজিবুর রহমান সেন্টু (মহুয়া) কে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে পুলিশ, এস বি, এন এস আই, ডি জি এফ আই, সি আই ডি, ডি বি সহ রাষ্ট্রের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যাতে সকল [illegible] নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এই অবাঞ্ছিতরা প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এবং প্রধানমন্ত্রী যে সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন সেই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারবে না। [illegible] প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, কার্যালয় এবং অনুষ্ঠানে যোগদান করতে না পারে সেই দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেওয়া হলো। এবং এই অবাঞ্ছিত ঘোষণা সব পত্রিকায় প্রকাশ করা হলো।

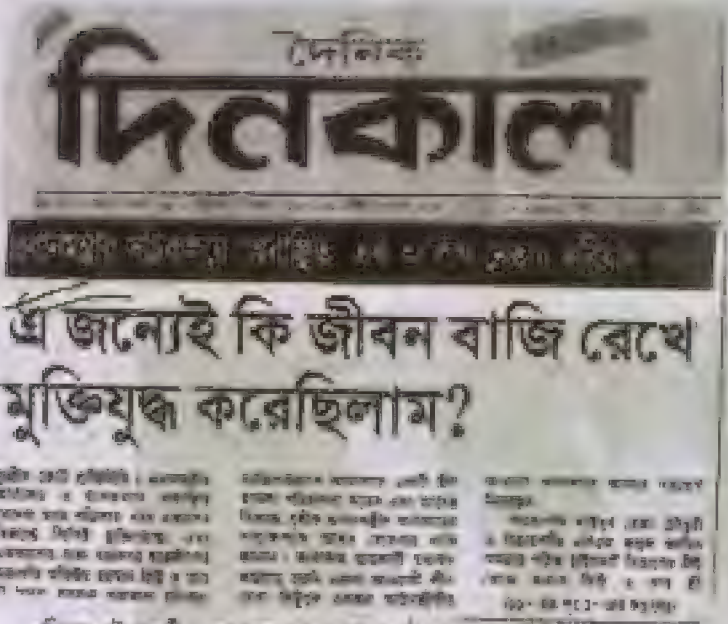

দৈনিক

দিনকাল

এ জন্যেই কি জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম?

[illegible]

পত্রিকার এই কপিটি [illegible]

দৈনিক দিনকাল-এর ১ম পাতা থেকে নেয়া

দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ

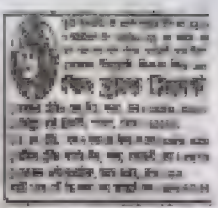

অবাঞ্ছিত ঘোষণা

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে ৬ ব্যক্তিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হইয়াছে। ব্যক্তিরা হইতেছেন : খন্দকার মাহবুব লিন্টু, [illegible] লিন্টু, মো: [illegible] হোসেন, মো: [illegible], কেএম

(শেষ পৃঃ ৮-এর কঃ দ্রঃ)

অবাঞ্ছিত ঘোষণা

(১ম পৃঃ পর)

[illegible] এবং মো: [illegible] রহমান মিলন ([illegible] মিলন)। ইঁহারা যাহাতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, গণভবন (গণভবন) এবং তাহার যাবতীয় অনুষ্ঠানাদিতে উপস্থিত থাকিতে না পারেন সে ব্যাপারে সকলকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

[illegible]

প্রধানমন্ত্রী সচিবালয়ে অবাঞ্ছিত ঘোষণার বিরুদ্ধে ছাত্রলীগ নেতার রিট

[illegible]

দশ টাকায় শেখ মুজিবের ছবি

এক সকালে সকালে অর্থমন্ত্রী কিবরিয়ার পি, এস, ডঃ শাহাদত, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন গণভবনে এসে দশ টাকার শেখ মুজিবের ছবির লেআউট ডিজাইনের নমুনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেখান। নতুন এই দশ টাকার লেআউট ডিজাইনের নমুনা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মৌখিকভাবে অনুমোদন করে দিলে তবেই তা ছেপে নতুন দশ টাকার নোট হিসেবে বাজারে ছাড়া হবে। এই দশ টাকার নমুনা লেআউট ডিজাইনের উপরে ছিল আল্লাহর ঘর মসজিদের ছবি। এবং পিছনে ছিল শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের ছবি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লেআউট ডিজাইনের নমুনাটি দেখে অর্থ মন্ত্রীর পি, এস ডঃ শাহাদতকে লক্ষ্য করে বলে উঠলেন, একি! আমার পিতার ছবি পিছনে কেন?

অর্থমন্ত্রীর পি, এস ডঃ শাহাদত কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, বাজারে চালু বর্তমান দশ টাকার নোটের উপরে মসজিদের ছবি আছে। ধর্মীয় অনুভূতির কথা বিবেচনা করে উপরের মসজিদের ছবিটা ঠিক রেখে, পিছনে আপনার পিতার ছবি দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, ওসব মসজিদ-টসজিদ বুঝি না, আমার পিতার ছবি উপরে দিয়ে নতুন দশ টাকার নোট ছেপে বাজারে ছাড়বেন। আমার বাবা যে জাতির পিতা এটা সবাইকে জানতে হবে।

এরপর আর একদিন ডঃ শাহাদত শেখ মুজিবের ছবি উপরে এবং মসজিদের ছবি পিছনে দিয়ে করা লেআউট ডিজাইন নিয়ে এলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তা দেখে খুশি হন এবং মৌখিক অনুমোদন করে দেন। বর্তমানে বাজারে শেখ মুজিবের ছবি সম্বলিত যে নতুন দশ টাকার নোট এসেছে এটা সেটি।

[illegible]

10
10

10
10
BANGLADESH BANK

10
10

10
10
BANGLADESH BANK

[illegible]
[illegible]

পুলিশের গুলিতে কেউ মারা যায়নি

শুধু লাশ নেই : মানুষের লাশ। ১৯৯০ সালে জাতীয় স্বৈরাচার বিদায় করে গণতন্ত্র মুক্ত করতে দেশের বহু লোককে জীবন দিতে হয়েছে। শহীদ নূর হোসেনের রক্তে লেখা 'স্বৈরাচার নিপাত যাক গণতন্ত্র মুক্তি পাক' আন্দোলনে সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের পুলিশ বি. ডি. আর ও সেনাবাহিনীর গুলিতে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অনেক মানুষ প্রাণ দিয়ে নিহত হয়েছে। কিন্তু ১৯৯০ সালে এরশাদ পতনের পর বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদের নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে পরিচালিত ১৯৯১ সালের নির্বাচনে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত বেগম খালেদা জিয়া সরকারের পতন আন্দোলনে রাজধানী ঢাকা শহরে পুলিশ, বি. ডি. আর সেনাবাহিনীর গুলিতে কোনো লোকের নিহত হওয়ার খবর নেই। অথচ ১৯৯১ সালের পর থেকেই খালেদা জিয়া সরকারের পতনের লক্ষ্যে নানান ইস্যুতে শুরু হওয়া শেখ হাসিনার আন্দোলনে ঢাকা শহরে মোট ১০৩ (একশত তিন) জন লোক গুলিতে নিহত হয়েছে। তথাপিও এই নিহত হওয়া ১০৩ জন লোকের মধ্যে ১ জন লোকও পুলিশের বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার গুলিতে নিহত হয়নি।

১৯৯১ সালের নির্বাচনে জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়ে বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় আসার পর থেকে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খালেদা জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। কখনো জাতীয় প্রেসক্লাবের আন্দোলন, কখনো সচিবালয় ঘেরাও, কখনো স্পিকার ভবন ঘেরাও, কখনো নির্বাচন কমিশন ঘেরাও, কখনো মাগুরা উপনির্বাচনের দাবী, কখনো, তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন ইত্যাদি নানা ইস্যুতে ১৯৯২ সাল থেকে শুরু হওয়া এবং ১৯৯৬ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস হওয়া পর্যন্ত, শেখ হাসিনার সকল আন্দোলন, সংগ্রাম, ও হরতালের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে ২ জন, ৩ জন, ৪ জন করে মানুষ গুলিতে নিহত হয়েছে। এই নিহত হওয়া মানুষেরা কেউই পুলিশ বি. ডি. আর বা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হয়নি। অথচ এই নিহত হওয়া ১০৩ জনের সকলেই নাম গোত্রহীন, পরিচয়হীন, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা পরিচালিত খালেদা জিয়া সরকার পতন আন্দোলনে আওয়ামী লীগের পরিচয় বহনকারী একজন কর্মীও নিহত হয়নি। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নিহত হওয়া ব্যক্তিদের তার দল আওয়ামী লীগের কর্মী বলে দাবী করলেও, নিহতদের নাম পরিচয় খুঁজে পাননি। এবং বেগম খালেদা জিয়া সরকার বলেছেন নিহতরা নিরীহ পথচারী। আন্দোলনের সময় গুলিতে নিহত হওয়া ব্যক্তিরা নিরীহ পথচারী, না, রাজনৈতিক কর্মী সেটা মুখ্য বিষয় না। মূল বিষয় হলো, গুলিতে নিহত ব্যক্তিরা, পুলিশের গুলিতে নিহত হয়নি। বি. ডি.

আর-একজনও গুলিতে নিহত হলো না, নিহত হলো না সেনাবাহিনীর গুলিতে। অথচ আমাদের গুলিতে ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কেবল ঢাকা শহরেই ১০৩ জন মানুষ নিহত হলো। হোক না নিহতরা অজ্ঞাত পরিচয়। তবু নিহত হওয়ার আগে তো এদেশেরই মানুষ ছিল। কারা তাদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করলো? হত্যাকারীরা কারা? কি তাদের পরিচয়? কারা হত্যাকারীদের মানুষ খুন করার জন্য মদদ দিল? কারা হত্যার আয়োজন করলো? কার স্বার্থে এতগুলো মানুষ খুন করা হলো? বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ভাষায় নিহতরা পুলিশের গুলিতে নিহত না হলেও, খালেদা জিয়ার বি. এন. পির সন্ত্রাসীরা নিহতদের গুলি করে খুন করেছে। প্রতিটি আন্দোলন, হরতাল, ঘেরাও কর্মসূচিতেই এভাবে নিরীহ পথচারী মানুষ শেখ হাসিনার ভাষায় বি. এন. পির সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হতে লাগলো।

যে কোন ধরনের কর্মসূচির নির্দিষ্ট দিনের দুই দিন আগে ঢাকা শহরের সকল পেশাদারী খুনীদের কাছে মানুষ খুন করার জন্য অগ্রিম টাকা পৌঁছে দেওয়া হতো। পেশাদার খুনীদের বলা হতো, আমাদের আগামী কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনে লাশ চাই। মানুষের লাশ। হোক সে যে কোন মানুষের লাশ। এই দেওয়া হলো অগ্রিম টাকা। বাকি টাকা লাশ দেওয়ার পর। কর্মসূচীর নির্দিষ্ট দিনে কর্মসূচীর সফলতার দিকে নজর দেওয়া হতো না। ঘড়ির টিকটিকার সাথে তাকিয়ে থাকা হতো মানুষের লাশ পড়ার সংবাদের দিকে। মানুষের লাশ পড়ার নিশ্চিত সংবাদ না আসা পর্যন্ত, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার খাওয়াদাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকতো। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খুন হওয়ার চূড়ান্ত খবর না আসতো, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শুধু মাত্র চা আর সেই সাথে কেকবিস্কিট ছাড়া অন্য কোন কিছু খেতেন তো নাই-ই, শুধু ছটফট ছটফট করতেন—আর এখনো লাশ পড়লো না, এখনো লাশ পড়লো না, এরপর আমি কি করবো? কি কর্মসূচি দিব?

এখনো লাশ পড়লো না বলে চিৎকার পাগলের মত প্রলাপ বকতে থাকতেন এবং ২৯ নাম্বার মিন্টো রোডের দোতলা, নিচতলা পায়চারী করতে থাকতেন।

যেই মুহূর্তে মানুষ খুন হওয়ার সংবাদ বা লাশের সংবাদ নিয়ে আসা হতো, বঙ্গবন্ধু কন্যা বিছানায় পা এলিয়ে দিয়ে বলতেন, আমার ক্ষুধা লেগেছে, খাবার লাগাও।

এক দেড়ঘণ্টা স্বস্তি ও সুখের নিদ্রা শেষে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘুম থেকে উঠে, খাওয়া-দাওয়া করে তৈরী হয়ে হাতে রুমাল নিয়ে ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালের মর্গে লাশ দেখতে চলে যেতেন। হাসপাতালের মর্গে লাশ দেখে চোখে রুমাল চেপে ধরতেন। ফটো সাংবাদিকেরা ছবি তুলতো।

"লাশ দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না" -এই ক্যাপশন দিয়ে সেই ছবি পত্রিকায় ছাপা হলো।

সচিবালয় ঘেরাওয়ের এক কর্মসূচীর দিনে দুপুর পর্যন্ত এটা জেনে গেল। কিন্তু লাশ পড়ার কোন সংবাদ এলো না। এদিক-সেদিক তত্ত্ব খোঁজা পাঠালেন। কিন্তু লাশের কোন সংবাদ নেই। বঙ্গবন্ধু কন্যা উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠায় প্রায় উন্মাদ হয়ে প্রলাপ বকতে লাগলেন। সকাল দশটায় সচিবালয় ঘেরাও করার কথা। এখন পর্যন্ত একটিও লাশও পড়েনি। পুলিশ একটি টিয়ার গ্যাসও ছুড়েনি। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা বর্তমানে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ শুধু জাতীয় প্রেস ক্লাবের উল্টো দিকে এন. এস. আই. বিল্ডিংয়ের সামনে বিশাল একটি ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাম দিচ্ছেন। আর পুলিশ অফিসারদের সাথে গল্প করছেন। এদিকে বিজয় নগরে শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার চাইনিজ রেস্টুরেন্ট সুগন্ধা এর সামনে বসে অনশন করছেন কেন্দ্রীয় নেত্রী বর্তমান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। ১৯ নম্বর মিন্টো রোডের সরকারী বাসভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে সংবাদ এলো, লাশ ফেলার জন্য নিযুক্তদের কোন চেষ্টাও ঠিকঠাক হচ্ছে না। আর তাই লাশ ফেলা যাচ্ছে না।

অর্থাৎ পুলিশের মানুষ খুন করতে যে গোলাগুলিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, তার বিন্দুমাত্র পরিবেশও সৃষ্টি হচ্ছে না। শেখ হাসিনা ও আর সব আওয়ামী লীগের অবরোধের সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী ব্যর্থ হয়েছে। কোন রকম গোলযোগ হচ্ছে না। সব কিছু শান্ত ও স্বাভাবিক রয়েছে। কারণ পুলিশ মানুষ খুন করার সুযোগ পাচ্ছে না। এই কথা শুনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, যাও, কেউ যাও, তোফায়েল ভাইয়ের কাছে যাও, মতিয়া চৌধুরীর কাছে যাও। গিয়ে আমার কথা বল। সামান্য একটা কিছু করতে বল। আজ যদি কিছু না হয়, তাহলে আগামী দিনে কর্মসূচি দেওয়ার কোন যুক্তি থাকবে না। যাও তাড়াতাড়ি যেয়ে বল সামান্য গোলযোগ সৃষ্টি করতে।

ছুটে যাওয়া হলো, প্রথম তোফায়েল আহমেদকে বলা হলো, তোফায়েল ভাই নেত্রী সামান্য গোলযোগ সৃষ্টি করতে বলেছেন ....।

তখনই উত্তেজিত হয়ে গিয়ে তোফায়েল আহমেদ বললেন যাও এখান থেকে, আমি ওসবে বিশ্বাস করি না। আমি নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাস করি। আমি ঐ সবে বিশ্বাস করি না। আর একবারও তুমি আমাকে এসব বলবে না। তুমি যাও এখান থেকে।

এই কথা বলে তোফায়েল আহমেদ তাড়িয়ে দিল।

এরপর যাওয়া হলো মতিয়া চৌধুরীর কাছে। মতিয়া চৌধুরী সব শুনে প্রথমে চড়া গলায় বললো, আমি এইগুলো পারবো না।

সাথে সাথে ফুল দেবেন, বঙ্গে মতিয়া চৌধুরীকে একটা ধমক দিয়েই বলিয়া চৌধুরী তেজস্বী বিপ্লবের মতো ফুল দেবে বলে কাঁদলো, কেন আমি বাড়িয়ে দেব, আমি কি করতে পারি। তুমি বস, তুমি বস, বলে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ফুল খাও, ফুল খাও। এইদিকে একটি ফুল নেন, বলে সুরঞ্জিত এর মাথাকে ইশারা করলেন।

২৬ নভেম্বর বিকেলে শোনা গেলো পরিস্থিতি খারাপ হবে, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নরম এক হাত উঁচু নিয়ে বললেন, আমি লাশ চাই, যে করেই হোক লাশ চাই।

বেলা তখন ৩টা। জাতীয় সংসদের উত্তর পাশে মানিক মিয়া এভিনিউর কাছে মানুষ পুলিশের উপর পুলিশ অপেক্ষা করতে থাকলো। [illegible] থেকে একটি মিছিল এসে উঠলো। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের কর্মী [illegible] নাম ঠেকে মারতে শুরু করলো। [illegible] ২০/৩০ জন পাতির [illegible]। পুলিশের [illegible] গুলি [illegible]। [illegible] ১৫/২০ জন [illegible] পুলিশকে [illegible]।

২৬ নভেম্বর বিকেলে [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এই সংবাদ দেওয়ার আগে তিনি পূর্বনির্ধারিত [illegible] বললেন, কেন? [illegible] লাশ কই [illegible] হবেনা। [illegible] হাসপাতালে [illegible] আমাকে বলতে পারো। এই ফুল [illegible]।

[illegible] থেকে ফিরে এসে [illegible] লাশ পড়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা [illegible] মেডিক্যাল হাসপাতালের মধ্যে গিয়ে [illegible] সাংবাদিকেরা ছবি তুললেন। [illegible] ছবি ছাপা হলো।

নেতা ও উপদেষ্টাদের মাঝে সমস্যা

[illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের [illegible] না। [illegible] হাসিনা। [illegible] আওয়ামী লীগের [illegible] নেই। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগ [illegible] আওয়ামী লীগ [illegible]।

আওয়ামী লীগের [illegible] শেখ হাসিনা এবং তার [illegible] একবার না একবার [illegible] নাই। অবশ্য এ ক্ষেত্রে বর্তমান [illegible] এবং [illegible] ও অন্য মন্ত্রী

মোহাম্মদ নাসির আতিক্রম। এই দুই আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধুর শেখ হাসিনার সাথে একটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। হয়তো অপমান অপমান হওয়ার ভয়েই, কেবিনেটের আকারের দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন। তোফায়েল আহমেদ সম্পর্কে অবশ্য আছে তিনি আওয়ামী লীগে যোগদিন (মুক্তিযুদ্ধের) কথিত প্রতিনিধিত্ব করতেন। তার এই দাবিদাওয়া শেখ হাসিনা তোফায়েল আহমেদকে পাত্তাপক্ষে দাবিতে সাহস পেতেন না। তোফায়েল আহমেদও দলের রাজনৈতিক কনভেনশন ইত্যাদি ব্যাপারে শেখ হাসিনার প্রতিপক্ষ কখনই হয়ে উঠেন না। শেখ হাসিনা যা বলতেন, যা করতেন তোফায়েল আহমেদ তখনই তার কাজ মানতেন না। ক বিশ্লেষণ না করে নিজস্ব নিরপেক্ষ থাকতেন। এমন কি রাজনীতিতে শেখ হাসিনা যে অঙ্ক, জোট, জুলাই পেন্ডুলাম ফুল-খালাসীর সৃষ্টি করে দিলেন এবং সাথে তাতে যে চমকপ্রদ ফল করে দিলেন এর সবই তোফায়েল আহমেদ মানতেন। কিন্তু কখনই তাদেরকে অতিক্রম করতেন না। দলি আছে না ছুঁই পানি এমন একটা ভাবে তোফায়েল আহমেদ থাকতেন। কত সমাবেশের মঞ্চে কাজেই তোফায়েল আহমেদ পরীক্ষা ভাবে শেখ হাসিনাকে বলতেন, আপা আপনার গোলাপাঙ্গ বাহিনী ঠিক আছে তো?

শেখ হাসিনা তোফায়েল আহমেদের এই ধরণ খুবই পুলকিত হতেন। তার পর ও আছের সাথে বলতেন, ঝিনাইদহ ও হাজার, নরসিংদীতে ৫ হাজার, কুষ্টিয়াতে ৭ হাজার .....কক্সবাজার, খোকা ও আপা বাইশের বাহিনী আছে, আর শেখ তোফায়েলকে আমি বাহিনী দিব।

তোফায়েল প্রশ্ন করেন আর তোফায়েল বাহিনী? (তোফায়েল বাহিনী আর আমার কি কাজ আপনার মুখি।)

শেখ হাসিনা বলেন, আপা আমার একটা তোফায়েল বাহিনী তৈরী করে। তাকে দিয়েই লাশ পাহারা দিবে। নতুন কোনটা নিতে অসুবিধা হবে না।

এবার তবে তোফায়েল আহমেদ বললেন, যা বোঝা গেল ঠিক আছে তোমরা।

শেখ হাসিনা সভা সমাবেশ মিছিলে তোফায়েল মহীন কাউকেই তেমন এগোতে দেননা। কারণ সভা হয়েই শেখ হাসিনার বক্তব্য শেখ হাসিনার সাথে শেখ সভায় আসা যখন যে লোকই তোফায়েল সে লোকই হয় তাদের হাতের ছাতা, না হয় শেখ হাসিনার দেহরক্ষী হয়ে অপরাধিত হয়ে তাদের নিয়ে যেতেন। এক পর্যায়ে তোফায়েল শেখ হাসিনার বাসায় আসাই ছেড়ে দিয়েছিল। যে দু'একজন তোফায়েলকে আসতে তারা মতিউর রহমান চৌধুরী অথবা মিজানুর মতিউর রহমান চৌধুরী যে (অবশ্য) মিজানের সাথে অত্যন্ত ভদ্রতাবে বলতেন, একটু দেরীর সাথে শেখ করতে এসেছিলাম, শেখ কক্ষ কি সম্ভব হবে?

আপনি বসুন, দেখছি, বলে মতিয়ুর রহমান রেন্টু দোতলায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছে আসতো। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আত্মীয় স্বজন নিয়ে টেলিভিশনে ডিশ এন্টেনায় অথবা ভিসিআরে হিন্দি সিনেমা দেখছেন। সিনেমার সাথে নাচছেন। গাইছেন। হাসি ঠাট্টা করছেন।

হ্যাঁ, সভানেত্রী, বিভিন্ন কর্মসূচী না থাকলে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সারাক্ষণ আত্মীয়দের নিয়ে হিন্দি সিনেমা দেখেই দিন কাটান। হিন্দি ছবির মধ্যে যে ছবিতে অসৎ রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের খুন-খারাবী, খুন, আরো রাজনীতির হীন চরিত্র রয়েছে, বেছে বেছে সেই সকল হিন্দি সিনেমাগুলোই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সারা দিন ধরে দেখছেন। এবং রপ্ত করছেন। শুধু দেখা এবং রপ্ত করার মধ্যেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সীমাবদ্ধ থাকছেন না। হিন্দি সিনেমার রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীর চরিত্রে সমাজে খুন-খারাবী, খুনসহ যত অপকর্মের দৃশ্য চরিত্র দেখানো হয় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তা হুবহু নিজে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণের উপর বাস্তবে তা অনুশীলন করছেন।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাক্ষাৎকার প্রার্থী নেতাকে নিচে বসিয়ে রেখে মতিয়ুর রহমান রেন্টু দোতলায় এসে যখন বলতো, আপা কেন্দ্রীয় অমুক নেতা আপনার সাথে দেখা করতে চায়, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন হিন্দি ছবি দেখছেন, সেই কেন্দ্রীয় নেতা দেখা করতে চান শুনলেই অত্যন্ত খুব খুব রেগে রেগেমেগে বলে উঠতেন।

আবার মতিয়ুর রহমান রেন্টু নিচে এসে কেন্দ্রীয় নেতাকে বলতো, লিডার আপনি বাসায় যাচ্ছেন না? নেত্রী (শেখ হাসিনা) মাথা ব্যথা করে শুয়ে আছেন, অনেক রাত পর্যন্ত মিটিং করেছেন তাই এখন কোন সাক্ষাৎকার দেয়া যাবে না। আপনি বাসায় যাবেন না লিডার? নেত্রী হয়তো দুপুরেই আপনাকে বাসায় ফোন করে নেবে। ফোন করার পর আপনি চলে আসবেন। এইভাবে কৌশলে অনেক নেতাকে বিদায় করা হতো। নেতারাও বুঝতো যে, নেত্রীর কাছে তাদের কোন মূল্য নেই। নেতারাও বলতো ঠিক আছে, ঠিক আছে, নেত্রী ইচ্ছেমত আমাকে ফোন করে নিও। আমি বাসাতেই আছি।

কেন যে আর যাবে না এটাও নেতারা বুঝতো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সৌভাগ্যশালী থাকতে কেন নেতারা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর কাছে আসতো? কারণ অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে নেতারা জানতেন সোজা আত্মীয়দের কাছে গেলে, নিজের অপমান অপদস্থ হওয়া ছাড়া অন্য কিছু হওয়ার আশা নেই। শুধু পোষ্য-আত্মীয়রাই নয়, নেত্রীভক্ত চাকর বাকরদের কাছে গেলেও একই অবস্থা। তাই নেতারা মতিয়ুর রহমান রেন্টুর কাছে আসতেন শুধু এই ভরসায় যে, সভানেত্রী

(শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করতে না পারায়), অন্যান্য অপমান, অবহেলা ইত্যাদি সহ্য করে। সেজন্যে এই জনগণ তাদের প্রিয়তমা নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার অবদানই সবচেয়ে বেশি। বঙ্গবন্ধু কন্যা হাসিনাই শেখ হাসিনা ছাড়া দেশে নেতৃত্বের কথা ভাবতে পারেন, অপমান অবহেলা করতে পারেন সাধারণ মানুষের সাথে। এটাই তার বৈশিষ্ট্য।

রাজনীতি বিশ্লেষক মিস্টার ডেভিড বার্গম্যান মিস্টার ডেভিড (ছদ্মনাম) তাঁরা বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার আন্দোলনের একজন অনুরাগী ছিলেন না। এমন কথা এর আগেই আমেরিকার সরকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন। এবং এমনও বলেছেন। আমেরিকার স্বার্থের কারণে হলে, তাদের প্রেসিডেন্টের ভাষায়, প্রেসিডেন্টদের ভাষায় প্রেসিডেন্টরা আমাদের সাধারণ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আন্দোলন না, তা নয়। তিনি (শেখ হাসিনা) সবই জানতেন। তবু আমেরিকানই না, তাদের বাদই এদেশ ভাগীদার, অবশ্য, (আমেরিকার সাথে) আমাদের তিনি (শেখ হাসিনা) নীতিমালার পক্ষপাত নিতেন। এরা যেহেতু ধনবান, অবশ্য, প্রেসিডেন্ট যে এরা কখনই রাষ্ট্রপতির সাথে কি না তবু তাদের প্রেমের কারণে নিশ্চয় এরা সাহায্যও দিতো না।

আমেরিকা নীতির উপদেষ্টাদের আসলে এরই আমাদের আন্দোলন কখনো ছিল। কোন উপায়েই কখনও বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করতে পারে নি বলে তারা উপায়ন দেখায়। উপায়ন দেখায় বলে তিনি (শেখ হাসিনা) তাদের বিদায় জানিয়েছেন।

ভারত প্রীতি

মহিলা আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, সংসদীয় আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, আওয়ামী লীগের সভাপতি সম্পাদক হওয়ার এবং কি, এবং তিনি পরবর্তী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী হবেন কি না তা নিয়ে কিছু বলবো না। তবে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অনেক ভারতের সাথে তিনি কথা বলতেন, সেটা এই থেকে অনেক ক্যাসেট আছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সবকে সবচে কথোপকথন কি, কেমন এই যে? দুঃখের (দুঃখজনক) কথাকে যে কেমন করে নিজেই নেতৃত্ব দেয়াবে।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার মুখে এই কথা শোনার পর আমি কি রকমের 'ঘ' হয়ে ছিলাম। আমি একটি কথাও না বলে চুপচাপ বসে ছিলাম।

জিল্লুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারী

সম্প্রতি বত্রিশ বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরী ঘরে বসে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা, শেখ ফজলুল রহমান সেলিম, শেখ মারুফ এবং আরো কয়েকজন বসেছে। আওয়ামী লীগের আবদুর রাজ্জাকের পরে কাকে জেনারেল সেক্রেটারী করা যায় কথা উঠলে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বললেন, সাজেদা চৌধুরী ভালো মানুষ, তাকে জেনারেল সেক্রেটারী বানানো যায় না। তোমরা এমন একজন পুরুষের নাম বল, যে শুধু নামেই পুরুষ। কিন্তু সাজেদা আপা মেয়ে মানুষ হয়েও পুরুষালী। পুরুষ হিসেবে কোন পুরুষকে জেনারেল সেক্রেটারী বানানো যাবে না। পুরুষ হিসেবে কোন পুরুষকে জেনারেল সেক্রেটারী করলে, সে আমার আব্বাকেও হত্যা করে ফেলবে। একজন পুরুষকেই আমার সাধারণ সম্পাদক করতে হবে, যে পুরুষ, নামে পুরুষ কাজে পুরুষ নয়। আমার একজন মেরুদণ্ডহীন পুরুষকেই দলের সাধারণ সম্পাদক করতে হবে। তোমরা খুঁজে এমন একজনকে বের কর।

শেখ ফজলুর রহমান সেলিম বললেন, বুবু জিল্লুর রহমানকে বানালে কেমন হয়!

সাথে সাথে শেখ হাসিনা বললেন ঠিক, তুমি তো ঠিক বলেছ, এই তো সবচাইতে ফিটেস্ট।

শেখ মারুফ বললো, না, বুবু, (আপা) জিল্লুর রহমানকে বানানো যাবে না। জিল্লুর রহমান আর তার বউ আইভি, কি রকম ১৯৭৫ সালের পর তুমি আমাদের পরিবারের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে গেছেন। সুতরাং জিল্লুর রহমানকে তুমি জেনারেল সেক্রেটারী বানাতে পার না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন হ্যাঁ, জানি, তাতো জানি। এইজন্য সব দিক থেকে উপযুক্ত। জিল্লুর রহমানকেই করব জেনারেল সেক্রেটারী, কেন্দ্রে বসিয়ে রাখা যাবে। এই কেন্দ্র লাগাম হাতে না থাকলেও ইচ্ছামত চলতে পারবে না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ঠিকই পরিকল্পনা মত জিল্লুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বানালেন।

টাকা আর ভাত

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার রাজনৈতিক জীবনে দুটি জিনিস ছাড়া অন্য কোন কিছুই চিনেন নাই। জিনিস দুটির একটি হলো অর্থ, মানে টাকা পয়সা আর অন্যটি হলো খাদ্য, মানে মানুষের ভাত। এই দুটি জিনিস ছাড়া তার নিকট দেশ, কর্মী, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য যারা তার (বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার) কাছে এসেছেন তাদের কাছে কোনদিনই তিনি অন্য কোন কিছুই চেন

নাই। এমন কি ২৮শে সেপ্টেম্বর তার জন্মদিনে যারা টাকা না এনে ফুল নিয়ে কিছু উপহার নিয়ে আসলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে বললেন, এই ছবি আমি চাই না। আমি আশা করি। […]। নগদ টাকা ছাড়া অন্য উপহার আমি গ্রহণ করি না।

'৯৬ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গণভবনে বসেও তিনি একই কথা বলেছেন। অর্থাৎ তাই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রধান দাবী। আপনি সেই চোখ না দেখেন! যেখান থেকেই টাকা নিয়ে আসেন না কেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্য হাতে তাকে টাকা দিতে হবে। যদি টাকা না দেন তাহলে তার (শেখ হাসিনার) কাছে মানুষ হিসেবেই গণ্য হবেন না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হাতে হাতে টাকা দেবেন, এক হাতের টাকা না থাকে গেটের কাছে বসে তিনি (শেখ হাসিনা) আপনার কাছ থেকেই তুলে নেবে টাকার জন্য নতুন মন্ত্রণালয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিবেন। এমন ভাবে তিনি টাকা নেবেন, যেন তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আপনার কাছে টাকা রেখেছিলেন, তিনি শেখ হাসিনা পিতার উত্তরাধিকার হিসেবে পিতার টাকাই আপনার কাছ থেকে নিচ্ছেন। টাকা চাই-ই চাই। টাকা দিতেই হবে। চুরি করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে। কালো বাজারী বা অন্যায় করে টাকা এনেছেন, তাও দিতে হবে। মানুষ খুন করে টাকা এনেছেন তাও দিতে হবে। ঘুষ খেয়ে টাকা এনেছেন তাও দিতে হবে।

খুন করে এবং ঘুষ নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে খুশী করা যায়। টাকা না দিলে আপনাকে মৃত্যুদণ্ডের মামলা অন্যায় ভাবে দিয়ে দিতে পারেন, আবার টাকা দিলেই আপনাকে মামলা থেকে খালাস দিয়ে গোলাম বানাতে পারেন।

একদিন বাংলাদেশ পতিতা নারীদের […] বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার আদরের ভাই শেখ রেহানা। এমন সময় মাহমুদুর রহমান (শেখ মুজিবের পি. এ. যাকে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতার বাড়ীতে) […] এসে বললেন, নেত্রী তুমি একটা অনুষ্ঠান করতে চাও ___। মাহমুদুর রহমানের কথা শেষ না হতেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রেগে চোখ লাল করে উঠলেন। আপনাকে লোকটিকে বললেন, এখানে কি উৎপাটন করতে এসেছেন? সাম্প্রতিক আমাকে তারা দিয়েছিল, আমি যাব না। আমার এখানে বুদ্ধি বাজারী করতে? আপনি লোকজনকে আজেবাজে-বাজেবাজে লোক আর ঠিক নাই। আর আমি আজেবাজে-বাজেবাজে লোকের আজেবাজে-বাজেবাজে অনুষ্ঠানে যাব এটা

[illegible]

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা [illegible]

[illegible] শেখ হাসিনা [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible]

১৯৮২ সাল থেকে [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা [illegible]

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের [illegible]

আওয়ামী লীগের [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা [illegible]

শিল্পপতি [illegible]

শান্তির মাঝে না থাকা

বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বাংলাদেশে আসার পর থেকে আজ অবধি [illegible] একটি দিন বা একটি রাত শান্তি-তে ঘুমাতে পারেননি। [illegible] বাংলাদেশে আসার পর [illegible] সরকারী [illegible] হয়েছেন, [illegible] ১৯ জন [illegible] এবং [illegible] শাস্তি ও [illegible] এবং [illegible]। কিন্তু [illegible] স্বাধীনতা [illegible] ষড়যন্ত্র [illegible]। [illegible] ২১ [illegible] [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাও [illegible]। শুধু তাই-ই না, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible] [illegible] মানুষ [illegible] হতে পারেন না।

[illegible] বঙ্গবন্ধু [illegible], ১৯৮৭ সালে [illegible] টি. পি [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible] [illegible] না। [illegible] তিনি [illegible] [illegible] গেলেন।

১৯৮৮ সালে [illegible] টি. টি. [illegible] বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার [illegible]। [illegible] বঙ্গবন্ধু [illegible]। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible]। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা [illegible] [illegible] [illegible] নিলেন। [illegible] [illegible] বঙ্গবন্ধু [illegible]

এই ছবি এবার দেখা, ঈশ্বরের ভালো থাকার সময়ে ঈশ্বর কী করে।

এই সেই মানুষের মন যেটা ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলো, আজ হারায় এবং আজকের আমাদের মানুষের।

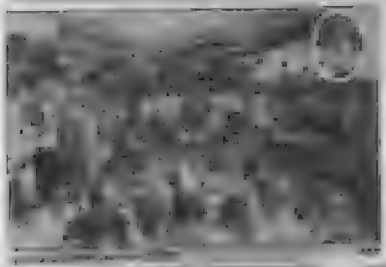

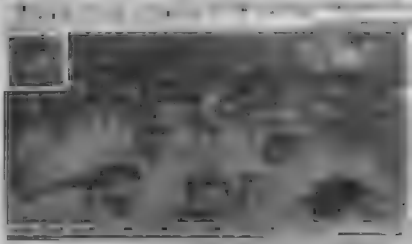

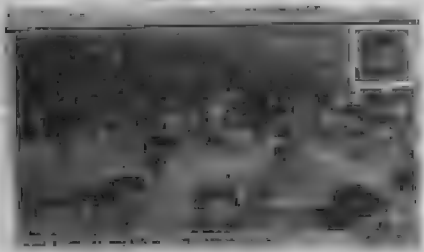

হিন্দুরা কেন আওয়ামী লীগ সমর্থন করে

এদেশের সকল হিন্দু একমাত্র আদমনে হিন্দুস্থানে বিশ্বাস করে। হিন্দুরা এই দেশে থাকলেও হিন্দুস্থান বা হিন্দুরাষ্ট্র ভারতকেই তাদের দেশ মনে করে। বাংলাদেশকে কখনোই হিন্দুরা তাদের দেশ মনে করে না। তবে তাদের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশ একদিন না একদিন হিন্দুদের বাবা ভারতের দখলে যাবে। আর এই বিষয়ে তারা আওয়ামী লীগকে নিকট বন্ধু মনে করে। এদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র আওয়ামী লীগই হচ্ছে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক দল, যে দলের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একদিন না একদিন হিন্দুস্থানের অধীনে নেওয়া যাবে। আর এই কারণেই এদেশের আপামর হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়। হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের মহাসচিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক এর মতে আওয়ামী লীগই হচ্ছে এদেশের একমাত্র রাজনৈতিক দল, যে দল ভারতের পাকিস্তান বন্ধু বা [illegible] ভারতকেই সমর্থন যোগাবে, শক্তি যোগাবে। এই জন্যই এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, শক্তি যোগায়। [illegible] শিক্ষিত কিছিং লোকগণের [illegible] মতে একদিন দেখা যাবে আওয়ামী লীগে কোন মুসলমানই থাকবে না। তখন এই আওয়ামী লীগই হিন্দু লীগ হইবো। আমরা জয় হিন্দে বিশ্বাস করি। জয় হিন্দ, জয় বাংলা। শোনেন নি কি? আমার জয় দুর্গা, জয় মা কালী, জয় বাংলা একই কথা। তাইতো আওয়ামী লীগ করছেন, ভয় করছেন কি? আওয়ামী লীগ তো আমা দিয়েই, এক সময় পুরাটা হিন্দু হইয়া যাইবো।

বাম প্রকাশে ভাঁওতাবাজ বাংলাদেশ আওয়ামী পার্টিদের সকল দল বিভাগের উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মকর্তার মতে আওয়ামী লীগ হচ্ছে সর্বোচ্চভাবে বিশ্বাসী দল এবং হিন্দু সম্প্রদায় আওয়ামী লীগে বিশ্বাসী সম্প্রদায়। এদেশের হিন্দুরা আওয়ামী লীগকে শুধু ভোটই দেয় না, অর্থ দেয়, বুদ্ধি দেয়। এবং তাদের শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এদেশের হিন্দু সাংবাদিকেরা সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষে পক্ষপাতিত্ব করে। [illegible] ও শিক্ষার ব্যাপারে হলো, হিন্দু বিচারপতিরাও বিচারে পক্ষপাতিত্ব করে। হিন্দু বিচারপতিগণ, বিচারপতির আসনে বসে প্রথমেই দেখার চেষ্টা করেন, বাদী বা বিবাদী কোন রাজনৈতিক দলের লোক বা সমর্থক। যদি আওয়ামী লীগের লোক বা সমর্থক হয়, তাহলে তাকে যতটা সম্ভব লঘু দণ্ড দেওয়া হয়। আর যদি আওয়ামী লীগের লোক বা সমর্থক না হয়ে অন্যদলের লোক বা সমর্থক হয় তাহলে তাকে যতটা সম্ভব কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়।

প্রশাসনে ও ব্যবসায় থাকা হিন্দু সম্প্রদায় বৈধ বা অবৈধ ভাবে তাদের উপার্জিত অর্থের একটা অংশ আওয়ামী লীগকে [illegible] দেয় এবং বাকি সম্পূর্ণ অংশ ভারতে পাচার করে।

পাচার

এই দেশের হিন্দু সম্প্রদায় চাকুরীজীবি হোক অথবা ব্যবসায়ী হোক, অবলীলাক্রমে এই দেশের সকল ধন-সম্পদ ভারতে পাচার করে। চাকুরীজীবি বৈধ-অবৈধ যেভাবেই অর্থ উপার্জন করুক অর্থাৎ সৎ পথে ঘুষ দুর্নীতির মাধ্যমেই অর্থ উপার্জন করুক কিংবা চাকুরীর বেতনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুক। যেইভাবেই উপার্জন করুক তাদের উপার্জিত সকল ধন-সম্পদই, ভারতে পাচার করবে। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। হিন্দু সম্প্রদায় কখনোই এই দেশকে তাদের দেশ মনে করে না। আর তাই এই দেশ থেকে বৈধ-অবৈধভাবে উপার্জিত সমুদয় অর্থ ভারতে পাচার করে।

অনুরূপভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবার পরিজন সকলেই এই দেশকে নিজের দেশ মনে করে না। আর সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা বৈধ অবৈধ যেভাবেই অর্থের উপার্জন করুক না কেন বাংলাদেশে একটি কুটোকড়িও রাখেন না। তাদের উপার্জিত সকল ধন-সম্পদ বিদেশে পাচার করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার পরিবারের লোকেরা প্রধানত ভারত, সিঙ্গাপুর, হংকং, লন্ডন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ধন-সম্পদ পাচার করে।

ভ্যাট প্রত্যাহার

১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার বি, এন, পি সরকার বাংলাদেশে প্রথম ভ্যাট প্রথা চালু করে। খালেদা জিয়া ভ্যাট চালু করার সময় তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দল আওয়ামী লীগ ভ্যাট প্রথা বাতিলের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে ভ্যাট প্রথা বাতিলের দাবিতে মিছিল সমাবেশ করে বেগম জিয়া সরকারকে নির্দিষ্ট সময় সীমা দিয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, এর মধ্যে ভ্যাট প্রথা বাতিল না করলে হরতাল শুরু হবে।

তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো আপনি যে ভ্যাট বাতিলের জন্য হরতাল আহ্বান করতে যাচ্ছেন, আপনি ক্ষমতায় গেলে কি করবেন? ভ্যাট প্রথা বাতিল করবেন?

পরবর্তী পাচ বছর, এই কথা বলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিরুদ্ধে ভ্যাট বাতিলের দাবিতে হরতাল করলেন। আর তিনি (শেখ হাসিনা) যখন ক্ষমতায় এলেন তখন ভ্যাট বাতিল তো দূরের কথা, উল্টো ভ্যাটের আওতা আরো বাড়িয়ে দিলেন। অর্থাৎ বেগম খালেদা জিয়া সরকার যে সকল পণ্যের উপর ভ্যাট বসিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সেই সকল পণ্যের উপর ভ্যাট বহাল তো রাখলেনই বরং যে সমস্ত পণ্যের উপর ভ্যাট ছিল না সেই সমস্ত পণ্যের উপর ও ভ্যাট ধার্য করলেন।

খেলা

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে [illegible]

[illegible]

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা [illegible]

প্রিয়-অপ্রিয়: পছন্দ-অপছন্দ

প্রিয় খাবার ঃ [illegible]

প্রিয় গান ঃ [illegible]

প্রিয় [illegible]

[illegible]

প্রথম নির্দেশ

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার [illegible]

যদি কোন কারণে ঠিক ব্যক্তিকে হত্যা করা না যায়, তাহলে বাপের মুখ নাও। টাকা দাও। টাকা দিয়ে ওকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসো।

১৯৯৬ সালে বাঙালী ভোট দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের দলকে ক্ষমতায় বসিয়েছে ২০/৩০ বছর আগে দেশ থেকে মুক্তিযুদ্ধে হারিয়ে যাওয়া, মুক্তিযুদ্ধের সামরিক শেখ হাসিনা সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত শিল্প ঋণ সংস্থার পরিচালক প্রফেসর আবুল আহসান সাহেব নিজ মুখে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে বলছেন, বঙ্গবন্ধুর ছেলের হিসেবে। আওয়ামী লীগের প্রার্থী কেবলমাত্র ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। আমাদের দেশের মানুষ আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না, ভোটও দেয় না।

এই সময় থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, অন্যের অবস্থাকে শক্ত করে আগুন লাগিয়ে দেও। আগুন লাগিয়ে ওদের পুড়িয়ে মেরে ফেলেন।

কোন নেতা ছিল না

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কখনোই কোন সিদ্ধান্তই কোন নেতা বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি অথবা উপদেষ্টা কিংবা মন্ত্রী-এমপি কোন ব্যক্তির সাথে আলাপ আলোচনা করে নিতেন না। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন তার চারপাশে থাকা কোন তোষামোদ এবং চাটুকারদের মতামত নিয়ে বা করে। এমন কি বঙ্গবন্ধু কন্যা কোন সমাবেশে, মিটিংয়ে ইত্যাদিতে মঞ্চে ওঠার সময় ওখানে কোন নেতা বা নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি তাঁর পাশে কখনোই থাকতেন না। কোন নেতা বা ঐ জাতীয় কোন ব্যক্তি ভুল করে যদি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রীর পাশে এসে পড়তো তাহলে তাঁর পাশে থাকা তোষামোদকারী ঐ নেতা বা ব্যক্তিকে ঠিকরুরি বা ধাক্কা মেরে দূরে সরিয়ে তাড়িয়ে দিতো। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এসব বুঝতেন না বা দেখতেন না তা না। তিনি এ সবই আনন্দের সাথে দেখতেন, মজা নিতেন, আর মিট মিট করে হাসতেন। সুতরাং বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ীই তার পাশে থাকা কোন তোষামোদকারী নেতাদের সাথে ঐ রকম চরম বেয়াদবী আচার-আচরণ করতে সাহস পেতো।

The Daily Star

চিন্তা ভাবনা ছাড়াই বলা

[illegible] না তোমরা [illegible] বাংলাদেশের [illegible] কখনই কোন আওয়ামী লীগের [illegible] নতুন কথা [illegible] চিন্তা ভাবনা না করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা মুখে যাহা আসে, তাই বলে ফেলেন বা তাই লেখালেখি দিয়ে দেন। [illegible] এবং [illegible] এর কথা [illegible], এই হলি বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা কেবলি কিছু বলে ফেলেন।

১৯৯৭ সালের ১০ই জানুয়ারি রমনা [illegible] প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বক্তৃতা করার সময় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার দলীয় সভায় মন্ত্রী মোশাররফ হোসেনের হাত তুলে দেখিয়ে বলে উঠলেন, "ড. মোশাররফ হোসেন ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিসে [illegible] সরকারী চাকরি ছিল। তার এই কথায় [illegible] তিনি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বললেন বা ঘোষণা করলেন বর্তমানে [illegible] মন্ত্রী মোশাররফ হোসেন [illegible] প্রধানমন্ত্রী থাকা শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রথম ক্যাডার (বিসিএস) সার্ভিসে [illegible] চাকরী বা নিয়োগ দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী হিসেবে এই কথা প্রকাশ্য বলার পর [illegible] বাংলাদেশ ক্যাডার সার্ভিস (বি. সি. এস ৭৫) ১৯৭৫-এর [illegible] অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় [illegible] হওয়া উচিত। এবং রাষ্ট্রের তৎকালীন প্রধান নির্বাহী বা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের আদেশে [illegible] চাকরী দেওয়ার অভিযোগে বিচার হওয়া উচিত। নইলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মান হানির মামলা হওয়া উচিত।

রাজা বাদশা রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের দুর্দিনের [illegible] একদিন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পুত্র জয়কে বললেন, "বাবা আমি আপনি যখন প্রধানমন্ত্রী হবেন তখন আপনার পাশে আমরা থাকি"।

জয় বললো, "প্রধানমন্ত্রী! রাষ্ট্রপতি! মানুষের কাছে ভোট ভিক্ষা করবো? সেই ভিক্ষা করে আমি কোন দিন রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হব না। যদি হতে পারি রাজা বাদশাহ হবো আমি, নইলে নাই।"

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা হেসে হেসে বললেন, "বাবা আমরা তো রাজাই, আগামীতে তো তুমিই রাজা হবা। তোমার নানা তো বাংলাদেশের রাজার ছিলেন, তোমার নানাই তো এই দেশ সৃষ্টি করেছে, এই দেশের মালিক ছিল। তখন বাঙালীর মানুষ তোমার নানাকে [illegible] দিয়েছেন [illegible]।

আলীবর্দী খাঁ যেমন বাংলার নবাব ছিলেন, তারপরে তাঁর নাতি সিরাজউদ্দৌলা নবাব হয়েছিল। তোমার নানা শেখ মুজিব প্রথমেও বাংলাদেশের রাজা ছিল, আগামীতে তুমিই বাংলাদেশের রাজা হবে। রাজা বাদশাদের আধুনিক নামই রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী।

ওয়াদা

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের আগে দুটো এবং প্রধানত তিনটি ওয়াদা করেছিলেন। এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াদার একটি হচ্ছে রেডিও টেলিভিশন এর স্বায়ত্বশাসন।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ (যে আইনে বিনা বিচারে যে কাউকে কারাগারে আটক রাখা যায়) বাতিল করবেন এবং তৃতীয়টি হচ্ছে বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক করবেন।

এই তিনটি ওয়াদার একটি টেলিভিশন ও রেডিও-এর স্বায়ত্বশাসন বাস্তবায়ন। এটা বলার বা লেখার কোনই প্রয়োজন পড়ে না। এরশাদ-এর আমলে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা খুব কড়া ভাবে টেলিভিশনকে বলেছেন সাহেব, বিবি, গোলামের বাক্স।

সেখানে খালেদা জিয়ার আমলে নির্বাচিত ও গণতান্ত্রিকভাবে এমন কোন অনুষ্ঠান নাই যেখানে টেলিভিশনের জন্য তিনি বিবি, গোলামের বাক্স বলেননি।

এখন সেই বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তার ওয়াদা এমনভাবে পূরণ করেছেন যে মানুষ এখন বলে বাপ বেটির বাক্স।

আর দ্বিতীয় ওয়াদা বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনা বিচারে মানুষকে কারাগারে আটক এই কালো আইনটি বাতিল করবেন কি কারণে? কোন যুক্তিতে? এ যে তার পিতা শেখ মুজিবের তৈরী করা কালো আইন। এই বিশেষ ক্ষমতা আইনেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযোদ্ধাসহ এদেশের হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রেখেছিল। বিচার মুক্ত করা মানুষকে নির্যাতিত করা ও অত্যাচার করা এই কালো আইন তিনি বাতিল করবেন, পিতার সোনা কন্যা, সোনা উত্তরসূরী তিনি কিভাবে তাহা করবেন!

তাই তিনি ক্ষমতায় এসেই বললেন, বিশেষ ক্ষমতা আইন এত দ্রুত বাতিল করার জরুরী অবস্থা না। এই যে সোনা পিতার সোনা কন্যা, সোনা উত্তরসূরী। বাপের দেওয়া এই কালো আইনটি শুধু পুরোপুরি বহালই রাখলেন না। এর অবাধভাবেও প্রয়োগ করতে লাগলেন। কালো আইনের এই প্রয়োগ করতে যেয়ে বিরোধী দলের চার নেতাকে বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে কারাগারে আটক রাখলে, মহামান্য আদালত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারকে শাস্তি স্বরূপ অর্থ দণ্ড দেন। এর পরও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওয়াদার কথা তো বলে হয়নি, লজ্জাও হয়নি। বাবার হাতের বানানো তৈরী করা এবং রেখে যাওয়া, তাই কালো আইনটি বহালই রেখেছেন। এবং তৃতীয় ওয়াদা বিচার বিভাগকে প্রশাসন থেকে আলাদা বা পৃথক করা এ নিয়ে তিনি টুশব্দ টু শব্দ করছেন না। বেমালুম ভুলে যাচ্ছেন।

চাচি ভাতিজির দাও

এক বৃহস্পতিবার বিকেলে শেখ মুজিবের একমাত্র আপন ভাই শেখ নাসেরের বিধবা স্ত্রী শেখ হেলালের মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচী প্রধানমন্ত্রীর সরকারী বাসভবন গণভবনে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বললেন, "মা তোমাকে তো পাই-ই না। তুমি এতো ব্যস্ত থাকো। এই জন্য আমি আসিই না। বাড়িতে বাড়িতে তুমি একদম বন্দিনী হয়ে গেছো। এক কাজ কর মা, সপ্তাহে দুইদিন ছুটি দিয়ে দাও। কর্মচারীরাও খুশি হবে যে। আমরাও তোমাকে পাবো।

আপনি ঠিকই তো বলেছেন চাচি। এই কথা বলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার পরের দিনই সপ্তাহে দুইদিন ছুটি ঘোষণা করলেন। চারিদিকে এবং পত্রপত্রিকায় সপ্তাহে দুইদিন ছুটি ঘোষণা নিয়ে আলোচনা সমালোচনার ঝড় উঠলো। পত্র পত্রিকায় আলোচনা সমালোচনায় সবচাইতে বেশী গুরুত্ব সহকারে বিস্ময়ের সাথে যা বলা হলো, তা হলো, সরকারের নীতি নির্ধারকরা সপ্তাহে দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এমন কি মন্ত্রী সভার সদস্যরাও দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কিছুই জানেন না। এবং সপ্তাহে দুই দিন ছুটির ব্যাপারে কোন কমিটি করেনি। তাহলে কার সাথে আলোচনা করে পরামর্শ করে সপ্তাহে দুই দিন ছুটি দেওয়া হলো? এই নিয়ে পত্র পত্রিকায় অনেক দিন পর্যন্ত বহুচর্চা চললো। প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেল। উত্তর মিললো না। কেউ জানতে পারলো না। খুঁজতে পারলো না। আবিষ্কার করতে পারলো না এ যে চাচী ভাতিজির দাও।

ইয়েস ম্যাডাম, স্যরি ম্যাডাম

ইয়েস ম্যাডাম, স্যরি ম্যাডাম। প্রশাসনের কাজ শুধু মন্ত্রী/প্রধানমন্ত্রীকে খুশি করা। বিশেষত প্রধানমন্ত্রীকে বা যদি রাষ্ট্রপতি প্রধান নির্বাহী হন তাহলে রাষ্ট্রপতিকে খুশি করা। মন্ত্রীর চাকর বা বাবুর্চিকে যদি মন্ত্রী কিছু হুকুম করেন। তাহলে চাকর বা বাবুর্চি মন্ত্রীকে তার হুকুমের ভাল-মন্দ কিছু বলবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ করলে সরকারের কর্মকর্তারা কখনই নির্দেশের ভালমন্দ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে কিছুই বলবে না।

যদি মন্ত্রী বাবুর্চিকে সকাল দশ/এগারোটায় বাইরের কাজের হুকুম করেন, তাহলে বাবুর্চি মন্ত্রীকে বলবে, আমি এখন বাইরে গেলে রান্না করবে কে? আপনার খাওয়ার অসুবিধা হবে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে আদেশ দেন সরকারী কর্মকর্তারা সে আদেশ মতোই কাজ করে যান।

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের প্রধানতম কাজ হচ্ছে, ভোরে ঘুম থেকে উঠে সাদা কাগজ এবং কলম নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামনে হাজির হওয়া। এবং প্রধানমন্ত্রী ঘুম থেকে উঠে যখন যা বলবেন, তা

সরকারের কর্মচারীর কথায় সেবা ও সেই মতো কাজ করতে লাগলো। এই আদেশের ভাল-মন্দ সম্পর্কে তারা কখনোই কোন অভিমত দেন না। শুধু বলেন ইয়েস স্যার, অলরাইট স্যার, রাইট স্যার। প্রধানমন্ত্রীর আদেশ নির্দেশের বাইরে সরকারি কর্মকর্তারা তার বাইরে কখনোই অন্য কিছুই দেখেন না।

এক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের অভিমত হলো, ভাল-মন্দের দায়িত্ব তো আমাদের না। আমরা সরকারী কর্মচারী। সরকার যা বলবেন যা যে নির্দেশ করবেন। আমরা তাই করবো। ভাল-মন্দের সব দায়িত্ব সরকারের। সর্বোচ্চ 'না' সরকারে আছেন, আর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সরকারই মানুষ, এখন যে সরকার আছেন, আমরা সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে সেই সরকারের হুকুম তামিল করবো। এই-ই আমাদের কাজ। ভাল-মন্দ বিচার বিবেচনা করার দায়িত্ব সরকারের এবং যারা সরকার নির্বাচিত করেছে তাদের। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে আমাদের একমাত্র কাজ সরকারকে খুশি করা। সরকারকে মানে প্রধানমন্ত্রীকে যত খুশি করতে পারব আমরা ততই সফল হতে পারব।

কাকে প্রথম সৎ হতে হবে

কাকে প্রথম সৎ হতে হবে? আমাদের দেশের যে করুণ অবস্থা, এই অবস্থায় কার প্রথম সৎ হওয়া প্রয়োজন? বা কাকে প্রথম সৎ করা দরকার? যারা দেশের সমস্ত প্রশাসনের একেবারে উপরে থাকেন যে কর্মকর্তা, এই অসততার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে, দেশকে বাঁচাতে হলে, প্রশাসনের কোন ব্যক্তিকে প্রথম সৎ হতে হবে? এই প্রশ্ন এটা চিন্তা, একটা ভাবনা এবং অনুসন্ধান দীর্ঘ দিন থেকে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। কিন্তু এই চিন্তা, ভাবনা এবং অনুসন্ধানের কূল কোনটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। মাথার মধ্যে থেকে এটা বেরিয়ে যেতেও চাচ্ছিল না। দেশের এই অভিনব অবস্থায় প্রশাসনের কাকে প্রথম সৎ হওয়া উচিত, কে প্রথম সৎ হলে প্রশাসনের অন্যরা অতি শীঘ্র নিয়ন্ত্রণে আসবে! এবং অন্যরা, অসৎ, নীচে, উপরে প্রশাসন ও দেশ থেকে ঘুষ ও দুর্নীতি দূর হবে? মাথার এই প্রশ্নটির সুরাহা না হতেই, ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের বন বিভাগের [illegible] এর বন বিভাগের সি. এফ. ও (চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) এর এক বৈঠক বসলো। প্রায় তিন পঁচিশ জন সি. এফ ও বৈঠকে উপস্থিত হলেন। বৈঠকের আলোচ্য বিষয় সরকার কর্তৃক নতুন সি. সি. এফ (চিফ কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) বা প্রধান বন সংরক্ষক নিয়োগ দান প্রসঙ্গ। সি. এফ-এর সেই বৈঠকে আলোচনা হলো, নতুন সি. সি. এফ প্রার্থী পাঁচ জন। এই পাঁচ জনের মধ্যে বর্তমানে যিনি সি. সি. এফ আছেন তিনি চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে সি. সি. এফ পদে আরো থাকতে চান। এবং বাকি চারজন সি. এফ (কনজারভেটর অফ ফরেস্ট) সি. সি. এফ হতে চান। এই পাঁচ জন সি. সি. এফ প্রার্থীই আলাদা আলাদা ভাবে সি. এফ দের কাছে ঘুষ বা চাঁদা হিসেবে কোটি টাকার টাকা

সাহেব। ডি. এম. এদের কাছ থেকে এই মোটা অংকের টাকা নিয়ে পি. পি. এর প্রার্থীরা নিজের নামসুপারিশ না নিয়ে আসেন পি. পি. এর হওয়ার জন্য মন্ত্রীকে ঘুষ দিয়েছেন। এবং সেই হেতু পি. পি. এর একটা গুরুত্বপূর্ণ পদ তাই এই পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর একটা সম্মতি আইনমন্ত্রীকে নিতেই হবে। আর তাই পি. পি. এর প্রার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া ঘুষের টাকা থেকে একটা বড় অংশ প্রধানমন্ত্রীকে দক্ষিণা দিতে হবে। নইলে পি. পি. এর পদে নিয়োগ দেওয়া হবে না। মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীকে ঘুষ দেওয়ার এই প্রতিযোগিতায় যে প্রার্থী সর্বাধিক ঘুষের টাকা দেবেন তিনিই পি. পি. এর হবেন। এই সময়ই পি. পি. এর প্রার্থীরা ডি. এম ও সেশন জজের কাছে টাকা দাবি করছেন। ডি এম ও সেশন জজদের বিপদ হলো, কারণ যে পি. পি. এর প্রার্থীকে টাকা নিল তিনি পি. পি. এর না হয়ে, যে প্রার্থীকে টাকা নিল না সেই প্রার্থী যদি পি. পি. এর হয়ে যায় তাহলে তো আদালতের কাজ করা তেমন কোটারির নিয়ে অর্থহীন হয়ে যাবে। ডি. এম. ও ডিস্ট্রিক্ট জজ থেকে সেশনজজ যে টাকা আদায় করেছেন তা ফেরত হয়ে যাবে। তাই সর্বসম্মতিক্রমে ডি এম ও জজ সিদ্ধান্ত নিল যে, সকল পি. পি. এর প্রার্থীকে সমান টাকা দেওয়া যাবে। এবং দেওয়া হয়েছে তাই।

নিমি নতুন পি. পি. এর হয়েছেন (আব্দুল সাত্তার)। তিনি মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর টাকা একত্রে করে আইনমন্ত্রীর কাছে না দিয়ে, আলাদা করে ভিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছেন। নতুন পি. পি. এর জনাব আব্দুল সাত্তার প্রধানমন্ত্রীর অংশ মন্ত্রীর হাতে না দিয়ে সোজা চলে গেলেন ঢাকায় শেখ হাসিনার নিজস্ব বিশ্বস্ত লোকের সাথে দেখা করে কিছু টাকা দিয়ে দেন, ঢাকার সুধা সদনে গিয়ে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগিনার সাথে দেখা করেন এবং সেখানকার অর্থনৈতিক কাজে নাকি শেখ হাসিনার প্রিয় ভাগিনার কাছে নিয়মিত টাকা দেওয়ার প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর হাতে তিনি টাকা দেন। সেখানে গিয়ে শেখ হাসিনাকে না পেয়ে পি. পি. এর প্রার্থী আব্দুল সাত্তার গেলেন শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ভাগিনার বাড়িতে নিজে এবং সুধাসদনের বাসিন্দা প্রেসিডেন্ট। এই প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে টাকার বান্ডিল নিয়ে তুলে দেন পর আইনমন্ত্রীর নিকট পি. পি. এর প্রার্থী আব্দুল সাত্তারকে সাথে নিয়ে চলে গেলেন তিনি আইনমন্ত্রীর নিকট। উপস্থিত শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার ভাগিনা আর প্রেসিডেন্ট আলাপকালে বললেন প্রেসিডেন্ট এক বার-এর পি. পি. এর প্রার্থী আব্দুল সাত্তার একবারই শেখ হাসিনার হাতে প্রধানমন্ত্রীর অংশটা দিলেন। এবং তিনি জনাব আব্দুল সাত্তার নতুন পি. পি. এর নিয়োগ পেলেন।

কাহলে কি দাঁড়ালো? এদেশ থেকে দুর্নীতি দূর করতে, ঘুষ দূর করতে আগে প্রধান সৎ হতে হবে?

রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী যিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী তাকেই প্রথম সৎ হতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর সততা আর দক্ষতায় মন্ত্রীরা সৎ হবে। তারপর সচিবরা। এই

তবেই আমরা আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে দেশটা দেশ হবে। এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

এই চিন্তার সাথে বিমত পোষণ করে না নাগরীন রেজা কাদরী এম, বি, বি, এস, এম ফ, ফি এফিসিয়াল গালা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ঢাকা। তেমনি তার স্বামী ডাঃ রহমাতুল বারী শামসু এম, বি, বি, এস, ই এফ এফ আই, টি, ভি, ডি পোঃ এ সমস্ত এলার ঢাকা। বলেছেন, সর্বপ্রথম জনগণকে সৎ হতে হবে। অন্যথায় কোন অবস্থাতেই যেন অসৎ ব্যক্তিদের ভোট বা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত না করে। নির্বাচিত করার আগে দলের দিকে না তাকিয়ে ব্যক্তির সততার দিকে গভীর ভাবে লক্ষ্য রেখে তবে ভোট দেয়। এরা তখন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবে।

পেশায় চিকিৎসক এই দম্পতি এই প্রসঙ্গে ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর থেকে ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ডাঃ কামাল হোসেন এর কথা বললেন। চিকিৎসক দম্পতি অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন, তারা ধানমন্ডি নির্বাচনী এলাকার ভোটার। নির্বাচনের সময় তারা ঢাকার বাইরে ছিলেন। ডাঃ কামাল হোসেন-এর মতো একজন সৎ ও শিক্ষিত লোক নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন শুনে তারা অত্যন্ত আগ্রহ ও খুশি হয়ে ঢাকায় এসে ডাঃ কামাল হোসেনকে ভোট দেন। কিন্তু ভোট গণনায় দেখা গেল ডাঃ কামাল হোসেন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন। অথচ ধানমন্ডি মোহাম্মদপুর এলাকার প্রায় সকল ভোটারই শিক্ষিত। তাই এই ডাক্তার স্বামী-স্ত্রীর অভিমত হলো, সর্বপ্রথম জনগণকে সৎ হতে হবে। ঠিক হতে হবে। সৎ ও শিক্ষিত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে হবে। তাহলেই আমাদের দেশে সৎ ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

[illegible]

সুরে সুরে কথা বলা

রাজনীতিতে সুরে সুরে কথা বলতে হয়। পার্টি বা সংগঠনের মূল নেতা বা নেত্রী যিনি, তার সুরে সুরে কথা বলতে হয়। আপনি যে পর্যায়ের নেতা বা কর্মীই হন না কেন, পার্টি বা সংগঠনের যখন যাহার মূল নেতা যিনি, যার হাতে মূল ক্ষমতা, তিনি যদি দিনকে রাত বা সূর্যকে চন্দ্র বলেন তবে আপনাকেও তাই বলতে হবে। যদিও রাতকে দিন বা সূর্যকে চন্দ্র কোনভাবে তা বলতে পারবেন না। যদি সুরে সুরে কথা না বলে, সত্য কথা বলেন, তাহলেই আপনি নেতার কাছে হবেন অগ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। নেতা বা নেত্রী যা বলবেন তা যতই অসত্য বা ভুল হোক না কেন, তা আপনাকে মনে প্রাণে সুরে সুরে ঠিক সব ঠিক বলে যেতে হবে। যদি তা না পারেন, তাহলে আর যা হোক অন্তত রাজনীতিতে টিকে থাকতে পারবেন না। কোন পদে থাকতে পারবেন না। আর রাজনীতিতে যিনি মূল নেতা/নেত্রী বা ক্ষমতার মূল মালিক, অর্থাৎ যিনি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, তার কাছে মনে হয়, যে তার সাথে তাল মিলিয়ে সুরে সুরে কথা বলবে বা কাজ করবে, তাকেই সবচেয়ে যোগ্য ও আনুগত্যশীল মনে করা। এর বাইরে তিনি আর কিছুই মনে করতে পারেন না। অর্থাৎ ভুল করেই হোক, অন্যায় ইচ্ছে করেই হোক, তিনি নিজেকে দাবি করেছেন, তার অধীনস্থ কোন নেতা বা কর্মী যদি তা ধরিয়ে দেয় অমনেই তিনি ধরে নেন অধীনস্থ এই লোক তার প্রতি আনুগত্যশীল নয়, যোগ্যও না। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ক্ষেত্রে তিনি যা বলবেন বা করবেন তা সঠিক হোক বা না হোক, সবসময়ই বলতে হবে ঠিক, সবকিছুই ঠিক। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার রাজনীতিতে এখন কথা হচ্ছে, তার (শেখ হাসিনার) কোন ভুল থাকতে পারে না। কেউ যদি মনে করে তার (শেখ হাসিনার) ভুল হয়েছে, তাহলে তাকে রাজনীতির এখন কথা পুনরায় অর্জন করতে হবে। ঠিক, ঠিক, নেত্রী আপনি যা বলেছেন, যা যা করেছেন তা সব ঠিক। শেখ হাসিনার রাজনীতিতে তারা এখন অনেক আগেই নিজের উদ্দেশ্য এবং সফল হয়েছে।

কোন শিক্ষা নেয়নি

পৃথিবীতে বা রাজনৈতিক দেশগুলোর ইতিহাসে সবচাইতে কলঙ্কময় জাতি, যার জন্য কোটি মানুষ নিঃস্ব হয়েছে, যার অত্যাচারে লাখ লাখ মানুষ মৃত্যুর দিকে ছুটে গেছে, পরে সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে মৃত্যুর দিকে চলে গিয়ে যার জন্য মানুষ দোয়া করেছে, তিনি শেখ মুজিবর রহমান। কেউ কেউ তাকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, কেউ কেউ বলেন না। বাংলাদেশের বেশির ভাগ মানুষ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু জন্মাতেন না, স্বাধীনতা আসতো না এবং বাংলাদেশ হতো না। কিন্তু তিনি যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং জাতির পিতা একথা সকলেই স্বীকার করেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট মসজিদে মসজিদে আযান হচ্ছে, আল্লাহু আকবর মিনার থেকে, আল্লাহু আকবর মিনার থেকে। মুসল্লিরা ঘর থেকে মসজিদে যাচ্ছে—ঠিক সেই সময় বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার এক ব্যক্তি, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিজের জন্য, শুধু নিজের জন্য, দীর্ঘ তিনঘণ্টা সময় তিনি কত চেষ্টা তদবীরই না করেছেন। তার প্রাণ বাঁচাবার জন্য সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে ফোন করেছেন। সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান জিয়াউর রহমানের কাছে ফোন করেছেন। তার মিলিটারী সেক্রেটারী কর্নেল জামিল উদ্দিন আহমদের কাছে ফোন করেছেন। পুলিশের আই জি'র কাছে ফোন করেছেন। পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ফোন করেছেন। গণভবনে ফোন করেছেন। কিন্তু কোন জায়গা থেকেই একটু সাড়া পর্যন্ত এলো না। সর্বশক্তিমান সশস্ত্র বাহিনীর মানুষ, বঙ্গবন্ধুর আওয়ামীলীগ শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবার পরিজনদের জীবন রক্ষার জন্য একটি আঙ্গুলও নাড়ালেন না। যে ব্যক্তির এতো লোকজন, এতো দল আওয়ামীলীগ, এতো অনুসারী, এতো ক্ষমতা, তাকে বাঁচাতে এগিয়ে, তার প্রাণ বাঁচাতে কেউ-ই এগিয়ে এলো না।

মানুষের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ, দেশপ্রেমিককে বন্দি করে বিচার না করে বন্দিদশায় হাতে হাতকড়া পরা অবস্থায় সামনে থেকে বুকে গুলি করে হত্যা করা পর্যন্ত প্রকাশ্যেই দাঁড়িয়ে নায়ক সাথে কোনরূপ বিচার ছাড়াই সিরাজ সিকদারকে হত্যা ও তার করা, হাবীবুল্লাহ ইত্যাদির সহযোগী এম. এ. হামিদ শেখ মুজিবের খুব কাছের শহীদ প্রথম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম. এ. হামিদ ছাত্রলীগের প্রাক্তন নাগরিক। শেখ কামালের হাতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার এম-এ হামিদ দীর্ঘদিন শেখ মুজিবের প্রেমাস্পদের সাথে থাকেনি।

এম. এ. হামিদ বলেছেন, বঙ্গবন্ধু যে তার সিকিউরিটির ব্যাপারে চরম অবহেলা করেছেন এটা সবাই বুঝতে পেরেছিলেন। শেখ মনি ভাইয়ের অনুরোধে '৭৫-এর জুলাই মাসে আমি যখন গণভবনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে যাই, আমাকে দেখেই বঙ্গবন্ধু বলে উঠলেন, পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে আমার দেহে আঁচড় দিতে পারে বলে আশ্বাস দিলেন। এরপর আর তার ছিল উত্তেজনাকর অবস্থায় কথা পড়িনা। তখনই আমার মনে হল, বঙ্গবন্ধু আর বেশি দিন পৃথিবীতে নেই।

১৫ই আগস্টের শিক্ষা হচ্ছে, আল্লাহকে ভয় করা। সব সময় আল্লাহকে স্মরণে রাখা। মানুষের প্রতি অমানুষিক আচরণ না করা। মানুষকে সম্মান করা। নিজেকে সর্বেসর্বা মনে না করা। মানুষকে ভালবাসা।

আত্মঅহমিকা ও দাম্ভিকতা বর্জন করা। কিন্তু দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা এবং তাদের পরিবার পরিজন আওয়ামীলীগ ১৫ই আগস্ট থেকে বিন্দুমাত্র শিক্ষা নেয়নি। বরং ১৫ই আগস্টের ঘটনা থেকে তারা আরো দুর্বিনীত আচরণ করছে। তারা মানুষকে মুক্ত পরিবেশে ভালবাসে না। মানুষকে অপমান অপদস্থ করে প্রচুর আনন্দ বোধ করে।

কার কত টাকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার ছোট বোন শেখ রেহানার এখন একই অ্যাকাউন্ট। একই হিসেব। দুই বোনের মধ্যে অনেক ঝগড়া-ঝাটির পর দুজনে মিলে একটা অ্যাকাউন্ট হওয়ায় দিনমতো আপোষে তৈরী হয়েছে। এই দুই বোনের বর্তমানে আমেরিকায় (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) তিনটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর রয়েছে। এর একটি চালায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মেয়ে পুতুল ও তার স্বামী। অপরটি চালায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে জয়। এবং তৃতীয়টি চালায় প্রধানমন্ত্রীর ছোটবোন শেখ রেহানার ছেলে ববি। এছাড়া এই দুই বোনের বিভিন্ন দেশে প্রায় তিন থেকে চার হাজার কোটি টাকা জমা আছে। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এম পি প্রায় হাজার কোটি টাকার উপরে মালিক। প্রধানমন্ত্রীর ফুফাতো ভাই নূর এবং মিন শত শত কোটি টাকার মালিক। প্রধানমন্ত্রীর অপর ফুফাতো ভাই কাদের ও তার অন্যান্য ভাইয়েরা শত কোটি টাকার মালিক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর চাচাতো ভাই শেখ হাফিজুর রহমান টোকন প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকার মালিক। প্রধানমন্ত্রীর খালার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে প্রধানমন্ত্রীর এ, পি, এস, ব্যারিস্টার শাকিল এবং তার চাচাতো ভাই প্রধানমন্ত্রীর চীফ সিকিউরিটি নাজিম আহমেদের শাকিল ও তার ভাইয়েরা মিলে বর্তমানে কয়েক হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট এবং দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনের এমন কেউই নেই, যিনি বর্তমানে শত কোটি টাকার মালিক হননি।

স্বাধীনতা ঘোষণা, দিবস, জাতীয় পতাকা, সংগীত বিতর্ক

একটা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। নিরস্ত্র বাঙালি সশস্ত্র হলো, অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিল। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ বা মুক্তিযুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। ভারত মুক্তিবাহিনীর সাথে এক হয়ে যুদ্ধ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের পক্ষে মার্কিন সপ্তম নৌবহর-কে মোকাবেলা করার জন্য সাবমেরিন পাঠিয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশও পরোক্ষভাবে পক্ষ-বিপক্ষে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। নয় মাস যুদ্ধের মধ্যে প্রায় এক লক্ষ পাকিস্তানী হানাদার সৈনিককে পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল আমরা বিজয়ী হয়েছি। স্বাধীন হলাম। কিন্তু এখনও আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে, স্বাধীনতা দিবস নিয়ে, জাতীয় পতাকা নিয়ে, জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে কেন? অনেকেই বলতে পারেন এসব ছোটখাটো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বিতর্ক করে

কোন কাজ নেই। আপনারা অনেকেই জানতে পারেন, যা এদেশ আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান বিষয়। এর মীমাংসা বা সমাধান হওয়া দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকা আওয়ামী বুদ্ধিজীবি ডঃ নীলিমা ইব্রাহিম দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লিখে শেখ হাসিনা সরকারের কাছে দাবী করেছেন, ২৬শে মার্চের পরিবর্তে ৭ই মার্চকে আমাদের স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করতে হবে। ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের এই দাবি করার যুক্তি হচ্ছে, তার (ডঃ নীলিমার) ভাষায়, আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের সোহ্‌রাওয়ার্দী (রেসকোর্স ময়দান) উদ্যানের ভাষণে বলেছেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" অতএব ৭ই মার্চই আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা দিবস।

এক মুক্তিযোদ্ধা দাবী করেছেন বর্তমানে আমরা জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে রবীন্দ্র সঙ্গীতটি (আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি) গাই, এটি আমাদের প্রকৃত জাতীয় সঙ্গীত নয়। দেশ স্বাধীনের পরে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে মহল বিশেষের চাপিয়ে দেওয়া এটি একটি রবীন্দ্র সঙ্গীত মাত্র। যা এদেশের কোন কবি সাহিত্যিক দ্বারা রচিত হয়নি। এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে এ গান গাওয়া হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় এদেশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে গানটি গেয়েছিল, যে গান দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খোলা হতো এবং বন্ধ হতো, আমরা মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং-এর সময় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে যে গান গেয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতাম, সেই "জয় বাংলা বাংলার জয়" গানটিই আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। অতএব এই গানকেই পুনরায় জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। অপর এক মুক্তিযোদ্ধা পত্রিকায় দাবী করেছেন বর্তমানে যে পতাকাকে জাতীয় পতাকা হিসেবে উত্তোলন করা হয়, এ পতাকা প্রকৃত জাতীয় পতাকা নয়। বর্তমান পতাকা হচ্ছে প্রকৃত জাতীয় পতাকার পরিবর্তিত রূপ। যা স্বাধীনতার পরে পরিবর্তন করা হয়। কোটি বাঙ্গালী জাতি যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরে, গ্রামে, গঞ্জে প্রত্যেক ঘরে ঘরে জাতীয় পতাকা হিসেবে, যে পতাকা উড়িয়ে স্বাধীনতা দাবী করেছে, এবং যে পতাকার তলে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের প্রথম সরকার শপথ নিয়েছে, এবং আমরা মুক্তিযোদ্ধারা যে পতাকার তলে দাঁড়িয়ে জীবন দিয়ে পতাকার মর্যাদা রক্ষার শপথ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিলিয়ে দিয়েছে, সেই সবুজ পতাকার মাঝখানে রক্তিম বলয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকাই আমাদের প্রকৃত জাতীয় পতাকা। আমরা সেই পতাকাকেই জাতীয় পতাকা হিসেবে দেখতে চাই। বর্তমানে যে পতাকা রয়েছে এ হচ্ছে প্রকৃত

জাতীয় পতাকার বিকৃত রূপ। যা স্বাধীনতার পরে জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

এছাড়া স্বাধীনতার ঘোষক নিয়ে বিতর্ক তো শুরু থেকে এখন পর্যন্ত চলছেই। অর্থাৎ কে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, তা নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম থেকে অদ্যাবধি অবিরাম বিতর্ক চলছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি কে স্বাধীনতার ঘোষক? এই বিতর্কের অবসান বা সর্বজন সমাধান এখনই হয়নি। কেউ বলছেন শেখ মুজিবুর রহমানই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। কেউ বলছেন জিয়াউর রহমানই স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। যখন যিনি ক্ষমতায় থাকেন বা এই দুইজনের মধ্যে যখন যার সমর্থকরা জাতির ক্ষমতায় থাকেন সেইসব প্রতিনিধিগণ তাদেরই স্বাধীনতার ঘোষক বলে প্রচার চালিয়ে থাকেন। কিন্তু আসলে কে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন? সঠিক তথ্য একাডেমিকভাবে এর অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং বিচার বিশ্লেষণ করা একান্ত জরুরী দরকার। আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম, আর আমাদের স্বাধীনতার প্রকৃত ঘোষক খুঁজে বের করতে পারব না। এটা হতে পারে না। আমরা যদি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক খুঁজে না পাই, তাহলে তো আগামী প্রজন্ম একদিন আমরা যে দেশ স্বাধীন করেছি, সেটাও খুঁজে পাবে না। আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক আমাদের খুঁজে পেতে হবে। গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের প্রয়োজনে আমাদের অতীতে ফিরে যেতে হবে।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের যে নির্বাচন হয়, সেই নির্বাচনে গোটা (সাড়ে সাত কোটি) বাঙালি জাতি শেখ মুজিবুর রহমানকে একক ও অদ্বিতীয় নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে। দুই শত বছরের পরাধীন বাংলা বাঙালি জাতি স্বাধীনতার জন্য মুক্তি পাগল হয়ে শতকরা শতভাগই ভোট দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে তাদের নেতা নির্বাচন করে। বাঙালি জাতি তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন এবং পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীনতা ঘোষণা দেওয়ার সকল দায়িত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের উপরে একনিষ্ঠভাবে ন্যস্ত করে। গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে সর্বত্র স্বাধীনতা পাগল কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতার মুখে একটাই স্লোগান, একটাই দাবি, পাকিস্তানের বুকে লাথি মার বাংলাদেশ স্বাধীন করো। মুক্তি পাগল বাঙালি ঐক্যের শক্তি নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত হলো।

২রা মার্চ মাঠে, ঘাটে, বাজারে, গ্রামে গঞ্জে শহরে, বাড়ি-ঘর রাস্তা-ঘাটে দেশের সর্বত্র বাঙালি জাতি তার প্রিয় পতাকা, স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়িয়ে দিল। সবুজ পতাকার লাল বৃত্তে হলুদ রঙের বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা সারা বাংলার আকাশে পতপত করে উড়তে লাগলো। তারা

বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অনেক জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে স্বাধীন বাংলার (প্রতিরোধের) মহড়া চলতে লাগলো।

এমনি পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জনসভা ডাকলেন। ৭ই মার্চের রেসকোর্সের এই জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোক বাঁশের লাঠি নিয়ে সমবেত হলো। এই জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান তাজুদ্দিন আহমেদ এবং ডঃ কামাল হোসেনকে একটি বক্তৃতা লিখে দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দিলেন। তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) তাজুদ্দিন আহমেদ (বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী) এবং ডঃ কামাল হোসেনকে বললেন, তোমরা আমার ৭ই মার্চের বক্তৃতার পয়েন্ট তৈরী করে দিবে এবং আমি ঐ পয়েন্ট-এর উপরে নিজের ভাষায় বক্তৃতা করবো। তিনি আরো বললেন, তোমরা বক্তৃতার পয়েন্টগুলো এমনভাবে করবে যাতে আমি ঐ পয়েন্টগুলো বক্তৃতার সময়ে পরিবেশন করলেও কোন ক্ষতি না হয় এবং পাকিস্তান আইনেও যেন বেআইনি না হয়।

তাজুদ্দিন আহমেদ ও ডঃ কামাল হোসেন দুজনে মিলে শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পয়েন্ট তৈরী করে দেন। এবং ৭ই মার্চে শেখ মুজিবুর রহমান যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তাজুদ্দিন আহমেদ তখন বক্তৃতার মঞ্চে বসে বক্তৃতার পয়েন্টগুলো মিলিয়ে দেখতে থাকেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাজুদ্দিন আহমেদ, ডঃ কামাল হোসেন এবং অন্যান্য নেতাদের বলেন, এবার আমাকে পাকিস্তানের ক্ষমতা দিতে হবে। যদি আমাকে ক্ষমতা না দেয়, তাহলে তোমাদের যা করার তোমরা তা করবে।

এই কথাগুলো ২১শে অক্টোবর শনিবার ১৯৯৮ ঢাকা মতিঝিল ১২৫/১২৬ মতিঝিল কমার্শিয়াল এরিয়া বিল্ডিং-এর দ্বিতীয় তলায় তাঁর নিজের চেম্বারে বসে ডঃ কামাল হোসেন নিজের মুখে বলেছেন। ডঃ কামাল হোসেন আরো বলেছেন এবং দৃঢ়তার সাথে বলেছেন তিনি এবং ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলামই শেষ ব্যক্তি যারা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে (কাল রাত্রি অপারেশন) আনুমানিক সাড়ে দশটার সময় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করে বেরিয়ে এসে সোজা তাজুদ্দিন আহমেদের বাসায় যান। কিন্তু তখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়ে কিছুই বলেননি।

ডঃ কামাল হোসেন তাজুদ্দিন আহমেদের বাসায় থাকতেই রাত সাড়ে এগারোটায় কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত এম. এন. এ (মেম্বার অব ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলী) মুজাফ্ফর সাহেব এসে খবর দেন যে, পাকিস্তান আর্মি পিলখানা (বর্তমান বি ডি আর হেড কোয়ার্টার) রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং

নির্দিষ্ট সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করেছে। এই সময়ে দেশের সব আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ সকলেই যার যার নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যান।

পঁচিশে মার্চ বা তার পরে কবে কোথায় কার কাছে এবং কিভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন জিজ্ঞেস করা হলে ড. কামাল হোসেন বলেন এটা আমার জানা নেই। অনেকেই কিন্তু জিজ্ঞেস করা হলে উনি বলেন, না আমি শুনিনি। আমাকে কেউ বলেনি।

বাবা কোন সময়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়? জানতে চাইলে ড. কামাল হোসেন এমন কিছুতে নয় বরং বলতে পারেননি বঙ্গবন্ধু তখন কোথায় থাকিনা, কেননা তিনি তখন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন না। একমাত্র বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্য ছাড়া এদেরকে সঠিক উত্তর অন্য কেউ দিতে পারবে না। ড. কামাল হোসেনকে এপ্রিল মাসের ৪ তারিখে গ্রেফতার করা হয়। ৪ঠা এপ্রিল '৭১ সাল ড. কামাল গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমান, তাজুদ্দীন আহমদসহ কারো সাথেই কোন প্রকার যোগাযোগ তাঁর হয়নি। ৪ঠা এপ্রিল গ্রেফতার করে ড. কামাল হোসেনকে প্রথমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এবং ৬ই এপ্রিল '৭১ সনে পাকিস্তানের রাজধানী রাওয়ালপিন্ডির হরিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাকিস্তানের হরিপুর জেলে এই এপ্রিল থেকে ৭১-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ড. কামাল হোসেনকে রাখা হয়। এই জেলে ড. কামালকে সম্পূর্ণ নির্জনে বন্দী করা হয়। মোটা সোজা লোহার শিক দিয়ে ঘেরা ছোট একটি অন্ধকার প্রকোষ্ঠের বাইরে কখনোই ড. কামাল হোসেনকে বের হতে দেওয়া হয়নি। ড. কামালকে কখনোই কোন প্রকার সংবাদপত্র বা রেডিও দেওয়া হতো না। '৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে পর বন্দী হবে পাকিস্তান জেলখানা থেকে ড. কামাল হোসেনের সাথে সাক্ষাতের আচরণ করতে এক সময় তিনি একটা বিরাট পরিবর্তন হয়েছে বলে আঁচ করতে পারেন। ১৮ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর নির্দেশে ড. কামাল হোসেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক সঙ্গে মিলিত হন।

কেউ কেউ বলেছেন এবং দাবি করেছেন যে, '৭১ সালের ২৫শে মার্চের দিবাগত রাত ১২টার পর অর্থাৎ বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী ২৬শে মার্চ রাতে শেখ মুজিবুর রহমান টেলিগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। স্বয়ং শেখ মুজিবুর রহমান নিজে কখনই দাবি করেননি যে, ২৬শে মার্চ তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। অনুসন্ধান গবেষণা ও বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনে এই দাবী মেনে নিলে কি দেখা যাবে? টেলিগ্রাম হলো এমন একটি বিষয় যে এর একজন প্রেরক এবং একজন প্রাপক থাকতে হবে। শেখ মুজিবুর রহমান যদি

প্রেরক হিসেবে টেলিগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই একজন প্রাপক হিসেবে টেলিগ্রামটি পেয়েছেন। সেই প্রাপকটি কে? শেখ মুজিবুর রহমান টেলিগ্রামটি কার কাছে পাঠিয়ে ছিলেন? অর্থাৎ টেলিগ্রামের প্রাপক কে ছিলেন? আজ পর্যন্ত সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটির দেখা মিললো না, পরিচয় মিললো না, বলা হয় টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘোষণা পাঠান হয়েছে, অথচ যার কাছে পাঠানো হয়েছে অনুসন্ধান করেও তার হদিস মিলছে না, ঐতিহাসিক অনুসন্ধানেও প্রাপকের সন্ধান মিলবে না, এটা সঠিক নয়। টেলিগ্রামের প্রেরক থাকলে তার অবশ্যই প্রাপক থাকতে হবে। প্রাপক ছাড়া টেলিগ্রাম প্রেরণ করা যায় না। এবং প্রাপক ছাড়া প্রেরকও থাকে না। যেহেতু প্রাপক নেই, সেহেতু প্রেরকও ছিল না বলে টেলিগ্রামে স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি সম্পূর্ণই উবে যেতে পারে। অর্থাৎ ২৬শে মার্চ রাতে টেলিগ্রামের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে কোন যুক্তি নেই এবং অনুসন্ধান চালিয়ে, ও বিশ্লেষণ করে এর পক্ষে কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্বদানকারী এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, ড কামাল হোসেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ থাকতে তাঁদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা না দিয়ে টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঘোষণার কোন কারণ থাকতে পারে না।

ড. ফাতিমা ইব্রাহিমের দাবি অনুযায়ী ৭ই মার্চের ভাষণেই (সাংকেতিক ভাষায়) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। এই ভাষণই আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে। যদি তাই হবে, তবে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ফিরে এসে কেন বললেন না যে, আমি ৭ই মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি এবং ৭ই মার্চই আমাদের স্বাধীনতা দিবস। উপরন্তু তিনিই (শেখ মুজিবুর রহমানই) স্বাধীন দেশের সরকার প্রধান হিসেবে ২৬শে মার্চকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে প্রথম পালন করলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চের ভাষণের অন্তর্বর্তী পর্যায়ে এক জায়গায় ঠিকই বলেন "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" একথা বলেই তিনি পাকিস্তানী শাসকদের কাছে চারটি শর্ত দিয়ে তার বক্তৃতা শেষ করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ভাষণের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে বলেন, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম (১) সামরিক আইন মার্শাল 'ল' উইথড্র করতে হবে। (২) সমস্ত সেনাবাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। (৩) যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। (৪) জন প্রতিনিধিদের কাছে (অর্থাৎ আর

নেতার কাছে) ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই চারটি দাবীর মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান-এর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা, অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করাই মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ দাবী। এখানে বিচার বিশ্লেষণ ও বিবেচনার বিষয় হলো যদি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবের এই মার্চের দাবী, মেনে নিতো তাহলে কি হতো? বাংলাদেশ কি স্বাধীন হতো? যদি নির্দেশে ক্ষমতা দেয়া যায়, তাহলে আর যাই হোক, এই মাত্রায় বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। শেখ মুজিবের এই মার্চের ভাষণের দাবী অনুযায়ী শেখ মুজিবকে যদি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হতো তাহলে নিশ্চই বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না। পাকিস্তানই থেকে যেতো। এই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন, 'আমরা তোমাদের ভাতে মারবো। পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাক, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।'

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ রাত ১২টা পর্যন্ত ব্যারাকেই রইল। কেউ বের হলো না। এদিকে পাকিস্তানীরা এই মার্চের পরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশে ঢাকা তেজগাঁও এয়ারপোর্ট (বিমান বন্দর) দিয়ে বিমানে করে দিন-রাত্রি ২৪ ঘন্টা সৈন্য আনতে লাগলো। এই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, "যে পর্যন্ত আমার দাবী আদায় না হবে খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দিবে না।"

জনগণ পাকিস্তান সরকারকে খাজনা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দিল। শেখ মুজিবুর রহমান আরো বললেন, "এই পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও পাচার হতে পারবে না। দিনে দুই ঘন্টা ব্যাংক খোলা থাকবে শুধু কর্মচারীদের বেতনাদি দেওয়ার জন্য।" ঠিকই ব্যাংকগুলো থেকে পাকিস্তানে এক পয়সাও পাচার হলো না। সরকারী বেসরকারী কর্মচারীরা শেখ মুজিবের নির্দেশেই চলতে লাগলো। সরকারী-বেসরকারী প্রশাসন সম্পূর্ণ রূপে শেখ মুজিবের হাতের নিয়ন্ত্রণে চলে গেল।

এভাবেই পুরো বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের নির্দেশ চলতে থাকে। এখন থেকে পাকিস্তানের আর কিছুই করার থাকলো না। বাংলাদেশ কার্যত পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা দেশে পরিণত হলো।

এই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান থেকে আর একটি সৈন্যও পূর্ব বাংলায় আসতে পারবে না, এই কথাটি না বলায় বিমানে করে পাকিস্তান থেকে সৈন্য আসতেই লাগলো।

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবস। এই পাকিস্তান দিবসে একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের ধানমন্ডির বাড়ি ছাড়া এই বাংলার সরকারী-বেসরকারী কোন অফিস আদালতে এবং কোথাও পাকিস্তানী পতাকার চিহ্নমাত্র দেখা যায়নি।

দেশের সর্বত্র উড়ছিলো স্বাধীন বাংলার পতাকা। কেবল মাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে একবার পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়িতে গিয়ে জোরপূর্বক পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঐ সময় শেখ মুজিবুর রহমান তার বাড়িতে থাকলেও ঘরের বাইরে আসেননি।

এক সামরিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে (আজকের বাংলাদেশে) যত পাকিস্তানী সৈন্য ছিল, তার শতকরা ৬৫ শতাংশ ছিল বাঙালি, যারা ২৫শে মার্চের পর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো এবং ৩৫ শতাংশ ছিল মূল পাকিস্তানী (পাঞ্জাবী, বেলুচ, পাঠান)। এই ৩৫ শতাংশ পাকিস্তানী সৈনিকের অধিকাংশ ছিল অফিসার যারা যুদ্ধ পরিচালনা করে। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করে না।

আর ৬৫ শতাংশ বাঙালি পাকিস্তানী সৈনিকদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিল নন কমিশন্ড আর সিপাহী, যারা সরাসরি যুদ্ধ করে। '৭১-এর ৭ই মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অবাঙালি ৩৫ শতাংশ সেনা, পাকিস্তানী বাঙালি ৬৫ শতাংশ সৈন্যের কাছে এক ধরনের জিম্মি দশায়ই ছিল।

৭ই মার্চের পর থেকে পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তানীরা, বাঙালি সৈন্যদের চাইতে ২০/৩০ গুণ বেশি অবাঙালি (পাঞ্জাবী, বেলুচ ইত্যাদি) সেনা আনতে পারে। এবং তারপরই পঁচিশে মার্চ রাত ১২টার পর বাঙালিদের উপর আক্রমণ শুরু করে।

শেখ মুজিবুর রহমান যদি সত্যিকার অর্থেই আন্তরিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাইতেন তাহলে ৭ই মার্চের ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার নীতির আড়ালে শাসকদের একাধিক অপশন না দিয়ে, সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতেন। সেদিন বাঙালি জাতির তেমনি স্বাধীনতা ঘোষণার পরিস্থিতি শেখ মুজিবুর রহমান যদি পালন করে বলতেন, আমি আজ থেকে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করলাম, এখন থেকে পাকিস্তানের সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক নেই, আমরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। পাকিস্তান থেকে একটি সৈন্যও আর আসতে পারবে না। বিমানবন্দর বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকিস্তানী সৈন্যদের বন্দী করা হোক, তাহলে বিনা রক্তপাতে, বিনা যুদ্ধে, আমরা স্বাধীন রাষ্ট্র এবং জাতি হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পেতাম।

আত্মসমর্পণ ভারতের হাতে হিসাব শত্রু হাতে শাস্তি দিয়ে, এখানেই শত্রু বাহিনী যুদ্ধ থেকে পাকিস্তানের আর কিছুই করার থাকতো না। যেমন '৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাদের বন্দী করার পর পাকিস্তানীদের কিছুই করার ছিল না।

যুদ্ধ শুরু হোক বা না হোক পাকিস্তানী ৩২ পাঞ্জাব ক্যান্টনমেন্ট সৈন্যদের সাথে পূর্ববর্তী ৬৩ বাঙালি সৈন্যদের একটি যুদ্ধই রেজিমেন্টের এবং সীমিত যুদ্ধ বা লড়াই হতো। যা কেবল মাত্র ক্যান্টনমেন্টেই সীমাবদ্ধ থাকতো। অনুকূল পরিস্থিতি এবং সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করার দায়িত্ব পালন না করায়, আমাদের স্বাধীনতা পেতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অকাতরে প্রাণ দিতে হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মা বোনের ইজ্জত দিতে হয়েছে।

৭ই মার্চের ভাষণঃ ট্রিমেনডাস কন্ডিশনাল স্পিচ

আসলে শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে পাকিস্তানের ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য, এটি একটি চমৎকার অসাধারণ শর্তযুক্ত ভাষণ। ইংরেজিতে যাকে বলা হবে ট্রিমেনডাস কন্ডিশনাল স্পিচ। এই ভাষণকে কোন বিচার বিশ্লেষণেই স্বাধীনতা ঘোষণা বলা যাবে না। ইতিহাসের বিচার বিশ্লেষণে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণকে বলা যায় ট্রিমেনডাস কন্ডিশনাল স্পিচ বা চমৎকার অসাধারণ শর্তযুক্ত ভাষণ। শেখ মুজিবুর রহমান যদি ৭ই মার্চের ভাষণে প্রকৃত অর্থেই দ্ব্যর্থহীন স্বাধীনতা ঘোষণা করেই থাকবেন, তাহলে,

(১) ঐ ভাষণেই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবী করেছিলেন কেন? ঐ ভাষণের মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই ছিল শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা।

(২) ২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসে শেখ মুজিবের ধানমন্ডির বাড়িতে স্বাধীন বাংলার পতাকার পরিবর্তে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছিলেন কেন?

শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠজনেরা আওয়ামী লীগের মন্ত্রী অ. দ. ম. বলে দাবী করেছেন, আজকাল ২৩শে মার্চকে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিবস পালন করতে হবে। ২৩শে মার্চকে যদি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন দিবস হিসেবে পালন করা হয়, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব কতটুকু থাকে?

(৩) যেখানে ৭ই মার্চে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবাঙালি (পাঞ্জাবী, বেলুচ, সিন্ধি) দুর্বল মাত্র পাঁচ সৈন্যকে বন্দি করে প্রায় বিনা যুদ্ধে, বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব ছিল, তা না করে পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশে) অধিক পাকিস্তানী (পাঞ্জাবী, বেলুচ, সিন্ধি) সৈন্য সমাবেশ করার

পূর্ণ সুযোগ দিয়ে ২৫শে বা ২৬শে মার্চ আমাদের উপর আক্রমণ করা পর্যন্ত দীর্ঘ সময় দেওয়া হয়েছিল কেন?

(৪) ২৫শে মার্চ রাতে ঘরে বসে আরাম কেদারায় থাকতে এবং হাতের কাছে তাজউদ্দিন আহমেদ (মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্বদানকারী অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী) সহ অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকলেও শেখ মুজিবুর রহমান কেন তাদের কাছে স্বাধীনতা ঘোষণা দিলেন না?

(৫) ২৫শে মার্চের কালো রাতে, নিরীহ নিরস্ত্র বাঙালির উপর পাকিস্তানী বর্বর বাহিনী যখন পৈশাচিক আক্রমণ করলো এবং নির্বিচারে বাঙালি হত্যা করতে লাগলো; এবং বাঙালি সৈনিক, ই. পি. আর (ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস বর্তমানে বি. ডি. আর) পুলিশ আনসার পাকিস্তানী হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগলো তখন শেখ মুজিবুর রহমান দিশেহারা বাঙালিকে নেতৃত্ব না দিয়ে কেন পাকিস্তানীদের কাছে ধরা দিলেন?

(৬) তাহলে কি শেখ মুজিবের জন্য সেই কাহিনী যে বলেন ২৫শে মার্চ দুপুর আড়াইটা দখলদার পাকিস্তানের জেনারেল টিক্কা খান আমাদের বাসায় এসে আমাকে (শেখ মুজিবকে) সেল্যুট দিল, আমিও (শেখ মুজিব) সেল্যুট দিল, দিয়ে আমাকে বললো স্যার, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আপনার সাথে আলোচনা করার জন্য আমাকে একটি স্পেশাল বিমানসহ পাঠিয়েছে, আপনাকে রাওয়ালপিন্ডি (পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী) নিয়ে যাওয়ার জন্য। আপনি আমাকে (শেখ মুজিব) সাথে নিতে পারেন। চাইলে অন্য কাউকেও নিতে পারেন।

আমাকে সসম্মানে জেনারেল টিক্কা খান নিয়ে গেল। বাঙালির নেতা মুজিবকে জেনারেল টিক্কা খান সেল্যুট দিয়ে গেল। তাহলে কি এটাই সত্যি?

(৭) শেখ মুজিবর রহমান কি মনে করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য রাওয়ালপিন্ডি নিয়ে যাচ্ছেন? আর তাই কি পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর আক্রমণের মুখে গোটা বাঙালি জাতিকে অসহায় অরক্ষিত রেখে তিনি (শেখ মুজিবুর রহমান) জেনারেল টিক্কা খানের সাথে পাকিস্তান চলে গেলেন?

(৮) পাকিস্তানী বর্বরোচিত হানাদারদের আক্রমণের মুখে, আওয়ামী নেতাদের পলায়নের ফলে, দিশেহারা নাবিকের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় বাঙালি জাতি। ঠিক সেই সময়, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থাকা বাঙালি সৈনিক, পাকিস্তানী সেনা আইনে কোর্ট মার্শালে মৃত্যুদণ্ডের সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ে, নেতৃত্বশূন্য দিশেহারা বাঙালিকে নেতৃত্ব ও পথের দিশা দিতে এগিয়ে এলেন এক তরুণ বাঙালি সৈনিক।

মুক্তি পাগল স্বাধীনতাকামী মানুষকে তিনি শোনালেন স্বাধীনতার অমরবাণী। চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, "আমি মেজর জিয়া বলছি, আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলাম।"

২৭শে মার্চ প্রত্যুষে ইথারে ভেসে এল এই অমর স্বাধীনতার বাণী। সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মুক্তি পাগল দামাল ছেলেরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে ঘোষণা করেন, "আই এ্যাম মেজর জিয়া, প্রেসিডেন্ট অব পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ, আই ডিক্লিয়ার্ড ইনডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ।' পরে কৌশলগত কারণে তিনি বলেছেন, "আই এ্যাম মেজর জিয়া, আই ডিক্লিয়ার্ড ইনডিপেন্ডেন্স অব বাংলাদেশ অন দি হাফ অব আওয়ার গ্রেট লিডার শেখ মুজিবুর রহমান।"

মেজর জিয়াউর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণাই কি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে আপোষের ভিত্তিতে শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ পথে অন্তরায় হলো?

(৯) এর পর পরই ১৭ই এপ্রিল তাজুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে ঘটে গেল আর এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক বিশ্বের বহু দেশের সাংবাদিকদের সামনে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলার আম্রকাননে ১৭ই এপ্রিল তাজুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার শপথ গ্রহণ করলো। তাজুদ্দিন আহমেদ হলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাজুদ্দিন আহমেদ তাঁর মন্ত্রী সভা গঠন করলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতেই শেখ মুজিবুর রহমানকে করা হলো রাষ্ট্রপতি। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে করা হলো অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি। যদি শেখ মুজিবুর রহমান আপোষের ভিত্তিতে পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যেয়েও থাকেন, তাহলে তাজুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ, শেখ মুজিব ইয়াহিয়া আপোষ ফর্মুলা কি ভন্ডুল করে দেয়নি?

(১০) আর এই জন্যই কি সফল নেতৃত্ব দিয়ে, সরকার পরিচালনা করে, দেশ স্বাধীন করে, স্বাধীনদেশে শেখ মুজিবুর রহমানকে ফিরিয়ে আনার পর, প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদকেই শেখ মুজিবুর রহমান তার মন্ত্রী সভা থেকে নিগৃহীত করে শেষ করে দিয়েছিলেন?

(১১) হয়তো এ জন্যই স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর সর্বজ্যেষ্ঠ (সিনিয়র) হওয়া সত্ত্বেও শেখ মুজিবুর রহমান জিয়াউর রহমানকে

সেনাবাহিনী প্রধান না করে তাঁরই জুনিয়র শফিউল্লাহকে সেনাবাহিনী প্রধান করেছিলেন?

(১২) শুধু তাই নয়, যে মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন করলো। যুদ্ধে বিজয়ী হলো। দেশে ফিরে এসে কোন আক্রোশের কারণে শেখ মুজিবুর রহমান বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্য দিলেন না? এবং যে প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানীদের তাবেদারী করেছে। বাঙালিদের হত্যা করেছে, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, সেই পরাজিত প্রশাসনকে কি কারণে শেখ মুজিবুর রহমান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন?

মুক্তিযোদ্ধাদের অবজ্ঞা করে, অবহেলা করে, অত্যাচার করে, শুধু মাত্র দলীয় স্বার্থে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত তালিকা না করে অমুক্তিযোদ্ধাদের এমন কি রাজাকারদেরও মুক্তিযোদ্ধা সনদ বিতরণ করে শেখ মুজিবুর রহমান এক অরাজকতার সৃষ্টি করলেন। কিন্তু কেন?

দিল শেখ মুজিব কি

'৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সেনারা দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা জ্বালিয়ে দিলে, স্বাধীনতার পরে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ইত্তেফাকের মালিক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ লক্ষ লক্ষ টাকা দেয়। এবং মুক্তিযুদ্ধের সময় মইনুল হোসেনরা সকল রাজনৈতিক যুদ্ধ প্রস্তুতির সকলেই ঘোষণা দিয়ে আসলেন, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন না। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে, অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী বনে যান মইনুল হোসেনরা পাকিস্তান এসে থেকে দিব্যি পালাবার (পাকিস্তান সরকারের সহায়তায়) ইত্তেফাক পত্রিকা বের করলেন। বলা বাহুল্য, ঐ সময় ইত্তেফাকে পাকিস্তানী জেনারেল ইয়াহিয়া খান, টিক্কা খান, ফরমান আলী, নিয়াজি ও পাকিস্তানী অন্যান্য জেনারেল ও সৈন্যদের এবং স্বাধীনতা-বিরোধী রাজাকার অন্যান্য দালালদের প্রশংসা করে খবর ছাপা হতো। আর মুক্তিযোদ্ধাদের বলা হতো দেশদ্রোহী জারজ। তখন ইত্তেফাক একটি মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানী সামরিক ও জান্তাদের পক্ষে ছিল। এবং রাজাকার ও আলবদরদের পুরস্কার হিসেবে পাকিস্তান সরকারের সকল বিজ্ঞাপন ইত্তেফাক পেতো। অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ায় ইত্তেফাকের মালিক আনোয়ার হোসেন মঞ্জুরা পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে রাজাকার ও আলবদরদের পুরস্কার স্বরূপ পাওয়া বিজ্ঞাপনের বিলের টাকা নিতে পারেনি। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনের পরে পূর্বের অভিযোগের সূত্র ধরে স্বাধীন দেশের সরকার শেখ মুজিবুর রহমানের কাছ থেকে পাকিস্তানী রাজাকার ও আলবদরদের

সেই বিশের টাকা নেয়। কোন বিবেকবান মানুষ কি এই বিশের টাকা দিতে পারে?

এর জন্যই কি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন আর মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন করা হয়েছে? ছিঃ শেখ মুজিব, ছিঃ।

একাত্তরে মুক্তি পাগল বাঙালি ছেলেরা প্রাণের মায়া ছিন্ন করে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণপণ লড়াই করছে। হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে মুখোমুখি যুদ্ধ করছে। ঠিক তখন পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধ দমনের করার জন্য সুপরিকল্পিত ই পি সি এস (ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস) এর পরীক্ষা নিল। কিছুসংখ্যক লোকের বিনিময়ে পাকিস্তানী হানাদারদের কবল থেকে দেশ ও দেশের মানুষকে উদ্ধারের সেই পরীক্ষায় দিল, যখন বাঙালি ছেলেরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। আর পাকিস্তানী সুবিধাবাদী কতিপয় বাঙালি পাকিস্তান সরকারের দেওয়া সেই ই পি সি এস পরীক্ষায় অংশ নিল। এরা দেশদ্রোহী দিয়েছিল ঐ স্বাধীন ই পি সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের চাকরীতে যোগ দিল। পরে এদের বিনিময়ে দেশ স্বাধীনের পর মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কহীন শেখ মুজিবের সরকার ঐ বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহীদের স্বাধীন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের চাকরীতে পুনর্বহাল করেছেন। কিন্তু কেন? মুক্তিযুদ্ধে নিজে থাকলে কি এটা সম্ভব? ছিঃ শেখ মুজিব, ছিঃ

মানুষের জান মালের নিরাপত্তা আর দেশপ্রেমিক সরকার গঠনের লক্ষ্যে সেনা অফিসার সিপাহী জনতাকে নিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা অবস্থার পরিবর্তন করেছেন, তাদের থেকে মুক্তি করে হত্যা করা হয়েছে, মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপন করে তোমার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য শেখ মুজিব হলেন বিশ্বাসঘাতক এক মানুষ।

ডাইরীর পাতা

তুমি যা ভেবেছিলে তাই হয়েছে। তুমি ভেবেছিলে দেশ চেয়ে একদিন একপাশে সব অবসরে থাকবে। তাই হয়েছে। দেশের জন্য, জাতির জন্য কিছু করার ছিল বা করা উচিত ছিল প্রয়োজন যা তুমি দেশের কল্যাণে করতে দিতে না। কারণ তোমারই বন্ধু ক্ষমতায় থাকার জন্য তুমি সর্বদা ব্যস্ত ছিলে। এবং তাই হয়েছে। ১৫/৫/৭৬

না, তুমি দেশের জন্য কিছুই করতে পারবে না। দেশের জন্য কিছু করার মন তোমার নেই। মানুষের জন্য কিছু করার মন নেই বলেই, তোমার ইচ্ছেও নেই। আর ইচ্ছে নেই বলেই তোমার উপায়ও নেই। যদি তোমার ইচ্ছে থাকতো, তাহলে কিছু একটা উপায় হতো। কিন্তু জাতির জন্য কিছু করতে ইচ্ছে তোমার নেই। কাজেই উপায়ও নেই। ১৫/১১/৯৫ইং

আমরা তোমাকে ক্ষমা করতে চাই। কিন্তু কোন দিক দিয়েই ক্ষমা করতে পারি না। তুমি ক্ষমার অযোগ্য। তুমি প্রার্থনা কর আল্লাহর দরবারে আল্লাহতালা যেন তোমাকে ক্ষমা করার ব্যবস্থা আমাদের দেন। ২৭/০২/৯৭ইং

১৯৮১ সালের ১৯শে জুন যখন তুমি তোমার পিতার জমাজমি বাড়ির বাগানের অংশটি এবং অলংকারসহ যাবতীয় জিনিস, ৭২ পৃষ্ঠার একটি দলিলে সই করে লুটে নিয়েছিলে, তখনই মনে হয়েছিল তুমি মানুষ নও। অন্য কিছু। তুমি যখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব লুটে নিচ্ছিলে, সবাই হতবাক হয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছিল। কিভাবে দাঁত খিঁচিয়ে এবং অসভ্যতা করে তুমি বলছিলে, আমার মায়ের দুল কোথায় গেল? আমার মায়ের দুল চুড়ি কই? আমার মায়ের চিরুনি চুড়ি কই? ইত্যাদি ইত্যাদি তুমি কাড়ছিলে আর সরকারী কর্তৃপক্ষ একটা একটা করে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। সেই দিনটার কথা আমার আজো মনে আছে। সেদিন তোমাকে দেখে মনেই হয়নি যে, এই বাড়িতেই তোমার পিতৃকুলের সব শেষ হয়ে গেছে। তুমি এমন ভাবে ভান করে প্রায় সাত লক্ষ টাকার গয়নাগাটি অন্যান্য মালামাল লুটে নিলে যে, তাতে মনে হলো, তুমি মানুষ নও। অন্য কোনো কিছু।

আরো লেখা পড় না; কোন বই পড় না। ওরা কথা শোন না। তোমার দাব শেষ হয়নি। তুমি পিতৃমাতৃহীন স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত এক রমনি। তোমার মেয়ের অভাব তুমি বহুরূপী। তোমার প্রিয় পুত্রবধু মমতাজ, যাকে তুমি ভালবাসতে, সেও তোমাকে ভালবাসতো। কিন্তু সেও তোমার কাছে রইল না। তুমি এমন এক প্রাণী।

শিক্ষা

এসবই তুমি আমাদের দিয়েছ।

তোমার কাছ থেকেই এসব আমাদের পাওয়া।

তুমি যা দিয়েছ, তার সবটুকুই আমরা পেয়েছি।

নতুন করে তোমার কাছ থেকে আমাদের আর পাওয়ার কিছুই নেই।

তাই, তুমি যা দিয়েছ, তা আমরা সুদে-আসলে ফেরত দিতে চাই।

অতএব তুমি প্রস্তুত থেকো, আমাদের কিছু করার নেই।

এশিক্ষা তুমিই আমাদের দিয়েছ। তোমার কাছ থেকেই আমরা এ শিক্ষা পেয়েছি।

সেদিন হয়তো তুমি জান নাই, তোমার শিক্ষাই তোমার বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে দিব।

এই হয়। আসলে এই হয়। তোমার মতো যারা এশিক্ষা দেয় তারা কেউই ভাবেনা, এই শিক্ষা যে একদিন তাদের বিরুদ্ধেই কাজে লেগে যাবে।

তাই হয়তো তুমিও ভাবনি।

তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, একে রাতে আমি হাতে টিকার না দিয়ে সবুজ সিগারেট দিয়ে দিয়েছিলে।

নইলে তো মাঠে মারা যেতে হতো। (অবশ্য তুমি তাই চেয়েছিলে।

তোমার দেয়া শিকলটা ছেঁড়ে দিয়ে, অন্তত পালাবার চেষ্টা করি।

শেষবারের মতো বলি, তুমি দুঃখ করো না। বিশ্বাস কর, তোমার বিরুদ্ধে এ ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার ছিল না।

আমি বিশ্বাস করবো না। কারণ, তোমার মাঝে বিশ্বাস বলে কিছু নেই।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে মানুষের মনন জগতের এক ধরনের অনুভূতি। যে অনুভূতির ফলে একটি জাতির মন-মানসিকতার আমূল পরিবর্তন ঘটে এবং এই পরিবর্তনের ফলে গোটা জাতি মন থেকে পুরনো ধ্যানধারণা ব্যক্তি স্বার্থপরতা, ঝেড়ে ফেলে নতুন মন ও ভাবনা নিয়ে গড়ে ওঠে। এই মনও ভাবনাকে বলা হয় চেতনা।

আর এই গড়ে উঠা নতুন মন ও ভাবনা যা চেতনা হলো, নিজেকে চাইতে অন্যকে (অপরকে) বেশি বড় করে দেখা ; বেশি ভালবাসা। নিজের ব্যক্তি স্বার্থের চাইতে দেশ এবং জাতির স্বার্থকে বেশি বড় করে দেখা। নিজের সুখ-দুঃখ ভুলে গিয়ে অন্যের সুখ-দুঃখকে প্রাধান্য দেওয়া।

একটা জাতির জীবনে এই চেতনা সহজে আসে না। একটি বিশেষ মুহূর্তে একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে হাজারো সংগ্রাম করার পর একটা জাতির জীবনে এই রকম একটি চেতনার জন্ম বা সৃষ্টি হয়। আর একটা জাতির জীবনে যখনই এই চেতনার সৃষ্টি হয়, তখনই সেই জাতি ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে এবং অপরকে নিজের মতো ভালবাসে। কখনো কখনো নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসে।

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা বা অন্যকে নিজের মতো করে ভালবাসার চেতনাকেই বলা হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

জাতির জীবনে যখনই এই চেতনার জন্ম হয় তখনই সেই জাতি মাথা তুলে দাঁড়ায়। পৃথিবীর কোন শক্তিই আর সেই জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারেনা।

অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালবাসার চেতনা হাজার হাজার বছর পর বাঙালি জাতির জীবনে এসেছিল '৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়।

৭১ সালে বাঙালি জাতি নিজের সুখ-দুঃখের চাইতে অন্যের সুখ-দুঃখকে বড় করে দেখেছে, বেশি করে দেখেছে।

নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসার বা অন্যকে নিজের মতো ভালবাসার চেতনা বার বার আসে না। হাজার বছরে একটি জাতির জীবনে একবার এই চেতনা আসে।

জাতির জীবনে যখন এই চেতনা আসে, তখন গোটা জাতি সকল প্রকার অন্যায়, অবিচার, স্বার্থপরতা, পরাধীনতা ইত্যাদি সকল কিছুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং মুক্তির লড়াই শুরু করে।

বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে একমাত্র '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময়েই বাঙালি এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল এবং গোটা বাঙালি জাতি তখন সকল প্রকার ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশ ও জাতির স্বার্থকে বড় করে দেখেছে। অন্যকে নিজের চাইতে বেশি ভালবেসেছে। সমস্ত বিদেশী পণ্য বর্জন করে দেশীয় দ্রব্য ব্যবহার করেছে।

এক কথায় "মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে নিজের চাইতে অন্যকে বেশি ভালবাসা। নিজের ব্যক্তি স্বার্থের চাইতে দেশ ও জাতির স্বার্থ বেশি দেখা।"

স্বাধীনতার পর দেশপ্রেম বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃত্ব বাঙালির অন্তর থেকে মুক্তিযুদ্ধের এই চেতনাকে হরণ করে নিয়েছে। আর এই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসকারী দেশপ্রেম বিবর্জিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের নেতৃত্ব দিয়ে ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান। বলা যায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস হয়েছে।

আমরা শেখ মুজিবের ও শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ইংল্যান্ডের ক্রমওয়েল গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করে নিজেই ক্ষমতার অপব্যবহার করে একজন স্বৈরশাসক হয়েছিলেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক জনতা তাকে ক্ষমা করেনি। দেশের প্রচলিত আইনে তার বিচার হয়েছিল তার মৃত্যুর পর। এই বিচারে তিনি অভিযুক্ত প্রমাণিত হয়েছিলেন এবং তার ফাঁসি হয়েছিল। কবর থেকে তার লাশ তুলে ফাঁসি দিয়ে ঝুলানো হয়েছিল। এটিই হলো আইনের শাসন।

'৭১-এর ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার প্রতিনিধির সঙ্গে যে চুক্তি করেছিল সেই অপরাধে তার ফাঁসি চাই।

স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা জেনেও তা প্রকাশ না করার এবং হত্যা কারীদের সম্পৃক্ত থাকার অপরাধে তার ফাঁসি চাই।

'৮৩-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জয়নাল ও জাফর এবং '৮৪-এর ফেব্রুয়ারী সেলিম ও দেলোয়ারের মৃত্যুর শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়ে যে অপরাধ করেছি তার জন্য আমার ফাঁসি চাই।

১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড করার জন্য শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও নির্দেশে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধিয়ে যে অপরাধ করেছি তার জন্য আমার ফাঁসি চাই।

১৯৯২ সালের পর থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নামে ঢাকা শহরে শেখ হাসিনার পরিকল্পনা ও নির্দেশে যে ১০৩ (একশত তিন) জন লোক নিহত হয়, এই অন্যায়ভাবে ১০৩ জন মানুষ হত্যার দায়ে আমার ফাঁসি চাই।

তবে তার আগে

(১) সম্পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা না করায়, বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য তিরিশ লক্ষ মানুষকে নিহত (শহীদ) হতে হয় এবং দুই লক্ষ মা, বোনকে ধর্ষিত হতে হয়। এই তিরিশ লক্ষ মানুষ হত্যা এবং দুই লক্ষ নারী ধর্ষিত হওয়ার জন্য দায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর ফাঁসি চাই।

(২) মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নামে সকল অনাচারের প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(৩) যে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে এবং দেশ স্বাধীন করে শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন দেশে ফিরিয়ে এনেছে, স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রে থেকে সেই প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন না করে, রাজাকার আলবদরদের দ্বারা গঠিত বাহিনীদের মুক্তিযোদ্ধা সনদ (সার্টিফিকেট) দেওয়ার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(৪) জন্ম না নিয়েও স্বাধীনতার বিরোধী রাজাকারদের মত সহযোগিতার জন্য সনদ দেওয়ার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর শাস্তি চাই।

(৫) নবাব সিরাজী সেজে জাতীয় বিপ্লবী সিরাজ সিকদারকে বন্দি অবস্থায় বিনা বিচারে বন্দিকারে হত্যা করার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর ফাঁসি চাই।

(৬) সিরাজ সিকদারকে খুন করে সর্বহারা পার্টিকেই ভাঙিয়ে দিয়ে আবার সিরাজ সিকদার দলে ভাঙন ধরিয়ে সর্বহারা পার্টিকে অপবিত্র করার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের মরণোত্তর শাস্তি চাই।

(ণ) জনগণের ভোট দেওয়ার অধিকার, মিছিল করার অধিকার, দল করার অধিকার এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণসহ সংবিধানের মৌলিক অধিকার হরণ করে জাতির উপর একদলীয় (বাকশাল) শাসন শোষণ চাপিয়ে দেওয়ার অপরাধে শেখ মুজিবর রহমানের মরণোত্তর বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(ক) ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর অনেক চেষ্টা এবং কষ্টের পর শিক্ষিত ছাত্র যুবকদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে আনার ধারার সূচনা হয়েছিল। ছাত্র যুবকরা ভাবতে শুরু করেছিল "রাজনীতি হচ্ছে মানুষকে দেওয়ার জন্য, পাওয়ার জন্য নয়।"

কিন্তু শেখ হাসিনা দেশে এসে সন্ত্রাসী, চোরাকারবারী, কালোবাজারী,ঘুষখোরদের রাজনীতিতে টেনে এনে কালোটাকাকেই রাজনীতির চালিকা শক্তিতে পরিণত করেছে এবং রাজনীতি থেকে সকল প্রকার নীতি আদর্শ ঝেঁটিয়ে বিদায় করে প্রতিষ্ঠিত করেছে নীতিহীন এক রাজনীতি। এই অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(খ) ভারতে বসে স্বাধীনতার ঘোষক মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে এবং ১৯৮১ সালের ৩০শে মে তা বাস্তবায়িত করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

(গ) ১৯৮২ সালে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত বি এন পি সরকার উৎখাত করে সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(ঘ) সামরিক স্বৈরাচার জেনারেল এরশাদকে হাতের মুঠোয় রাখার জন্য, ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করে, ছাত্র আন্দোলনের নামে, '৮৩-র মধ্যে ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাফর ও জয়নাল এবং '৮৪-র ফেব্রুয়ারীতে সেলিম ও দেলোয়ার হত্যার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

(ঙ) ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন পণ্ড করার জন্য, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক রায়ট লাগিয়ে দেওয়ার অপরাধে শেখ হাসিনার বিচার চাই, শাস্তি চাই।

(চ) ১৯৯২ সাল থেকে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত, আন্দোলনের ইস্যু তৈরী করার জন্য ঢাকা শহরে ১০৩ জন নিরীহ অজ্ঞাতনামা সাধারণ মানুষকে খুন করার অপরাধে শেখ হাসিনার ফাঁসি চাই।

এই সেই আকমান দাস (শেখ হাসিনার মামা), শেখ হাসিনা, মানা হামান এবং আজকের কাগজের সাংবাদিকগণ।

বা দিক থেকে শেখ হেলাল, আজকের কাগজের সাংবাদিকগণ, শেখ হাসিনা এবং মানা হামান।

উপসংহার ঃ

সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদের মতো ক্ষমতাসীন থাকাকালে শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাবেন এবং পালিয়ে যাবার আগে শেখ হাসিনা আশ্রিতের হিন্দু রাজার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী ডেকে এদেশটাকে ভারতের দখলে দিয়ে যাবেন।

"সমগ্র জাতি বিশেষ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধা হুশিয়ার।"

সমাপ্ত

আমার ফাঁসি চাই
BANNED
মুক্তিযোদ্ধা মতিয়ুর রহমান রেন্টু